প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ মে, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় : শিক্ষা — স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

PG Education : 07 : 1 & 2

PG Education : 07 : 1

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 - 5 :	অধ্যাপক প্রণব কুমার চক্রবর্তী	অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য

PG Education : 07 : 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 6 - 8 :	অধ্যাপক দীপেশ চন্দ্র নাথ	অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য
একক 9 - 10 :	অধ্যাপক প্রণব কুমার চক্রবর্তী	অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 07 : 1 & 2

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক 1 ❑ পরিমাপ ও মূল্যায়নের ধারণা 8-34

একক 2 ❑ শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়ন 35-60

একক 3 ❑ মূল্যায়নের হাতিয়ার 61-106

একক 4 ❑ মূল্যায়নের নূতন ধারার উদ্ভব 107-135

একক 5 ❑ মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণ, প্রতিবেদন ও ব্যবহার 136-148

পর্যায় 2

একক 6 ❑ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারণা 150-159

একক 7 ❑ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধাপ 160-168

একক 8 ❑ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র 169-179

একক 9 ❑ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা 180-202

একক 10 ❑ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য আবশ্যিক তথ্য 203-226

PG Education : 07 : 1

একক ১ ❐ পরিমাপ ও মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Measurement and Evaluation)

গঠন (Structure)

সূচনা (Introduction)

উদ্দেশ্য (Objectives)

১.১ পরিমাপ

১.১.১ পরিমাপের ধারণা

১.১.২ পরিমাপের বৈশিষ্ট্য

১.২ মূল্যায়ন

১.২.১ মূল্যায়নের ধারণা

১.২.২ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

১.২.৩ শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান

১.২.৪ মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য

১.২.৫ মূল্যায়ন ও পরিমাপের সম্পর্ক

১.৩ মূল্যায়ন ও পরীক্ষা

১.৩.১ মূল্যায়ন ও পরীক্ষার পার্থক্য

১.৩.২ মূল্যায়ন ও পরীক্ষার সম্পর্ক

১.৪ মূল্যায়নের প্রকারভেদ

১.৪.১ অন্তিম মূল্যায়ন

১.৪.২ প্রাথমিক মূল্যায়ন

১.৫ সার সংক্ষেপ

১.৬ অনুশীলনী

সূচনা (Introduction)

যে কোন কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)। সঠিক সিদ্ধান্ত যেমন কোন কার্যক্রমের অন্তিম ফল, তেমনি পরবর্তী কার্যক্রমের ভিত্তি স্বরূপ। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়েই কোন সুদূর প্রসারী কার্যক্রমের গতি, প্রগতি ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শিক্ষা এমনই এক ধারবাহিক গতিশীল কার্যক্রম যার সবকিছুই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। কাল্পনিক বা আবেগনির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ নির্ভুল তথ্যের সমাহার।

সঠিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রকরণগত দিক থেকে অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে পরিমাপ (Measurement), মানাঙ্কন (Assessment), মূল্য নির্ধারণ (Appriasal), মূল্যায়ন (Evaluation), পরীক্ষা (Examination), অভীক্ষণ (Testing) ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাকে অগ্রাহ্য করে প্রায়শঃই একটি অপরটির পরিবর্তে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাপ মূল্যায়ন পরীক্ষা ইত্যাদি সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান হাতিয়ার। সেজন্য প্রথমেই এই বিষয়গুলির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য জানা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- মূল্যয়ান ও পরিমাপের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- মূল্যায়ন ও পরিমাপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য ও সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- মূল্যায়নের প্রকারভেদ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

১.১ পরিমাপ (Measurement)

পরিমাপ কথাটি মানুষের সভ্যতার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। মানুষ যখনই বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রয়োজন মেটাতে শুরু করেছে তখন থেকেই পরিমাণ (Quantity) ও পরিমাপ (Measurement) তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিমাণ নির্ধারণ করার পদ্ধতি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে পরিমাণ ও পরিমাপের সূচনা সে তুলনায় সাম্প্রতিক। কিন্তু সাম্প্রতিক হলেও তার গুরুত্ব অপরিসীম, তাৎপর্য গভীর। সেজন্য প্রথমেই দরকার পরিমাপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া।

১.১.১ পরিমাপের ধারণা (Concept of Measurement)

নানালি (J. C. Nunnally, 1981) তাঁর বিখ্যাত Psychometric Theory গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, পরিমাপ নিয়ে অনেক কিছু জটিল কথা লেখা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত কথা একটি সহজ সরল ধারণা—কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে পরিমাণ সূচক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করার যে নিয়মাবলী, তাই হল পরিমাপ (Meaurement consists of rules for assigning numbers to objectives in such a way as to represent quantities of attributes)

এই সংজ্ঞা থেকে পরিমাপ প্রক্রিয়ার একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে যার প্রথম উল্লেখ্য বিষয় হল পরিমেয় বস্তুর প্রকৃতি। যদিও বস্তু (Object) কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বস্তুটিকে মাপি না, পরিমাপ করি বস্তুটিকে আশ্রয় করে থাকা কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে (Attribute)। আমরা একটি সরলরেখাকে মাপি না। রেখার দৈর্ঘ্যকে মাপি। কোন শিশুকে পরিমাপ করার কথা অর্থহীন, শিশুর বুদ্ধি বা জ্ঞান পরিমাপ করা যেতে পারে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট ভাবে বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত না করলে পরিমাপ সম্ভব নয়।

দৈর্ঘ্য, ওজন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ভৌত বস্তুকে আশ্রয় করে থাকায় তাদের পরিমাপ সরাসরি করা সম্ভব। কিন্তু সমস্ত ভৌত পরিমাপই এভাবে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না। কোন বস্তুকে আশ্রয় করে মোট কত পরিমাণ তাপ (Heat) আছে, তা সরাসরি পরিমাপ করা যায় না। তাপের প্রকাশ তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি, বস্তুর ভর, তাপধারণ ক্ষমতা (আপেক্ষিক তাপ) ইত্যাদি বিষয় একত্রিত করে তবেই মোট তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য সরাসরি মাপা যায় না। তার প্রকাশ যে আচরণের মাধ্যমে ঘটে, সেই আচরণ পরিমাপ করার মধ্যে দিয়ে বৈশিষ্ট্যটি পরিমাপ করতে হয়। যেমন, সরাসরি বুদ্ধি মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সব আচরণের মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে, সেই আচরণগুলিকে মাপা যায়।

এই কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিমেয় বৈশিষ্ট্য (Attribute) সম্বন্ধে আমাদের একটা বিমূর্ত কিন্তু সংজ্ঞায়িত ধরাণা সৃষ্টি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যদি ধারণাটি জটিল হয় তবে তার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ উপাদানগুলি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হলে তবেই তার পরিমাপ করা যাবে। আবার বুদ্ধির উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বুদ্ধি একটি বিমূর্ত ধারণা এবং জটিল। কিন্তু পরিমাপ করতে হলে বুদ্ধির একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়ে কোন কোন উপাদান পরিমাপ করতে হবে তার সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা পরিমাপ করা অসম্ভব।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় হল, পরিমাপের ফলাফল পরিমাণ নির্দেশ করে অর্থাৎ পরিমেয় বৈশিষ্ট্যকে একটি সংখ্যা মানদ্বারা প্রকাশ করে। দশ কিলোগ্রাম, পঁচিশ মিটার বা একশ বুদ্ধ্যঙ্ক যাই হোক না কেন, দশ, পঁচিশ, একশ—এ সবই সংখ্যাবাচক ও পরিমাণ সূচক।

সবশেষে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরিমাপ হবে একটি নিয়মাবদ্ধ প্রক্রিয়া। পরিমাপের পদ্ধতি, ভিত্তি বা ফলাফল প্রকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে করলে সমস্ত মানুষের কাছে তা একই অর্থ বহন করবে এবং তা থেকে সকলেই একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সাধারণভাবে এই নিয়মগুলি কয়েকটি ধাপে বুঝে নেওয়া দরকার।

পরিমাপ কথাটির অর্থ কোন বড় বিষয়কে তারই একটি ক্ষুদ্রতর অংশের গুণিতক হিসাবে প্রকাশ করা। এই ক্ষুদ্রতর অংশটিকে বলা হয় একক (Unit)। ৩ কিলোমিটার পরিমাপের অর্থ, কিলোমিটার নামক ক্ষুদ্রতর অংশের তিনগুণ দূরত্ব। অথবা ত্রিশ মিনিট সময় কথাটির অর্থ একমিনিট নামক এককের ত্রিশগুণ বেশি সময়। পরিমাপের একক নির্বাচন করার প্রথম ও প্রধান শর্ত এককটি পরিমেয় বস্তুর মত একই বৈশিষ্ট্য সূচক হয়। সময়ের একক দিয়ে সময় মাপা যায়, দৈর্ঘ্য মাপা যায় না।

একক কোন ধ্রুবক (Constant) বা অপরিবর্তনীয় (Absolute) ধারণা নয়। ভৌত পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন একটি এককের ভগ্নাংশ বা গুণিতকও একক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন একটি বস্তু উপর থেকে নীচে পড়তে যতটা সময় লাগে তা ঘণ্টা মিনিট ইত্যাদি দিয়ে মাপা সম্ভব নয়। সেকেন্ড নামক একক দিয়ে তার পরিমাপ সম্ভব। আবার ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত যে সময় কাল সেকেন্ড, মিনিট ইত্যাদি দিয়ে প্রকাশ করা অসুবিধা জনক, বরং তাকে প্রকাশ করার জন্য দরকার বৎসর নামক একটি বৃহৎ এককের। এই কথার তাৎপর্য এই যে একক নির্বাচন করার জন্য পরিমেয় বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট হলেও প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। যদি তা খুব বড় বা বেশি হয় তবে বড় একক দরকার, ছোট হলে ছোট একক দরকার।

কিন্তু শিক্ষা বা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিমাপের একক নির্বাচন এত সহজে করা যায় না। এর প্রধান কারণ ভৌত পরিমাপের এককগুলি সরাসরি মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। বুদ্ধি, আগ্রহ, অর্জিত জ্ঞান ইত্যাদি মিটার, গ্রাম কিংবা সেকেন্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তা ছাড়া দ্বিতীয় কারণটি হল, মনোবিজ্ঞান বা শিক্ষায় পরিমেয় ধারণা বা বৈশিষ্ট্যগুলি ভৌত বৈশিষ্ট্যের মত ধারাবাহিক (Continuous) নয়। এই দুটি কারণ ছাড়াও তৃতীয় কারণটি হল, ভৌত বৈশিষ্ট্যর মত মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির এত সুস্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। ফলে আমরা কি পরিমাণ করতে চাই তা সবসময় কিছুটা হলেও অস্পষ্ট থাকে। বুদ্ধি কাকে বলে, তার যে সংজ্ঞাই দেওয়া যাক না কেন, সবসময়ই তার বিকল্প সংজ্ঞাও কিছু না কিছু থাকে।

যে একক পর্যায়ক্রম দিয়ে পরিমাপ করা হয় তাকে বলে স্কেল (Scale) সাধারণ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পরিমাপের উদ্দেশ্যে চার প্রকার পরিমাপক স্কেল হয়ে থাকে।

নামবাচক স্কেল (Nominal Scale) ঃ যখন কোন সংখ্যাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে তা শুধুমাত্র একটি পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে কাজ করে তখন ঐ জাতীয় সংখ্যার শ্রেণিকে নামবাচক স্কেল (Nominal Scale) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন কোন রাস্তায় অবস্থিত বাড়িগুলি ১নং, ২নং এইভাবে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য হল একটি বাড়িকে অন্য সব বাড়ি থেকে পৃথক ভাবে চিনে নেওয়া। এখানে সংখ্যাগুলি বাড়ির কোন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়, এমনকি, তাদের পারস্পরিক অবস্থানও অনিশ্চিত হতে পারে। অর্থাৎ ১নং বাড়ি পাশেই যে ২নং বাড়ি থাকবে তা নাও হতে পারে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই স্কেল কোন পরিমাপ সূচক স্কেল নয়, শুধুমাত্রই চিহ্নসূচক স্কেল।

ক্রমিক স্কেল (Ordinal Scale) ঃ যখন পরিমেয় বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন, গরিষ্ঠ থেকে লঘিষ্ঠ, সর্বাধিক থেকে সর্বনিম্ন বা অনুরূপ ক্রমপর্যায়ে বস্তুগুলিকে সাজানো যায় কিন্তু একটি থেকে অপরটি কতটা কম বা বেশি তা পরিস্কার করে বলা যায় না এবং একটি থেকে অপরটির ব্যবধান সমান কি না তাও বলা যায় না, তখন এইরকম ক্রম পর্যায় সূচক সংখ্যাগুলিকে একযোগে বলা হয় ক্রমিক স্কেল (Ordinal Scale)। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের একটি ক্রমপর্যায় থাকে ঠিকই কিন্তু কত নম্বর পেলে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হওয়া যাবে তার কোন স্থিরতা নেই। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সঙ্গে নম্বরের কতটা ব্যবধান থাকবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর সঙ্গে ঐ ব্যবধান সমান হবে কি না তাও অনিশ্চিত। শুধু প্রথম স্থানাধিকারী সর্বোচ্চ, দ্বিতীয় তার কম, তৃতীয় আরও কম নম্বর পেয়েছে এটুকুই নিশ্চিত। অঙ্কের ভাষায় বলা যায় যদি কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপগুলি a, b, c, d....... ইত্যাদি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রে S_a, S_b, S_c, S_d ইত্যাদি হয়, তবে ক্রমিক স্কেল অনুযায়ী $S_a > S_b > S_c > S_d$ বা তার বিপরীত এটুকুই শুধু নিশ্চিত এবং $S_a \neq S_b \neq S_c \neq S_d$ এই সম্পর্কও নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে ক্রমিক স্কেলের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়ে থাকে। যখন কোন দলের প্রতিটি ব্যক্তির একক পরিমাপ অপেক্ষা ঐ ব্যক্তিদের কয়েকটি দলে এমনভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়, যে একটি অপর দল অপেক্ষা উন্নততর তখন ঐ দলগুলির চিহ্নসূচক সংখ্যাগুলিকে ক্রমিক স্কেল বলা যাবে। পরবর্তী কোন একটি একক পাঠ করার সময় বলা হবে প্রতি ছাত্রের একক নম্বর অপেক্ষা যখন তাদের একটি গ্রেড দেওয়া হয়, তার আসল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের এক ক্রমিক স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা।

আন্তর স্কেল (Interval Scale) ঃ আন্তর স্কেল অন্তর অর্থাৎ ব্যবধান ভিত্তিক। যখন কোন পরিমাপ এমনভাবে করা হয় যে প্রত্যেকটি একক ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিমেয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি ক্রমিক অবস্থানে (Rank) চিহ্নিত করা সম্ভব এবং প্রতিটি ক্রমিক অবস্থানের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অবস্থানের ব্যবধানও একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্থির করা হয় কিন্তু পরিমাপের সংখ্যা মানটি সঠিক ভাবে বলা হয় না, তখন এই ধরনের পরিমাপ সূচক স্কেলকে বলা হয় আন্তর স্কেল (Interval Scale)।

যদি একদল ছেলের উচ্চতার পরিমাপ সরাসরি সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির সংখ্যায় প্রকাশ না করে এমনভাবে করা হয় যে সবচেয়ে হ্রস্ব ছেলের দৈর্ঘ্যকে 0 ধরে তার থেকে দুই সে. মি. বড়কে 1, তার থেকে দুই সে. মি. বড় ছেলেটিকে 2, এই ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে উচ্চতার পরিমাপ হিসাবে 0, 1, 2, 3, ... এই রকম স্কেলকে বলা হবে আন্তর স্কেল। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে আন্তর স্কেলের ব্যবহারও বহুল প্রচলিত। বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) পরিমাপ করে, যে সংখ্যাগুলি দ্বারা তার মান প্রকাশ করা হয় তা প্রকৃত পক্ষে একটি আন্তর স্কেল ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধ্যঙ্ক 100 থেকে 110 এর যে অন্তর তা 80 থেকে 90 বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবধানের সমান বলে মনে করা হয়। কিন্তু কার্যত এই ব্যবধান দুটি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতের পার্থক্য মাত্র। বুদ্ধির প্রকৃত পরিমাণের (যা মাপা যায় না) পার্থক্য এই দুই ব্যবধানের ক্ষেত্রে সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যভাবে বলা যায়, 80 বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে 90 বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটা উন্নত, 100 বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে 110 বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা কার্যত ততটা উন্নত বলে প্রতীয়মান হয় না।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপের ক্ষেত্রে আন্তর স্কেলের সংখ্যামানকে প্রায় সাধারণ সংখ্যার (Natural Number) মতই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নানালি (Nunnally) প্রমুখ পরিমাপ বিজ্ঞানীরা তা সমর্থনও করেন। শুধু একটি মাত্র বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে পরিমাপ সূচক সংখ্যামানের বাস্তবিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার সময় যথেষ্ট বিচার বিবেচনা যেন করা হয়। একটি গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 40 কি. মি., 60 কি. মি., 80 কি. মি., এইভাবে লিখলে, প্রতিটি পর্যায়ে গতিবেগের অন্তর সমান হিসাবে প্রকাশ করা হয় ঠিকই কিন্তু গাড়ির দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, জ্বালানির দহন, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির বিচারে এই ব্যবধানগুলির তাৎপর্য ভিন্ন। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে 40 কি. মি. থেকে 60 কি. মি. গতিবেগ বাড়ালে জ্বালানির সাশ্রয় হয়, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অল্প বাড়ে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে গতিবৃদ্ধি করলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়ে এবং জ্বালানি খরচ অনেক বেশি হয়।

অনুপাত স্কেল (Ratio Scale) ঃ যখন আন্তর স্কেলের পরিমাপসূচক সংখ্যাগুলি এমনভাবে পরস্পর অবস্থান করে যে, পরপর দুইটি সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান সর্বতোভাবে সমান এবং পরিমাপের সূচনা সব সময়ই 0 থেকে শুরু করা যায়, তখন ঐ স্কেলকে বলা হয় অনুপাত স্কেল (Ratio Scale)। কোন ব্যক্তির উচ্চতা 1.7 মিটার এই কথার অর্থ হল শূন্য থেকে শুরু করে 1.7 মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। তিন ঘণ্টা সময় কথাটির অর্থ যখন থেকে সময় মাপা শুরু হয়েছে সেই সময়কে শূন্য ধরে তিনি ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ভৌত পরিমাপের ক্ষেত্রে যত সহজে অনুপাত স্কেল ব্যবহার করা যায়, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে তত সহজে তা করা যায় না।

অনুপাত স্কেলের সাহায্যে যে সব বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয় সেগুলি সবই ধারাবাহিক (Continuous)। এর ফলে পর পর দুইটি পরিমাপসূচক সংখ্যার মধ্যে ভগ্নাংশের অস্তিত্ব সম্ভব। যেমন, একজন ব্যক্তির উচ্চতা 160 সে. মি. এবং অপর এক ব্যক্তির উচ্চতা 161 সে. মি. হলে, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির উচ্চতা 160.5 সে. মি. হওয়াও সম্ভব। কিন্তু 100 এবং 101 বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট দুই জন ব্যক্তির মধ্যবর্তী 100.5 বুদ্ধ্যঙ্কের অস্তিত্ব থাকার চিন্তা অর্থহীন। প্রতিক্রিয়া কাল (Reaction Time) প্রভৃতি কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে অনুপাত স্কেল ব্যবহার করা হয় তার কারণ পরিমাপটি ভৌত পরিমাপ (সময়) নির্ভর।

সুতরাং সবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরিমাপ হল কোন পরিমেয় বস্তুকে বিশেষ নিয়ম মেনে, কোন না কোন একটি স্কেলে প্রকাশ করা।

১.১.২ পরিমাপের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Measurement)

পরিমাপের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

- পরিমাপ ব্যক্তি বা বস্তুর কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের নৈর্ব্যক্তিক, (Objective) সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট প্রকাশ। পরিমাপ প্রক্রিয়া এবং পরিমাপের ফলাফল দুইই ব্যক্তি নিরপেক্ষ। একই পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসরণ করে কোন পরিমাপ কার্য সম্পন্ন করলে তার ফলাফল একই হওয়া উচিত।

● পরিমাপের তাৎপর্য সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে থাকে। কারও বুদ্ধ্যঙ্ক 100 হলে ঐ ব্যক্তির বুদ্ধি সম্পর্কে সমস্ত ব্যক্তির একই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কোন ছাত্র পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে 90 নম্বর পেলে তার বিষয়বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধে সকলের একই ধারণা হয়। পরিমাপের এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্ববর্তী নৈর্ব্যক্তিকতা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পরিমাপ পদ্ধতি প্রকৃত নৈর্ব্যক্তিক হলে তবেই তার ফলাফল সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব।

● পরিমাপের একক নির্বাচন পরিমেয় বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণার উপর নির্ভরশীল। যে সব ক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য ভৌত বৈশিষ্ট্যের (দৈর্ঘ্য, সময়, ওজন ইত্যাদি) এককগুলি সরাসরি প্রয়োগ করা যায় না, সে সব ক্ষেত্রেও নানা গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় একক স্থির করে নিতে হয়। অর্থাৎ একক ছাড়া পরিমাপ সম্ভব নয়।

● শিক্ষাও মনোবিজ্ঞানে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যাদের পরিমাপ করার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে একটি অনুপাত মাত্র। যেমন, বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.)। সাফল্যাঙ্ক (Achievement Quotient) ইত্যাদি। কিন্তু একক যেমনই হোক, পরিমাপের ফলাফল সব সময়ই একটি সংখ্যা মাত্র। কারণ, পরিমাপ একই বৈশিষ্ট্যের ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর পরিমাণের অনুপাত।

● পরিমাপের ফলে কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্বন্ধে এমন একটি সঠিক, নৈব্যক্তিক ও বোধযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় যা পরস্পর তুলনা করার ক্ষেত্রে, দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে, এবং নির্ভরযোগ্য যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক কথায়, পরিমাপ যত নির্ভুল হবে, কোন ব্যক্তি বা দল সম্বন্ধে ততই নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হবে।

১.২ মূল্যায়ন (Evaluation)

মূল্যায়ন কথাটির সাধারণ অর্থ কোন কিছুর মূল্য আরোপ করা। বস্তুজগতের বেলাতেও কোন কিছুর মূল্য শুধুমাত্র বস্তুর নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না। বাইরের জগতের বহু বিষয় বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে টাকা জনবসতিতে থাকাকালীন মূল্যবান, গভীর নির্জন অরণ্যে তা মূল্যহীন। যে বিদ্যা রোগীর চিকিৎসায় মূল্যবান, সেই বিদ্যা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল্যহীন। সে কারণেই মূল্য আরোপ করার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা আরও ব্যাপক এবং জটিল। সেজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ছাড়াও, শিক্ষক, প্রশাসক, অভিভাবক সকলেরই মূল্যায়ন সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জ্ঞান শিক্ষার গতি ও দিক নির্দেশে একান্ত আবশ্যিক।

১.২.১ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation)

আন্তর্জাতিক শিক্ষা অভিধানে (International Dictionary of Education, 1977) মূল্যায়নের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মূল্য বিচার, কৃতকর্মের পরীক্ষা বা অনুরূপ ভাবে কোন প্রত্যক্ষ তথ্যের সমাহার (An Assembly of facts on the basis of direct observation, testing

of works done and to assign value)। কিন্তু মূল্যায়ন শুধুমাত্র তথ্যের সমাহার নয়, সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক গুণগত ধারণা গ্রহণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি দুটি পরস্পর সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যায়। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, মুল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া (Process) বা কার্যক্রম (Programme) অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের মাধ্যমে কোন কিছুর মূল্যবিচার করা যায় তাই হল মূল্যায়ন। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম থেকেও তার সাহায্যে যে অন্তিম বা চূড়ান্ত ধারণা গঠন করা যায়, তাই হল মূল্যায়ন। পরবর্তী কোন অংশে মূল্যায়নের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনার সময় এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও সম্পর্ক আরও ভালোভাবে জানা যাবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণার সঙ্গো যুক্ত হয়ে আছে শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গগুলি, যাদের কিছু কিছু আবার বিমূর্ত ধারণা। শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যে, তার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি একত্রিত হয়ে শিক্ষার সামগ্রিক সাফল্য নিশ্চিত করে। কিন্তু একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষার কার্যক্রম কতটা সফল বা অসফল তা স্থির করা সম্ভব। এই কারণে ডেরেক রোঁৎসি (Dereck Rowntsee), এ. জে. নিক্টো (A. J. Nicto) প্রমুখ মূল্যায়ন বিশারদরা বা মূল্যায়নকে সরাসরি শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গো যুক্ত করে দিয়েছেন। এদের মতের সঙ্গো আরও অন্যান্য সংজ্ঞার মূল কথা একত্রিত করে শিক্ষায় মূল্যায়নের একটি সংজ্ঞা পাওয়া যেতে পারে।

> শিক্ষায় মূল্যায়ন হ'ল এমন একটি ধারাবাহিক অন্তহীন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্যের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ও সাফল্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
>
> (Evaluation in education is such a continuous and endless process through which one can make judgement and take dicisions about the aims and success of education comprehensively in the various contemporary perspectives)।

১.২.২ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Evaluation)

পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মধ্যেই মূল্যায়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।

প্রথমতঃ মূল্যায়ন একই সঙ্গো একটি প্রক্রিয়া এবং তার মাধ্যমে গৃহীত ফলাফল। এই বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ সময়ে তাৎক্ষণিক কোন প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। শিক্ষা যেহেতু একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, সেহেতু মূল্যায়নও ধারাবাহিক হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যভাবে বলা যায় শিক্ষার মত মূল্যায়নও গতিশীল (Dynamic) প্রক্রিয়া। শিক্ষার পাঠ্যক্রম ক্রমাগত পরিবর্তন হয়। একবছরের শিক্ষার্থীর দল পরবর্তী বৎসরে পরিবর্তত হয়ে

যায়। শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন হয় ; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মূল্যায়নও ধারাবাহিক ভাবে তার গুণগত মান বিচার করে চলে।

তৃতীয়ত, মূল্যায়ন একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রথাগত শিক্ষা একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া। একজন ব্যক্তির জীবনে সাময়িক ভাবে প্রথাগত শিক্ষার বিরতি ঘটে কিন্তু ছাত্রধারা নিরবচ্ছিন্ন। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও কখনও শেষ হয় না।

চতুর্থতঃ মূল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্যে, ব্যবস্থা (System) ও তার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার করে। কোন শিক্ষা কার্যক্রমই উদ্দেশ্য বিহীন নয়। শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য স্থির হয় এক বা একাধিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কিন্তু শিক্ষা ও শিক্ষণের লক্ষ্য মূলতঃ মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান নির্ভর। মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার করার দিক নির্দেশ করা। ক্রমাগত সংস্কার ও পরিমার্জনের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার প্রকৃত গতিশীলতা বজায় থাকে।

পঞ্চমত, মূল্যায়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাফল্য অসাফল্য, তাদের চাহিদা, যোগ্যতা, সক্ষমতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি চিহ্নিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার সমস্ত অঙ্গগুলিই মূল্যায়নের বিচারাধীন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সময়োপযোগী। কোন একটি বিশেষ স্তর বা বয়সের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা কি উপযুক্ত। পাঠক্রম কি যথাযথ? শিক্ষার উপকরণ ও পদ্ধতি কি যথার্থ এবং সুপ্রযুক্ত? শিক্ষক শিক্ষিকারা কি যোগ্য? পরীক্ষা পদ্ধতি কি বিজ্ঞানসম্মত? এই ধরনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই একমাত্র হাতিয়ার। কাজেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার সমস্ত দিকই বিচার করে দেখে। এই কারণেই বলা হয়েছে যে মূল্যায়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠতঃ মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষা একটি দিশাহীন স্থবির প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই সমাজ ও ব্যক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে অপ্রচলিত। একশত বৎসর পূর্বেকার শিক্ষাও এখন বাতিল। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি বা ভবিষ্যতে আরও যে সব পরিবর্তন হবে, তার মূলে আছে গতিশীল মূল্যায়ন ব্যবস্থা। মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হলে, শিক্ষার সামগ্রিক মানও ত্রুটিপূর্ণ হবে।

সবশেষে, মূল্যায়ন কোন শিকড়বিহীন চিরস্থায়ী পদ্ধতি নয়। অর্থাৎ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিজেই পরিবর্তনশীল। এর কারণ শিক্ষার মত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াগত একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় কাজ করে। এই পটভূমি পরিবর্তিত হলে মূল্যায়ন পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, কাঠামো পরীক্ষার পদ্ধতি, এদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার সবকিছুই বাইরের সামাজিক চাহিদা ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও সংস্কার সাধিত হয়।

মূল্যায়নের এই সব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, আরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরবর্তী অংশগুলিতে ধারণা পাওয়া যাবে। তার আগে শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।

১.২.৩ শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান (Place of Evaluation Education)

শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান নির্দেশ করতে হলে, মূল্যায়নের যে দুটি ধারণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা স্মরণ করা দরকার। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারণাটি মেনে নিলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিক্ষা ও মূল্যায়ন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আবার মূল্যায়নকে যদি একটি ব্যবস্থার অন্তিম পরিণতি হিসাবে দেখা হয় তবে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মূল্যায়নের ভূমিকা দিক নির্দেশক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নের উভয় প্রকার ভূমিকাই পরস্পর সম্পৃক্ত এবং অপরিহার্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায়, শিক্ষার সমস্ত উপাদান, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও প্রয়োগের কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীকে শীর্ষে রেখেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য স্থির করা হয়, রচিত হয় পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণ স্থির করা হয় এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনাও রচিত হয়। শিক্ষার এইসব উপাদানের প্রত্যেকটি অপর উপাদানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত। এই কারণে শিক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্ক বা শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান জটিল এবং বহুমাত্রিক। একটি চিত্রের সাহায্যে এ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া সহজ হবে।

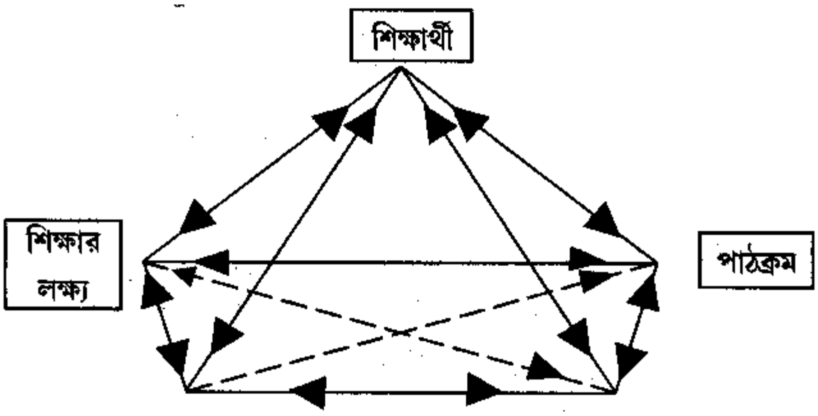

১ নং চিত্র— শিক্ষার উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক

উপরের পিরামিড আকৃতির চিত্রে প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার প্রত্যেকটি উপাদান এমন ভাবে যুক্ত যে তাদের সবকয়টি কোন এক সরলরেখায় অবস্থান করে না। এর ফলে একথা বলা যাবে না যে গুরুত্ব বা পর্যায়ক্রম হিসাবে একটি উপাদান অপর উপাদানের পরে অবস্থান করে। যেমন, শিক্ষার্থীকে উপলক্ষ করে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা হতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যও ক্রমাগত শিশুর মধ্যে নির্দিষ্ট ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে তার বিকাশের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি চিত্রে দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটি সম্পর্কই দ্বিমুখী। এই জন্যই বলা হয়েছে মূল্যায়নসহ শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক জটিল ও বহুমাত্রিক।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে দ্বিমুখী সম্পর্কে যুক্ত। কারণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অধিকাংশ কার্যক্রমই পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীকে অবলম্বন করে। আবার মূল্যায়নের পদ্ধতি ও প্রকরণ স্থির করা হয় শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর ও মান বিচার করে। যে পদ্ধতিতে প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন করা হয়, সেই পদ্ধতি বাল্যকাল

বা কৈশোরে কার্যকর নয়। আবার শিশুর বিকাশ ও তার শিক্ষা প্রায় সমার্থক বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ্‌রা। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বিকাশের গতি প্রকৃতিরও মূল্যায়ন। অর্থাৎ এক কথায় এরা পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে অনুরূপভাবে দ্বিমুখী সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার লক্ষ্য কি, তার দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, তার উপর নির্ভর করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যও স্থির করা হয়। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য যেভাবেই স্থির করা হোক, তা যে অভ্রান্ত হবে তার কোন স্থিরতা নেই। শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য কতখানি অর্জন করা হয়েছে তার মূল্যায়নের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার লক্ষ্যের যথার্থতার মূল্যায়নও করা হয়। যে লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব তা যতই উচ্চ হোক, তাকে পরিবর্তন করে সহজ লক্ষ্য স্থির না করলে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। আদর্শবাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষ্য স্থির করলে যেভাবে মূল্যায়ন করতে হবে প্রকৃতিবাদী দর্শনের বা প্রয়োগবাদী দর্শনের লক্ষ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তা থেকে পৃথক।

পাঠ্যক্রম রচনার মাধ্যমে শিশু কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব। সুতরাং পাঠক্রম শিশুর চাহিদা, বিকাশের স্তর ও সক্ষমতার ভিত্তিতে রচনা করা হয়। মূল্যায়নের প্রধান প্রধান কার্যক্রম শিশুকে অবলম্বন করেই সম্পন্ন হয় এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কাজেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যে পাঠক্রমকে ভিত্তি করে পরিচালিত হবে তা বলাই বাহুল্য। পাঠক্রম (Curriculum) হল শিক্ষার প্রকৃত ব্লু-প্রিন্ট (Blue Print)। সেজন্য পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে সে ১/২ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অর্জিত সাফল্যের মূল্যায়ন না করলে শিক্ষার গতি বজায় রাখা যায় না। অন্যদিকে পাঠক্রমের যথার্থতা বিচারের জন্যও মূল্যায়ন অপরিহার্য। পাঠক্রম কোন স্থায়ী অপরিবর্তনীয়, বিষয়বস্তুর সমাহার নয়। পাঠক্রমও একটি সদা পরিবর্তনশীল কার্য পরিকল্পনা। সুতরাং পাঠক্রমের পরিবর্তন ও পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আর এই কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষকরা জানতে পারেন নির্ধারিত পাঠক্রম কতটা উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে কী কী পরিবর্তন আনা বা সংযোজন বর্জন করা দরকার। বলাবাহুল্য, পাঠক্রমেরই অংশ হিসাবে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। পাঠক্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সেই সব পাঠ্যপুস্তক ও উপকরণেরও মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

এরপর উল্লেখ করা দরকার শিখন ও শিক্ষণের (Learning and Teaching) ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভূমিকার কথা। শিখন হল শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত পূর্বপরিকল্পিত পরিবর্তন। শিক্ষার্থী কি শেখে, কেমন করে শেখে, কতটা শিখতে পারে, এসবই তার নিজস্ব শিখন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। অপরদিকে আছেন শিক্ষক। তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া, সক্ষমতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কতটা জানেন তার উপর শিক্ষাদান পর্ব অনেকটাই নির্ভর করে। এবার তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি কতটা উপযুক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগ, উপযুক্ত উপকরণের ব্যবহার, তাঁর দক্ষতাকে কতটা পরিশীলিত করে তুলতে পারেন তার উপর শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ এক কথায়,

শিক্ষার সমস্ত উপাদানগুলির চূড়ান্ত সার্থকতা ঘটে শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে। শিখন-শিক্ষণই হল ফলিত শিক্ষা বিজ্ঞান (Applied Education)।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রধানতম দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর। এজন্য একদিকে যেমন শিক্ষকদের পক্ষে মূল্যায়নের তত্ত্ব, পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যিক, অন্যদিকে মূল্যায়ন তাঁদের সামনে শিক্ষার সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরে। এমনকি মূল্যায়ন আয়নার মত শিক্ষকের দক্ষতা, সক্ষমতা, পদ্ধতির যথার্থতা, ত্রুটি ও দুর্বলতা ইত্যাদি এমন ভাবে তুলে ধরে যে শিক্ষকরা তাঁদের পদ্ধতির সংস্কার করতে পারেন, ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার সংশোধন করতে সচেষ্ট হতে পারেন। সুতরাং মূল্যায়ন শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষায় এই সর্বব্যাপক অপরিহার্য ভূমিকার জন্যই মূল্যায়নের সংজ্ঞায় একে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হিসাবে বলা হয়েছে। এইদিক থেকেই পরিমাপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূল্যায়নের প্রধানতম পার্থক্য বিদ্যমান।

১.২.৪ মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য (Difference between Evaluation and Measurement)

এতক্ষণ মূল্যায়ন সম্বন্ধে যত কথা বলা হল তার মধ্যে প্রধানতম একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। সেটি হল, মূল্য আরোপ করতে যে সব তথ্যের সমাহার ঘটাতে হবে সেগুলি কি ধরনের তথ্য? সাধারণতঃ দুই রকমের তথ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এক ধরনের তথ্য বর্ণনাত্মক গুণবাচক তথ্য, আর দ্বিতীয় প্রকার হল পরিমাণগত তথ্য। পরিমাণবাচক তথ্য মাত্রেই পরিমাপ নির্ভর। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করতে হয় পরিমাপ ও মূল্যায়ন কি এক? পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে পরিমাপ ও মূল্যায়নের মধ্যে অনেকগুলি পার্থক্য আছে। আবার এই দুইটি ধারণা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনও নয়। প্রথমে দেখা যাক, এদের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে।

পরিমাপ একটি অসম্পূর্ণ বা আংশিক প্রক্রিয়া। অপরদিকে মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কোন শিক্ষার্থীর গণিতের জ্ঞান কতটা আয়ত্ত হয়েছে পরিমাপের সাহায্যে তা বলা হবে শুধুমাত্র একটি সাংখ্যামান দ্বারা কিন্তু গণিতের জ্ঞান পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন, বুদ্ধি, গণিতের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিন্যাস, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। আবার গণিতের জ্ঞান সম্বন্ধে জানা গেলেও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়গুলি যেমন, শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা, পাঠ্যক্রমের উপযুক্ততা, বিদ্যালয় পরিবেশের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা ইত্যাদি একটিমাত্র পরিমাপ থেকে জানা যায় না। মূল্যায়ন হল একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে এমনভাবে তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়, যে একটি পূর্ণাঙ্গচিত্র ফুটে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটিও যথেষ্ট নির্ভরতার সঙ্গে করা যায়।

পরিমাপের উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কিন্তু মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক ও বৃহত্তর। কোন একটি পাঠ্যক্রম বা তার অংশ বিশেষের পঠন পাঠন শেষ করার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আয়ত্তজ্ঞান পরিমাপ

করেন। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করার পর তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের ক্রমিক অবস্থান স্থির করা এবং যারা পাঠক্রম শেষ করার পরও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি পরিমাপের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনুরূপ ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে শিক্ষার্থীরা কেন শিখতে পারেনি। তারা কি অন্যান্য বিষয়ে শিখেছে? তাদের বুদ্ধি, আগ্রহ বা চেষ্টার অভাব? ক্লাসে তারা কি অনুপস্থিত ছিল? শিক্ষক কি সঠিক পদ্ধতিতে পড়িয়েছেন? তাদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন? পাঠক্রম কি তাদের অনুপযুক্ত? এই ধরনের যত তথ্য একত্রিত করলে, পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে এবং উপযুক্ত এক বা একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যাবে তাই হল মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। সুতরাং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনেক সময়ই ব্যাপক সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।

পরিমাপের ফলাফল একটিমাত্র সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। একই ধরনের অনেক পরিমাপের ফল একগুচ্ছ সংখ্যা। পূর্বোক্ত উদাহরণে ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর এক একটি সংখ্যামাত্র। এই সংখ্যাগুলি থেকে কিছু কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় ঠিকই কিন্তু মূল্যায়ন বহুবিধ তথ্যের সমাহার হওয়ায় তার ফলাফল প্রায়ই সংখ্যাবাচক হয় না। বিবরণাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী তথ্যও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট কার্যকর। এক কথা, পরিমাপলব্ধ তথ্য শুধু মাত্রই পরিমাণগত (Quantitative) আর মূল্যায়নলব্ধ তথা পরিমাণগত ও গুণগত (Qualitative) এই উভয় প্রকারই হতে পারে।

পরিমাপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য দিতে পারে। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায়। এর ফলে একটি ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যাই হোক তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেকার যে জটিল সম্পর্ক তার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সঠিক বিদ্যালয় পরিচালনা, তত্ত্বাবধান (Supervision), প্রশাসনিক নীতি ও পদক্ষেপ ইত্যাদি আপাত দূরবর্তী বিষয়গুলির সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, তাদের পঠন পাঠন এসবের মধ্যে যে জটিল অথচ অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ক, একমাত্র মূল্যায়নই তার সঠিক রূপটি তুলে ধরতে পারে।

পরিমাপ এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত সম্পন্ন হয় না। সে দিক থেকে পরিমাপ হল প্রয়োজন সাপেক্ষে কোন কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ের ফলাফল বা পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার প্রক্রিয়া। কোন পাঠক্রম শেষ হলে, তখনই ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্তজ্ঞান পরিমাপ করা যাবে। কোন একটা বিশেষ বয়সের ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধি পরিমাপ করার অর্থ হল, সেই বয়স পর্যন্ত তার বুদ্ধি যতটা বিকাশলাভ করেছে তার মান স্থির করা। কিন্তু মূল্যায়ন এক অন্তহীন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোন কার্যক্রম যতদিন চলতে থাকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম ১৯৫০ সালে যা ছিল, তা বহুবার নানা ভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রমের আকৃতি পেয়েছে। এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনগুলি ক্রমাগত ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফল। আবার ভবিষ্যতে হয়ত এখনকার পাঠক্রমটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে কারণ মূল্যায়নের কাজও ক্রমাগত চলতেই থাকবে।

সবশেষে, পরিমাপ বিশ্লেষণ ধর্মী কিন্তু মূল্যায়ন একযোগে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষধর্মী। কোনকিছুর পরিমাপ করতে হলে, তার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে নিয়ে প্রত্যেকটি উপাদান স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপ করতে হয়। কোন ঘনকের আয়তন পরিমাপ করতে হলে, ঘনকটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিনটি মাত্র স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপ করতে হয়। বুদ্ধি পরিমাপ করতে হলে বুদ্ধির উপাদানগুলি পরিমাপ করা এবং সেজন্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমে ওই উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার। মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় ঠিকই কিন্তু মূল্যায়ন সেখানেই শেষ হয়ে যায় না। উপাদানগুলি সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলির সঠিক সংশ্লেষণ না হলে মূল্যায়নের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই জন্যই বলা হয়েছে, মূল্যায়ন একযোগে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ধর্মী।

মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুটি ধারণার একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কারণ এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা না জানলে, মূল্যায়ন ও পরিমাপের পূর্বাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে না।

১.২.৫ মূল্যায়ন ও পরিমাপের সম্পর্ক (Relation between Evaluation and Measurement)

মূল্যায়নের সঙ্গে পরিমাপের সম্পর্ক একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রক্রিয়া ও প্রকরণের সম্পর্ক।

প্রথমতঃ পরিমাপ মূল্যায়নের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাপ বা অঙ্গবিশেষ কারণ পরিমাপ ছাড়া মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অনেকটাই সংগৃহীত হয় ব্যক্তিগত বা একক অংশ থেকে। পরীক্ষায় সামগ্রিক সাফল্য অসাফল্যের কথা জানতে হলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জানতে হবে। বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন কিনা তা জানতে হলে প্রত্যেকটি একক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা জানতে হবে। এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিমাপই একমাত্র পদ্ধতি। সুতরাং মূল্যায়ন যদি একটি প্রক্রিয়া (Process) হয় তবে পরিমাপ হল একটি প্রকরণ (Technique)। সমস্ত প্রকার পরিমাপের কৌশল একরকম নয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও হাতিয়ার ব্যবহার করে পরিমাপ করলে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই মূল্যায়ন অগ্রসর হয়। সুতরাং পরিমাপ ছাড়া মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে পরিমাপ একটি পরিমাণগত (Quantitative) প্রক্রিয়া। যেহেতু পরিমাপ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বস্তু বা ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত মান নির্ণয় করে, সেহেতু পরিমাপ হল নৈর্ব্যক্তিক (Objective)। একই বৈশিষ্ট্য একই নিয়ম মেনে যিনিই পরিমাপ করুন, তিনি একই ফল পাবেন। এই কারণে পরিমাপ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকেও যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) দান করে। মূল্যায়ন যদি শুধুমাত্র গুণগত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয় তবে তা পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে। এদিকে থেকেও পরিমাপ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

তৃতীয়তঃ সঠিক পরিমাপ নির্ভর করে পরিমাপের পদ্ধতি ও হাতিয়ার কতটা নির্ভরযোগ্য (Reliable)

তার উপর। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পরিমাপ করে একই বস্তুর ক্ষেত্রে যদি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায় তবে ঐ পদ্ধতি বা হাতিয়ারকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না এবং ওই পরিমাপের ফলাফলকেও নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে নির্ভরযোগ্য (Reliable) করে তোলে পরিমাপ। সুতরাং পরিমাপ ছাড়া মূল্যায়ন অর্থহীন।

চতুর্থতঃ ঠিক একই রকম ভাবে যে কোন পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য যথার্থ (Valid) হওয়া প্রয়োজন। ভৌত পরিমাপের ক্ষেত্রে যথার্থতার প্রশ্নটি সহজেই বিচার করা যায় কারণ সেখানে যে সব বৈশিষ্ট্য (যেমন, দৈর্ঘ্য, ওজন, সময় ইত্যাদি) পরিমাপ করা হয় তাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আছে। কিন্তু যে অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়, তা কি সত্যিই বুদ্ধির পরিমাপ করছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি জটিল, কিন্তু অবশ্য প্রয়োজন। এক কথায় পরিমাপ নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ না হলে তাকে পরিমাপ বলা যাবে না। মূল্যায়ন যেহেতু অনেকটা পরিমাপ নির্ভর, সেজন্য পরিমাপ মূল্যায়নকে যথার্থতা (Validity) দান করে।

সবশেষে, মূল্যায়নের প্রয়োজনে নতুন নতুন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভব হতে পারে। প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তনও ঘটতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথম যে বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষা (Intelligence Tests) তৈরি করেছিলেন এ্যালফ্রেড বিনে (Alfred Binet), তার সূচনা হয়েছিল মূল্যায়নের প্রয়োজনেই। বিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্বজ্ঞান ছাড়াও বুদ্ধি ও অন্যান্য সক্ষমতার অভাব আছে কিনা এই বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন হয়েছিল। তার ফলেই বুদ্ধি পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। আবার সাধারণ ভাবে পরীক্ষা মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মান নির্ণয় করার জন্য যে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি আছে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য নম্বর দেওয়া, পরীক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদির অনেক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যায়নের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরিমাপ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ পরীক্ষাও এক ধরনের পরিমাপ প্রক্রিয়া।

১.৩ মূল্যায়ন ও পরীক্ষা (Evaluation and Examination)

মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রাচীনতম পরিমাপ পদ্ধতির নাম পরীক্ষা। শিক্ষা কার্যক্রমে পরীক্ষা এমনই একটি অপরিহার্য অঙ্গ যে অনেক সময়ই মানুষ মূল্যায়ন ও পরীক্ষাকে সমার্থক বলে মনে করে। এর কারণ পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর ও সেই উত্তরের মূল্যমান সংখ্যা দ্বারা স্থির করার পদ্ধতি মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

বার্নার্ড ও লয়েরি (Barnard and Lauwery) তাঁদের Handbook of Educational Terms নামক গ্রন্থে, বলেছেন, পরীক্ষা হল কোন জ্ঞান আয়ত্ত করার পর তার অভীক্ষণ বা আরও ব্যাপক অর্থে বুদ্ধি বা সক্ষমতার মূল্যাঙ্কন (Examination is testing the knowledge acquired or in a more broad

sense assessment of intelligence or ability)। বার্নার্ড ও লয়েরির সংজ্ঞা থেকে দ্বিতীয় অংশটি বাদ দিলে পরীক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা তৈরি হয়, তা হল পরীক্ষা কোন পাঠক্রম শেষ করার পর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ। ডেরেক রোঁৎসি (Dereck Rowntsee) এই কথাটিই সরাসরি বলেছেন তাঁর সম্পাদিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা অভিধানে। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা হল কোন পাঠক্রম শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীদের শিখনের পরিমাপ করা (Examination is the measurement of learning of the students after going through a curriculum)।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাধারণত তিন ধরনের পরীক্ষা প্রচলিত আছে (১) কোন পাঠক্রম অনুসরণ করে পঠন-পাঠন শেষ হলে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রগতি পরীক্ষা করা, (২) কোন একটি পূর্বনির্ধারিত মানের সমতুল শিক্ষা অর্জন করার পর পরীক্ষান্তে ডিগ্রি বা উপাধি দান এবং (৩) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ কোন সম্মান (যেমন, একটি বৃত্তি বা Scholarship) প্রদান করা।

সাধারণভাবে পরীক্ষা একটি পরিমাপ প্রক্রিয়া কিন্তু এর কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর শিখনের মান নির্ণয় করা। সে হিসাবে পরীক্ষাকে ঐ মান নির্ণয়ের একটি হাতিয়ার (Tool) হিসাবেও বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই হাতিয়ার যেহেতু অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেহেতু শুধুমাত্র কোন স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হলে তারপর এই হাতিয়ার প্রয়োগের সময় আসে।

পরীক্ষা পরোক্ষভাবে অন্যান্য কিছু মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বা গুণের পরিমাপও করে থাকে। যেমন, ধৈর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তার স্বচ্ছতা ও গতি, দ্রুত লেখার ক্ষমতা, চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়ই এই পরোক্ষ গুণগুলি মূল্য, পরিমেয় বৈশিষ্ট্যের পরিমাপকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। শুধু ধৈর্যের অভাবে কোন শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ না করতে পারে বা মন্থর হাতের লেখার জন্য অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখতে পারে।

পরীক্ষা শিক্ষকের পারদর্শিতারও পরিমাপ। কারণ, শিক্ষার্থীর যে সব গুণ, বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতার পরিমাপ পরীক্ষা করা হয়, তার প্রায় সবকিছুই শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফল। আবার পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনার দায়িত্ব যেমন শিক্ষকের তেমনি উত্তরপত্র মূল্যায়নের ভারও তাঁরই উপর ন্যস্ত। এর কোন একটির ক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতার অভাব থাকলে পরীক্ষা নামক পরিমাপ প্রক্রিয়ার উপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ত্রুটি বিচ্যুতি, দুর্বলতা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং পঠনপাঠনের অসম্পূর্ণতা ও গলদগুলিকেও চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ফলে পরীক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দুই এর পক্ষেই অপরিহার্য। কিন্তু পরীক্ষার পদ্ধতি, স্থায়িত্ব, সময়ান্তর এসবই স্থির করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এর কোন বাধ্যতামূলক প্রকরণ নেই।

পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও প্রেরণার কারণ। পরীক্ষাকে উপলক্ষ করে প্রবল উদ্যমে পড়াশুনা করা,

প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া, নতুন তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আবার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আরও ভালো নম্বরের জন্য পরিশ্রম করার প্রেষণা তথা প্রেরণা লাভ করার উদাহরণও অনেক পাওয়া যায়।

বাৎসরিক গণপরীক্ষা (Annual Public Examination) অর্থাৎ বৎসরে এক বার একই প্রশ্নপত্রের সাহায্যে কোন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয় (যেমন, মাধ্যমিক পরীক্ষা) তার মাধ্যমে, সমস্ত বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীদের একটি সাধারণ মানের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে পরীক্ষা আদর্শমান নির্ণয়ের কাজও করে থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে পরীক্ষা।

পরীক্ষা শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। একটি স্তরের পরীক্ষা পরবর্তী উচ্চতর স্তরের জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করার জন্য একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পড়ার যোগ্য তা স্থির হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরের মধ্যে পরীক্ষা একটি যোগসূত্র যা শিক্ষার ধারাবাহিকতার নামান্তর।

পরীক্ষায় সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট সমস্ত বিষয় পড়তে হবে এবং সমস্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে শেষ করতে হবে। বিষয়বস্তু যত নীরস বা কঠিন মনে হোক তা বাদ দেওয়া চলে না। এইভাবে কঠিন বিষয়ে মনোনিবেশ করার ফলে মেধার উন্নতি হয়, শিক্ষার্থীর অভিনিবেশ ক্ষমতা, অধ্যবসায় ইত্যাদি বহু গুণ আয়ত্ত হয়। সুতরাং পরীক্ষা মানুষের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে এবং এইভাবে শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

পরীক্ষার এই সব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলি মূল্যায়ন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কিন্তু মূল্যায়ন ও পরীক্ষা এক নয়। এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি জানলে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা উভয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

১.৩.১ মূল্যায়ন ও পরীক্ষার পার্থক্য (Difference between Evaluation and Examination)

পরীক্ষা পরিমাপের মতই একটি আংশিক প্রক্রিয়া। পরীক্ষাকে মূল্যায়নের একটি ধাপ অন্যভাবে মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার পদ্ধতিগত যত রকমফের আছে যেমন মৌখিক, লিখিত ব্যবহারিক ইত্যাদি, তার সবকয়টির মূল উদ্দেশ্য প্রায় একই। পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞান, ও তার আনুষঙ্গিক হিসাবে অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে পারে। এই পরিমাপ কিছুটা স্থূল, কারণ পরীক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের মত একটা গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষালব্ধ তথ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আরও অনেক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য একত্রিত করলে তবেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই হিসাবে পরীক্ষা মূল্যায়নের অংশ বিশেষ বা হাতিয়ার মাত্র।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত তথ্যের সংযোজন, পরিবর্তন, বিয়োজন এসব চলতেই থাকে মূল্যায়নের কাজে। কিন্তু পরীক্ষার একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী আছে। সময়সূচীর ভিত্তিতেও

পরীক্ষার শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে যেমন সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক। কিন্তু সময়সীমা যাই হোকনা কেন, একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম বা শিক্ষাকার্যক্রম শেষ হলে, সেই সীমাবদ্ধ বিষয়ের ভিত্তিতেই পরীক্ষা নেওয়া হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতেই থাকে কারণ শিক্ষাও ছাত্রধারার মতো তা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মত তার লক্ষ্যও খুব সীমিত বা সংকীর্ণ। সফল, অসফল, উত্তীর্ণ প্রভৃতি বিশেষণগুলি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিবিভাগ করা, প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা, শংসাপত্র (Certificate) দান, এই সব কাজের মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফলকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কখনও কখনও ব্যাপক অকৃতকার্যতা বা অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটলে তখন আরও অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা, মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং এমনকি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও জড়িত থাকতে পারে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য কখনও কখনও নির্বাচনমুখী। শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মেধা সম্পন্ন একশত জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া যাবে—এরকম একটি উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য যদি পরীক্ষা নেওয়া হয়, তবে প্রথম একশতজনকে বাছাই করে নিলেই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। কিন্তু মূল্যায়নের বেলা এরকম কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মূল্যায়নের ভিত্তিতে যদি কোন নির্বাচন করাও হয়, তবে তা একজন ছাত্র বা ছাত্রী সম্বন্ধে সামগ্রিক তথ্যের ভিত্তিতেই হবে। তার বুদ্ধি, প্রবণতা, শারীরিক সক্ষমতা, জ্ঞান, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি যা কিছু বিষয় কোন না কোন ভাবে পরবর্তী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে, তার সবকিছুই বিচার করা হবে নির্বাচনের জন্য।

পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বরাদ্দ সময় ও পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম কানুন খুবই গতানুগতিক। এই সব নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। তিন ঘণ্টার পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রীকেই তিন ঘণ্টার বেশি একটুও সময় দেওয়া হয় না। প্রশ্ন ও উত্তর নির্বাচনের মধ্যেও স্বাধীনতার অবকাশ প্রায় নেই বলা চলে। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এরকম বাঁধাধরা কঠোর নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রয়োজন মতো তা যথেষ্ট নমনীয় (Flexible)। মূল্যায়ন পরীক্ষার তুলনায় অনেক নমনীয় হওয়ার দরুন, অনেক বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত তথ্যও মূল্যায়নের নথিতে স্থান পেতে পারে।

প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিমাণগত শ্রেণিবিভাজনের কাজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি ইত্যাদি কৃত্রিম শ্রেণিবিভাগ করে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের মান বিচার করা হয়। কিন্তু যেহেতু কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয় না সেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণির সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থী এবং প্রথম শ্রেণিতে সর্বনিম্ন নম্বর পাওয়া ছাত্রকে কৃত্রিমভাবে দুইটি উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণিতে ভাগ করা সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ কার্যতঃ এদের মধ্যে জ্ঞানের পার্থক্য পরিমাপযোগ্য নয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণি বিভাজন কোন উদ্দেশ্য নয় অথবা শ্রেণি বিভাজন করা হলেও তার ভিত্তি যতটা পরিমাণগত তথ্য তার চেয়ে অনেক বেশি গুণগত তথ্য। সুতরাং শ্রেণি বিভাগ করা হলে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে উল্লম্ব (vertical) এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আনুভূমিক (Horizontal) শ্রেণিবিভাগই স্বাভাবিক।

পরীক্ষার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কোন পাঠে উল্লেখ করা হবে। এখানে যতটুকু বলা হল তা

থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পর নিরপেক্ষ নয়—এদের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্কও বিদ্যমান। সেজন্য এদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার।

১.৩.২. মূল্যায়ন ও পরীক্ষার সম্পর্ক (Relation between Evaluation and Examination)

মূল্যায়ন ও পরীক্ষার সম্পর্ক প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ পরীক্ষা মূল্যায়নের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, পরীক্ষা ছাড়া মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের প্রয়োজনে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা অন্য কোন পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। সেজন্য পরীক্ষা বিধির সংস্কার করা যেতে পারে কিন্তু পরীক্ষা বর্জন করা কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ মূল্যায়ন লব্ধ তথ্য ও সিদ্ধান্ত থেকে যারা লাভবান হয়ে থাকেন, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রশাসক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ, তাদের কাছে পরীক্ষা ফলাফল অনেক বেশি সহজবোধ্য। পরীক্ষার মান, প্রশ্নপত্র, নম্বর ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা অনেক সহজে আলোচনা, বা সমালোচনা করতে পারেন। এই কারণেই, আমাদের দেশে বৃত্তিমুখী পাঠক্রমগুলিতে (যেমন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) ভর্তির জন্য শুধু পরীক্ষার ভিত্তিতে (Joint Entrance Test) শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। সেখানে মূল্যায়ন ভিত্তিক বহুমুখী তথ্যের কোন স্থান নেই। সেজন্য, পরীক্ষাকে মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বলা হয়।

তৃতীয়তঃ পরীক্ষা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশ করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠক্রম, পঠন-পাঠন পদ্ধতি, পরীক্ষা ও অন্যান্য পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যেও নানা পরিবর্তন ঘটে বা অন্ততপক্ষে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রচনাধর্মী প্রশ্ন বনাম নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, প্রশ্নব্যাঙ্ক, গ্রেডিং প্রথা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সূত্রপাত হয় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টার মাধ্যমে।

চতুর্থতঃ কোন পাঠক্রম বা শিক্ষাকার্যক্রম একমাত্র তার নিজস্ব গুণে সার্থক হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কার্যকর করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনারই মূল্য নেই। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় চেষ্টা, শিক্ষকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইত্যাদির গুরুত্ব যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের সার্থকতার বেলায় অপরিহার্য। আর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এই কার্যকারিতার উপরই নির্ভরশীল। যেহেতু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের ক্ষেত্রেই পরীক্ষা তাদের উদ্দীপনার একটি প্রধান উৎস, সেহেতু পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রায় অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হয়।

পঞ্চমতঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পরস্পর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যগুলিকে খণ্ডিত আকারে পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন অংশবিশেষের মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া যায়। শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা দেখেছেন, লক্ষ্যগুলি স্তরেস্তরে বিন্যস্ত। এক একটি স্তরে গঠন পাঠনের মাধ্যমে এবং তার পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্যগুলি কার্যকর করতে হয়। শিক্ষার এই লক্ষ্যগুলি ছাড়া সমগ্র-ব্যবস্থাটিই দিশাহীন হয়ে ওঠে। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐসব লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হলে, তার মধ্যে দিয়েই শিক্ষার

বৃহত্তর উদ্দেশ্য সার্থক করা সম্ভব হয়। আর মূল্যায়নের চরম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলা।

এই সব কারণেই বলা হয়েছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি আর একটির বিকল্প নয়, পরস্পর পরিপূরক।

১.৪ মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Type of Evaluation)

যদি মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক প্রক্রিয়া, তবুও অনেক শিক্ষাবিদ্ মূল্যায়নের পদ্ধতিগত দিক থেকে এর কিছু শ্রেণি বিভাগ করার পক্ষপাতী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে—(১) বাৎসরিক পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক সাফল্যের যোগফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন এবং (২) অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষাগুলির সাফল্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমকেন্দ্রিক জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতার মূল্যায়ন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু আচরণগত (Conduct), এবং অন্যান্য বিষয়ও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হয় (যেমন, উপস্থিতি, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া দক্ষতা ইত্যাদি)। প্রথম প্রকার মূল্যায়নকে অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) এবং দ্বিতীয় প্রকার মূল্যায়নকে প্রাথমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) বলা হয়। শিক্ষার অন্যান্য উপাদানের জন্য পাঠক্রমের (Curriculum) মূল্যায়নের সময়ও একই প্রকারভেদ হতে পারে।

১.৪.১ অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

এ.জে. নিক্টো (A. J. Nikto, 1983) বলেছেন, শিক্ষার্থীর শিক্ষান্তে গুণমানের বিবরণ হিসাবে কোন পাঠক্রম শেষ হওয়ার পর পরীক্ষার মাধ্যমে অন্তিম মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে (Summative Evaluation is done through examination after completion of a curriculum, with a view to describe the qualities of the learner after learning) আবার গ্রোনল্যান্ড, ১৯৮৫ (Grownland, 1985) বলেছেন, পাঠক্রম শেষ হলে, বাৎসরিক পরীক্ষায় চূড়ান্ত মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তার পরিমাণগত মান স্থির করা (After completion of curriculum, the purpose of evaluation in the annual examination is to assess how far the objectives of education have been attained.)। অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন ইবেল ও ফ্রিসবি (১৯৮৬), সাক্স (১৯৮৯), গ্যারস্ (১৯৯০) প্রমুখ মূল্যায়ন বিশারদরা।

অন্তিম মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আলোচনা করলে এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ।

এক, সুনির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম থাকলে তবেই তার শেষে অন্তিম মূল্যায়ন করা যাবে। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় অন্তিম মূল্যায়ন অর্থহীন কারণ এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে কোন কঠোর নিয়মাবদ্ধ কার্যক্রম থাকে না।

দুই, শিক্ষাকার্যক্রমের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য না থাকলে অন্তিম মূল্যায়ন অর্থহীন। কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী অন্তিম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয় করা।

তিন, অন্তিম মূল্যায়নের যে শিক্ষা কার্যক্রমের শেষে সম্পন্ন হবে, তার স্থায়িত্ব কার্যক্রম ভেদে আলাদা হতে পারে কিন্তু সাধারণত স্বল্পস্থায়ী কার্যক্রমের (যেমন, দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি) শেষে অন্তিম মূল্যায়ন খুব প্রাসঙ্গিক নয়। যদিও সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী শিক্ষাকার্যক্রমের শেষেও অন্তিম মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব।

চার, অন্তিম মূল্যায়ন গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্যই বিশ্লেষণ করে। বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, শিক্ষার্থীর আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, নেতৃত্বসুলভ আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হলে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ছাড়া অন্যগুলি সবই গুণগত পরিমাপ।

পাঁচ, তাত্ত্বিক দিক থেকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ভর করে মূল্যায়নের যে ছক (Design) অনুসরণ করা হবে তার উপর। অন্তিম মূল্যায়নের জন্য বিশেষভাবে ছক অনুসরণ করা হয়ে থাকে, যেমন শিক্ষাকার্যক্রমটিকে একটি সিস্টেম (System) হিসাবে ধরে নিয়ে মূল্যায়নের জন্য Systems Design অনুসরণ করা যেতে পারে। এই ছক অনুযায়ী এক একটি ক্ষুদ্রতর অংশের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এমনভাবে স্থির করা হয় যে প্রতিটি অংশের লক্ষ্য পরস্পর সম্পর্কিত এবং যাদের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল সামগ্রিক কার্যক্রমের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। ছকবিহীন অন্তিম মূল্যায়ন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন সাহায্য করে না।

ছয়, মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণও পরিমাণ ও গুণ ভিত্তিক হতে পারে। কিন্তু পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis) ও গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis) যাই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় বর্ণনাত্মক সিদ্ধান্ত (Descriptive Decisions)। কোন পরীক্ষায় শতকরা 80 জন ছাত্রই 50 এর কম নম্বর পেয়েছে, এই তথ্যটি পরিমাণগত বিশ্লেষণের ফল। কিন্তু এই তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয় প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হয়েছে। তখন তা একটি গুণবাচক সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোন কিছু নয়।

সাত, অন্তিম মূল্যায়ন অবশ্যই নির্ভরযোগ্য (Reliable) ও যথার্থ (Valid) হওয়া দরকার কারণ, এই প্রকারের মূল্যায়ন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হয়। ভুলত্রুটি বেশি হলে তার সংশোধন আবার দীর্ঘসময়ের ব্যবধান হতে পারে। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা।

অন্তিম মূল্যায়নের অন্যতম সুবিধাগুলি হল —

- খুব ঘন ঘন মূল্যায়নের ফলে যে সময় ও পরিশ্রম দরকার অন্তিম মূল্যায়নের জন্য তা প্রয়োজন হয় না।
- ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্টভাবে জানতে পারে কি কি বিষয়ে মূল্যায়ন হবে এবং তারা বেশ কিছুটা সময় পায় নিজেদের তৈরি করতে।
- অন্তিম মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকরা প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ বেশি পান।
- খণ্ডিত মূল্যায়ন অপেক্ষা অন্তিম মূল্যায়নে সামগ্রিকতার স্থান অনেক বেশি।

- মূল্যায়নের ছক অনুসরণ করার দরুন, অন্তিম মূল্যায়ন তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য।
- অন্তিম মূল্যায়ন ব্যাপক ভাবে একযোগে সারা দেশে বা রাজ্যে করা সম্ভব।

  অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও আছে ঃ—

- পাঠক্রমের সমগ্র অংশের মূল্যায়ন একযোগে হলে শিক্ষার্থীদের উপর তাৎক্ষণিক চাপ বেশি পড়ে।
- অনেকগুলি বিষয়ে অনেক মাত্রায় মূল্যায়ন করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করে।
- শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের মূল্যায়ন না হতে পারে বা সমগ্র অংশ সমান গুরুত্ব পেতে নাও পারে।
- অন্তিম মূল্যায়নের সমস্ত রকম তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা সময় সাপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে সিদ্ধান্তে আসা গেলেও, তা কার্যকর করা সম্ভব হয় অনেক বিলম্বে।
- মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় যদি কোন ত্রুটি থাকে, তা সংশোধন করার সুযোগ আসে আবার একটি অন্তিম মূল্যায়ন সময়। এর ফলে যারা ভ্রান্তির শিকার, তারা আর সংশোধিত মূল্যায়নের সুযোগ পায় না।
- অন্তিম মূল্যায়ন ব্যয় সাপেক্ষ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও আরও স্থায়ী সংগঠন প্রয়োজন হয়। ফলে প্রশাসনিক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

তবে তুলনামূলকভাবে অন্তিম মূল্যায়নের প্রচলন অনেক বেশি।

১.৪.২ প্রাথমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

ইংরাজী Formative শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্মীয়মান অবস্থা। অর্থাৎ কোন কার্যক্রম চলাকালীন যে মূল্যায়ন করা হয় তাই প্রাথমিক মূল্যায়ন। শব্দটি এই জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে যে কার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়ন পর্বটি ক্রমাগত চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ধাপে ধাপে কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ হচ্ছে।

নিস্কৌ, প্রাথমিক মূল্যায়নেরও সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোন শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা কার্যকর নানা পর্যায়ে বা অন্তর্বর্তীকালে উক্ত কার্যক্রমকে উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করার জন্য যে বিচার তাই হল প্রাথমিক মূল্যায়ন (Formative evaluation is the process of judgement of an educational programme during the course of its implementation with a view to improve and make it free from defects and also to make necessary changes)

গ্রোনল্যাণ্ড (১৯৮৫) প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে বলেছেন, শিক্ষাকার্যক্রম চলাকালীন, প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রগতির পরিমাপ করার মাধ্যমে তার পরিবর্তন, সংশোধন ইত্যাদিকে লক্ষ্য রেখে যে প্রতি সংকেত (Feedback) দেওয়া হয়, তাই হল প্রাথমিক মূল্যায়ন। ইবেল ও ফ্রিসবি (১৯৮৬) প্রাথমিক মূল্যায়নকে প্রাথমিক অগ্রগতির ধারাবিবরণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে নিক্সৌ গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমটির উপর। অপরদিকে, গ্রোনল্যান্ড, ইবেল, ফ্রিসবি প্রমুখরা জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সংশোধন ও প্রতি সংকেতের উপর। বাস্তবিক বিচারে এদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। প্রাথমিক মূল্যায়নের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার।

এক, প্রাথমিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষাকার্যক্রমটি শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে তারপরও কিছুকাল পর্যন্ত কাজ চলতে পারে।

দুই, প্রাথমিক মূল্যায়নে, শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তিম লক্ষ্যকে সামনে রেখে, প্রতিটি ক্ষুদ্রতর অংশের জন্য আলাদা লক্ষ্য ধার্য করে নেওয়া হয়। মূল্যায়নের সময়, গুরুত্ব দেওয়া হয় কার্যক্রমের ক্ষুদ্রতর অংশের জন্য নির্ধারিত খণ্ডিত লক্ষ্যের উপর।

তিন, প্রাথমিক কার্যক্রম শুধুমাত্র বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। যে ছাত্রছাত্রীরা পাঠক্রম শেষ করেছে কিন্তু মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের বেলা প্রাথমিক কার্যক্রম সম্ভব নয়।

চার, এই ধরনের মূল্যায়নে অণুবিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অণুবিশ্লেষণ (Micro analysis) কথাটির অর্থ হল, প্রতিটি খুঁটিনাটি দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজন মত তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

পাঁচ, প্রাথমিক মূল্যায়নের প্রকরণ অনুসন্ধানমূলক এবং নমনীয়। যেহেতু এই ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক উন্নতি সাধন, সেহেতু দুর্বলতাগুলির প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার তিনটি বিষয়ের অনুসন্ধান করা জরুরি। কোন ছকে বাঁধা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করা যায় না।

ছয়, অন্তিম মূল্যায়ন যদি কিছুটা পরিমাণে আদর্শবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তবে প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রয়োগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলা চলে।

সাত, প্রাথমিক মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষত, ত্রুটিমুক্ত পাঠক্রম রচনা করা এবং এদের পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী নির্ণায়ক শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করা।

অন্তিম মূল্যায়নের মতই ধারাবাহিক মূল্যায়নেরও কিছু কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। এরকম কয়েকটি সুবিধা (Advantages) সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

● পাঠক্রমের ছোট ছোট অংশের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হওয়ায় প্রতিটি এককের মূল্যায়নে সময় কম লাগে। বেশি আয়োজন ছাড়াই শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল্যায়নের কাজ নিজেরাই করতে পারেন।

● পাঠক্রমের ছোট অংশের লক্ষ্য নির্ধারণ করায় শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রথম থেকেই অবহিত হয়। ফলে মূল্যায়ন সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। অর্থাৎ তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা তারা জানে।

● অন্তিম মূল্যায়নে একই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশোধনের আর সুযোগ থাকে না। কিন্তু প্রাথমিক মূল্যায়নে অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্বন্ধে প্রতিসংকেত পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে।

● শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাঁদের পদ্ধতিগত ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন এবং নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারেন।

● শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয় কারণ তাঁরা শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়, শিক্ষার্থীদের পরামর্শদাতা (Counsellor) হিসাবেও কাজ করেন।

● সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকার্যক্রমের সমস্ত বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাথমিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে তাঁদের এই বিশ্লেষণ কার্যটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে কার্যক্রমের দুর্বলতা, গুণ, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট হয়।

● প্রাথমিক মূল্যায়ন সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা থাকে যে এর জন্য কোন অতিরিক্ত সময় দরকার হয় না। ছাত্রছাত্রীদেরও প্রস্তুতির জন্য বেশি সময় দরকার হয় না।

প্রাথমিক মূল্যায়নের অসুবিধাগুলি হল —

● শিক্ষার্থীরা এক একটি খণ্ডিত অংশের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় সামগ্রিক ধারণা তৈরি হওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময়ই পাঠক্রমের প্রথমদিকে যে সব অংশ পড়া হয়েছে এবং যার মূল্যায়ন করা হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীরা তা ভুলে যেতে পারে।

● মূল্যায়নে তাৎক্ষণিক পদ্ধতি ব্যবহার করায় মূল্যায়নের যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করার কোন উপায় থাকে না। যথেষ্ট দক্ষ ও পক্ষপাতহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা না হলে, মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

● মূল্যায়ন ঘন ঘন হওয়ায় প্রচুর পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য জমা হয়। এগুলির সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার ক্রমশঃ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরফলে মূল্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

● প্রাথমিক মূল্যায়ন একই সঙ্গে বহু প্রতিষ্ঠানে করা যায় না। ফলে এই পদ্ধতিতে পাওয়া তথ্য আদান প্রদান করা বা তুলনা করা যায় না। মূল্যায়নের কোন কোন উদ্দেশ্য এর ফলে অপূর্ণ থাকে।

● প্রাথমিক মূল্যায়ন অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দলগত কার্যক্রম, দলগত সাফল্য, দলগত মূল্যায়ন, এইসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষাকার্যক্রমের সবটাই দলগত কার্যক্রম নয়।

● প্রাথমিক মূল্যায়নের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রম, দক্ষতা ও নিখুঁত পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতার উপর। এইগুলির অভাব ঘটলে প্রাথমিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষায় পর্যবসিত হয়।

● যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বছর কঠোর শৃঙ্খলা বজায় থাকে, কোন আকস্মিক কারণেও পরিকল্পনা রূপায়ণে বিঘ্ন ঘটে না এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত অংশের পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক ভাবে শেষ করা হয়, সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রাথমিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। স্বাভাবিক ভাবেই পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মূল কার্যক্রমের ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্যও কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার।

● প্রাথমিক মূল্যায়নের অর্ন্তনিহিত ধারণা হল, সমস্ত ছাত্রছাত্রীই একই গতিতে একই সময়ে শিখতে পারে। কিন্তু যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ মন্থর হয় তবে প্রাথমিক মূল্যায়ন তাদের উপর সুবিচার করেন না। বরং অন্তিম মূল্যায়নের বেলায় তারা কিছুটা নিজেদের মত করে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়।

সমস্ত সুবিধা অসুবিধা বিচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রচলিত থাকলেও পাঠক্রম শেষে

অন্তিম মূল্যায়নও করা হয়ে থাকে। কোন কোন মূল্যায়ন বিশারদ এই দুই প্রকার মূল্যায়ন ছাড়াও আরও কিছু কিছু শ্রেণি বিভাগ করেছেন। তার সব কয়টি স্বতন্ত্রভাবে তাৎপর্য পূর্ণ নয়। কারণ কোন না কোন ভাবে সেই শ্রেণি বিভাগগুলি অন্তিম ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের রকম ফের মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, মূল্যায়নকে অনেকে আভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যায়ন (Internal and External Evaluation) এইভাবে শ্রেণি বিভাগ করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বা বহির্মূল্যায়ন শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ভাবে পৃথক। যদি বাইরের অর্থাৎ অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকারা, অথবা বাইরের কোন পূর্বনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়, তবে তাকে বহির্মূল্যায়ন বলা হয়। বলাবাহুল্য আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, আভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যায়ন দুইই ধারবাহিক অথবা অন্তিম হতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বৎসরান্তে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন তা হল অন্তিম বহির্মূল্যায়ন। যদি শিক্ষা তত্ত্বাবধায়করা (Educational Supervisors) বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে ছাত্রছাত্রীদের কিছু পরীক্ষা করেন তবে তা ধারাবিক বহির্মূল্যায়ন কারণ তাঁরা পাঠক্রমের কোন খন্ডিত অংশের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন এবং তার উদ্দেশ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দুর্বলতাগুলি তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা।

এই কারণে মূল্যায়নের অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

সারসংক্ষেপ (Summary)

মূল্যায়ন, পরিমাপ, মানাঙ্কন, পরীক্ষা, মূল্যনির্ধারণ এই শব্দগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এরা খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। পরিমাপ হল কোন কিছুর বৈশিষ্ট্যকে পরিমাণসূচক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার নিয়মাবলী। সরাসরি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে পরিমাপ করা হয় না, তাকে আশ্রয় করে থাকা কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা হয়। পরিমাপের জন্য একক ব্যবহার করার প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ভৌত পরিমাপের মত এত সহজে একক নির্বাচন করা যায় না। এর কারণ সরাসরি ভৌত পরিমাপের এককগুলি প্রয়োগ করা যায় না। তাছাড়া পরিমেয় বৈশিষ্ট্যগুলির সংজ্ঞা সবসময় সুস্পষ্ট নয় এবং চল (Variable) হিসাবে তারা ধারাবাহিক (Continuous) নয়।

পরিমাপের জন্য চার প্রকার স্কেল ব্যবহার করা হয়। যখন সংখ্যাগুলিকে একটি পার্থক্য সূচক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয় নামবাচক স্কেল (Nominal Scale)। যখন পরিমেয় বৈশিষ্ট্যের ধর্ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন বা অনুরূপ কোন ক্রমানুসারে সাজানো যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত মান জানা থাকে না, তখন তাকে বলা হয় প্রাথমিক স্কেল (Ordinal Scale)। প্রাথমিক স্কেলের অন্তর্গত ক্রমগুলির ব্যবধান যখন নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয় কিন্তু ব্যবধানটি কত বড় বা ছোট হবে তার কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না তখন ঐ স্কেলকে বলা হয় আন্তর স্কেল (Interval Scale)। যদি পরিমাপের সূচনা শূন্য থেকে শুরু হয় এবং দুইটি পরপর অবস্থিত সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান সমান, তখন ঐ স্কেলকে বলে অনুপাত স্কেল (Ratio Scale)। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে অনুপাত স্কেল ব্যবহারে সুযোগ কম। প্রাথমিক ও আন্তর স্কেলের ব্যবহার বেশি।

মূল্যায়ন কথাটির সাধারণ অর্থ কোন কিছুতে মূল্য আরোপ করা। মূল্যায়নকে একটি প্রক্রিয়া (Process) এবং কার্যক্রম (Programme) এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়। প্রথমটি হল, মূল্য আরোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ ও বিচার করার প্রক্রিয়া আর দ্বিতীয়টি হল কোন্ পদ্ধতিতে মূল্য আরোপ করা হবে তার পরিকল্পনা। মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক, ধারাবাহিক, উদ্দেশ্যমুখী ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষার সমস্ত উপাদানগুলি যেমন পরস্পর সম্পর্কিত তেমনই মূল্যায়নও শিক্ষার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গো মূল্যায়নের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিকল্পনার গতিনির্দেশ করে, তেমনি মূল্যায়নেরও গতি নির্দেশ করে।

পরিমাপ মূল্যায়নের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলেও এদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পরিমাপের উদ্দেশ্য কিছুটা সংকীর্ণ এবং পরিমাপ আংশিক বা অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। পরিমাপ শুধুমাত্র পরিমাণগত তথ্য দিতে পারে, মূল্যায়ন গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্যের সমাহার। কোন কার্যক্রম শেষ হলে পরিমাপ করা যায়, মূল্যায়ন কার্যক্রম চলাকালীন ধারাবাহিকভাবেও হতে পারে। পরিমাপ বিশ্লেষণধর্মী, মূল্যায়ন একই সঙ্গো বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ ধর্মী।

মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে। পরিমাপ মূল্যায়নের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাপ। মূল্যায়ন যদি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হয় তবে পরিমাপ তার প্রকরণ। পরিমাপ মূল্যায়নকে নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্য দান করে এবং পরিমাপের ফলে মূল্যায়ন যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হয়। এছাড়াও মূল্যায়ন পরিমাপ পদ্ধতির পরিবর্তন সূচনা করে এবং কখনও কখনও নতুন পরিমাপের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়।

মূল্যায়নের অপর একটি সহযোগী ধারণা হল পরীক্ষা। কোন পাঠক্রম শেষ হলে ছাত্রছাত্রীদের শিখনের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য যে অভীক্ষণ তাই হল পরীক্ষা। পরীক্ষা হল ছাত্রছাত্রীদের শিখনের মান নির্ণয় করার হাতিয়ার। পরীক্ষার মাধ্যমে শিখনের পরিমাণ ছাড়াও আরও কিছু শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা ও সক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষকদের পারদর্শিতারও পরিমাপ করে। ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের আপাত কঠিন ও নীরস বিষয়গুলিও শিখতে বাধ্য করে এবং তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। এছাড়াও পরীক্ষা শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ও বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তুলনা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

পরীক্ষার সঙ্গো মূল্যায়নের প্রধান পার্থক্য পরিমাপের মতই পরীক্ষাও একটি আংশিক প্রক্রিয়া। পরীক্ষা সময়সীমা ভিত্তিক, কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা একটি কার্যক্রম, সেখানে মূল্যায়ন অনেকটা নমনীয়। পরীক্ষা কখনও কখনও নির্বাচনমুখী হয়ে থাকে কিন্তু মূল্যায়ন নির্বাচনমুখী হয় না। মূল্যায়নে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিবিভাগ করার কাজকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করা হয় না কিন্তু পরীক্ষায় অন্যতম প্রদান উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্থান নির্দিষ্ট করা। অপরদিকে মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যেও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

মূল্যায়নকে প্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। কোন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর যে মূল্যায়ন করা

হয় তাকে বলা হয় অন্তিম মূল্যায়ন আর কার্যক্রম চলাকালীন তার ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার জন্য কিছু সময় পরে পরে ক্রমাগত মূল্যায়ন তাই হল প্রাথমিক মূল্যায়ন। উভয় প্রকার মূল্যায়নেরই কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। সেজন্য অনেক সময়ই দুই প্রকার মূল্যায়ন কার্যের মাধ্যমেই সামগ্রিক তথ্য আহরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১.৬ প্রশ্নাবলি

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। পরিমাপনের সূত্র লিখুন এবং এর চারটি মানদণ্ডের নাম লিখুন।
২। মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়?
৩। মূল্যায়নকে উন্মুক্ত (প্রশান্ত) এবং উপলব্ধ ধারনা বলা হয় কেন?
৪। মূল্যায়ন কিভাবে পাঠক্রমের সাথে সম্পর্কিত?
৫। মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যে দুটি পার্থক্যের আলোচনা করুন।
৬। প্রাথমিক মূল্যায়ন কাকে বলে?
৭। গঠনমূলক মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়—আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিন :

১। পরিমাপনের ধারনা ব্যাখ্যা করুন। মূল্যায়ন ও পরিমাপনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।
২। পরীক্ষাকে মূল্যায়নের অখণ্ড অংশ বলা হয় কেন? পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা করুন।
৩। মূল্যায়নের সূত্র বিশ্লেষণ করুন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। মূল্যায়নের স্তরগুলো আলোচনা করুন। প্রতিটি স্তরের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।
৫। মূল্যায়ন কী? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

একক ২ ❐ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন (Educational Objective and Evaluation)

গঠন (Structure)

সূচনা (Introduction)

উদ্দেশ্য (Objectives)

২.১ শিক্ষার উদ্দেশ্য-এর অর্থ

২.১.১ শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

২.২ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস

২.২.১ শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিবিভাগের পার্থক্য

২.২.২ প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য

২.২.৩ অনুভবমূলক লক্ষ্য

২.২.৪ শিক্ষার সঞ্চালনমূলক লক্ষ্য

২.৩ শিক্ষার উদ্দেশ্যের উৎস

২.৩.১ মূল্যায়নে শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রয়োগ

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.৫ অনুশীলনী

সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী এককে মূল্যায়নের সঙ্গো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে সম্পর্ক সে সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, প্রাথমিক ভাবে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির সঙ্গো মূল্যায়নের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই শিক্ষাবিদ্‌রা সচেতন ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শিক্ষণ কার্যের উন্নতিবিধানের জন্য আরও দক্ষতার সঙ্গো কাজে লাগানোর পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তার ফলে শিক্ষার তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র

যে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাই নয়, শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যারও (Education Technology) প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। আর এই পরিবর্তন ও উন্নতির হাত ধরেই কিছু কিছু নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান এককটিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়নের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে। দেখা যাবে যে বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং তত্ত্বই সামগ্রিকভাবে শিক্ষার নিয়ন্ত্রা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্যর শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণিবিভাজন ও শ্রেণিবিন্যাসের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষার অনুভবমূলক উদ্দেশ্যগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যগুলির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির উৎস সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারবেন।
- মূল্যায়নে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে প্রযুক্ত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

২.১ শিক্ষার উদ্দেশ্য-এর অর্থ (Meaning of Educational Objectives)

যে কোন কার্যক্রমেরই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। কার্যক্রমের বাঞ্ছিত চরম পরিণতি বা ফলাফল সম্বন্ধে যে অগ্রিম ধারণা বা পরিকল্পনা তাই হল কার্যক্রমটির উদ্দেশ্য। শিক্ষার মত বহুমুখী, জটিল ও স্তরবিভক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যও স্বাভাবিক ভাবেই জটিল ও বহুমুখী। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যর বিশদ আলোচনার পূর্বে আরও কয়েকটি ধারণা সম্বন্ধে কিছুটা জানা প্রয়োজন।

শিক্ষা (Education), শিক্ষণ (Teaching) এবং নিবিড় শিক্ষণ (Instruction) এই তিনটি ধারণা পৃথক হলেও পরস্পর সম্পর্কিত। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক জীবন ব্যাপী কর্মকাণ্ড যা বহু কার্যক্রমের সমন্বয়ে মানুষকে সক্রিয়তার মাধ্যমে ক্রমাগত অসংস্কৃত অবস্থা থেকে সংস্কৃত করে তোলে। এই সংস্কার বা প্রগতিমুখী পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষণ। প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণের ভূমিকা অপরিহার্য। যখন ব্যক্তিবিশেষের সচেতন

প্রয়াসে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর দরুন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসে তখন ঐ প্রয়াস হল শিক্ষণ আর ব্যক্তিটি হলেন শিক্ষক। শিক্ষণকে বলা হয় একাধারে বিজ্ঞান ও কলা। কারণ শিক্ষণ প্রধানভাবে শিক্ষকের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুকে কেমন করে উপস্থাপিত করলে তা চিত্তাকর্ষক হবে, ছাত্রছাত্রীরা সহজে শিখতে পারবে তার পরিকল্পনা শিক্ষকের নিজস্ব এবং তা কখনই খুব ঋজু নয়। বরং উপস্থিত প্রয়োজনে যথেষ্ট নমনীয়তার সঙ্গে শিক্ষক পঠন পাঠন পরিচালনা করেন। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে বক্তৃতা, নমুনা প্রদর্শন, ব্যাখ্যা দান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি কয়েকটি প্রকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষকের একটি অস্পষ্ট চেতনা থাকে কিন্তু তা কখনই তাঁর কাজের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় না। বরং শিক্ষার সামগ্রিক ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য (Aims) সম্বন্ধে তাঁর চেতনা থাকে বেশি।

অন্যদিকে নিবিড় শিক্ষণ একটি ঋজু, পরিকল্পিত প্রয়াস যেখানে শিক্ষকের প্রতিটি কাজের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ছক থাকে। এখানে শিক্ষণ প্রক্রিয়া একটি খণ্ডিত কার্যক্রমের যোগ ফল। প্রতিটি খণ্ডিত অংশের লক্ষ্য ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই শিক্ষার বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। এই জন্যই বলা হয় নিবিড় শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা একজন সহায়ক এবং মধ্যস্থ ব্যক্তি যিনি শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন। এই পরিবেশ বা পরিস্থতিতে শিক্ষার্থী নিজেই তার জ্ঞান ভাণ্ডার সংগঠিত করে নিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই নিবিড় শিক্ষণের পরিকল্পনায় শিক্ষক সরাসরি সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন না। তিনি তথ্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ তৈরি করে দিলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তথ্য আহরণ করে তাদের বিন্যস্ত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন কোন নিবিড় শিক্ষণবিদ্ মনে করেন শিক্ষার্থীরা এক একজন আবিষ্কারক (Discovery Learning, Joseph Bruner)। তাঁদের সামনে শুধু আবিষ্কারের পথটা খুলে দেওয়া দরকার।

একথা মনে রাখা দরকার শিক্ষণ ও নিবিড় শিক্ষণের মধ্যে এই সব পার্থক্যের উদ্ভব বিভিন্ন তাত্ত্বিক মতবাদের বিরোধিতা থেকে। কার্যক্ষেত্রে শিক্ষণ ও নিবিড় শিক্ষণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া কঠিন। যৌক্তিক শিক্ষণ (Reflective teaching) এই কথাটির মধ্যে reflective এর আভিধানিক অর্থ চিন্তাশীল বা সুচিন্তত) নামক শিক্ষণ প্রক্রিয়াতে শিক্ষণের কলাশৈলির সঙ্গে নিবিড় শিক্ষণের সুচিন্তিত উদ্দেশ্যমুখিতার সমন্বয় ঘটে। এজন্য অনেকে বলেন যৌক্তিক শিক্ষণই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই সব আলোচনা থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে শিক্ষণ, নিবিড় শিক্ষণ বা যৌক্তিক শিক্ষণ যাই হোক না কেন তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিক্ষা নামক বৃহত্তর কর্মকাণ্ডটিকে সার্থক করে তোলা। এই কারণে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনায় শিক্ষা, শিক্ষণ, নিবিড় শিক্ষণ, যৌক্তিক শিক্ষণ ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য না করে, পরবর্তী সমগ্র অংশে শিক্ষার লক্ষ্যে (Educational objectives) হিসাবেই বিষয়টি বিচার করা হবে।

প্রথাগত শিক্ষার একদিকে আছে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া (Learning process)। শিখন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা নানা গবেষণায় দেখেছেন, শিখন যেমন অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তেমনি শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সুশৃঙ্খল মানসিক কার্যকলাপের মাধ্যমে যার ফলে শিক্ষার্থীর মনোজগতে এবং আচরণে স্থায়ী এবং উন্নত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন পরবর্তী শিখনের ভিত্তি তৈরি করে। অর্থাৎ শিখন একটি নিরন্তর ধরাবাহিক প্রক্রিয়া। এই জন্যই শিক্ষাও এক ধারাবাহিক কার্যক্রম।

শিক্ষার অপরদিকে আছে শিক্ষণ। যে ধরনের শিক্ষণই হোক না কেন সেখানে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে শিখনের শর্ত ও মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে, শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার কাজে সাহায্য করতে হয়। সুতরাং শিক্ষকের একটি অগ্রিম ধারণা থাকা প্রয়োজন যে তাঁর কোন আচরণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনজনিত আচরণের কী পরিবর্তন ঘটবে বা কোনও বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে হলে, তাঁর নিজের আচরণকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে এই যে অগ্রিম ধারণা তাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

কিন্তু শিক্ষার যে উদ্দেশ্য শিক্ষক স্থির করেন তা কোন মনগড়া বা বিমূর্ত ধারণা নয়। এই সব পরিবর্তনগুলি শিক্ষার্থীর আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। এর কারণ হল পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ না করা গেলে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। কোন পাঠক্রম সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠক্রম শুরু করার পূর্বেকার আচরণের সঙ্গে পরবর্তী আচরণের যে পার্থক্য সেটুকুই হল আচরণের পরিবর্তন। এই আচরণ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। শিক্ষক পাঠক্রমটি শুরু করার সময় জানেন তিনি কোন পর্যায়ে শুরু করছেন এবং শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীর আচরণ কেমন হবে। এই কথাটি শুধুমাত্র কোন দীর্ঘ পাঠক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, যে কোন একক পাঠ্যাংশের (Unit lesson) বেলাতেও তা সমান সত্যি।

সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগত লক্ষ্য হলে একই পাঠ্যাংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক ভিন্ন উদ্দেশ্য স্থির করতে পারেন, আবার একই পাঠ্যাংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য উদ্দেশ্য আলাদা হতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যাতে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক (objective) হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলিকে স্পষ্ট ভাষায় পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রকাশ করো। আর এই কাজটি কোন মনোবৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ভিত্তি ছাড়া করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার দর্শন যে সব বৃহত্তর উদ্দেশ্য স্থির করে দেয় সরাসরি মানুষের আচরণে তার পরিমাপ করার কোন মাপকাঠি নেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নীতিতে কোন অস্পষ্টতার স্থান নেই। স্কিনারের (B. F. Skinner) প্রবলন তত্ত্ব (RenIforcement theory) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি স্থির করে দিয়েছে এবং তার প্রকারভেদ নির্ণয়ে ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পাঠে স্কিনারের শিখন তত্ত্ব যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সার কথা হল, মানুষের যে কোন আচরণই শিখনের ফল। উপযুক্ত প্রবলকের মাধ্যমে এই আচরণগুলি স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়। প্রবলন সবসময়ই একটিমাত্র আচরণকে স্থায়ীত্ব দেয় পরে ধীর ধীরে তার সামান্যীকরণ (Generalisation) ঘটে। অন্যদিকে কোন স্থায়ী

আচরণকে পরিবর্তন করতে হলে প্রবলকের প্রত্যাহার ((withdrawal or reinforcer) ও নেতিবাচক প্রবলকের (Negative reinforcer) সাহায্যে ঐ আচরণটির অবলুপ্তি ঘটানো হয় এবং তার পরিবর্ত আচরণটিকে ইতিবাচক প্রবলকের সাহায্যে স্থায়ী আচরণে পরিণত করতে হয়। এই নীতি অনুযায়ী শিখন প্রবলনের উপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় বিদ্যালয় শিখন কতগুলি খণ্ড খণ্ড আচরণের প্রবলন মাত্র। যদি প্রতিটি খণ্ড আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে হয় তবে যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটানো হবে, আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী তাই হল, শিখনের লক্ষ্য। অর্থাৎ স্কিনারের শিখন তত্ত্ব সরাসরি শিক্ষার লক্ষ্যগুলি ও তাদের কাঠামোকে স্পষ্টতা এনে দিয়েছে।

যেহেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য খণ্ড খণ্ড আচরণ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ভাবে মানুষের মধ্যে বহু বাঞ্ছিত আচরণের সমন্বয় ঘটানো, সেহেতু শিক্ষার লক্ষ্যগুলির বিশ্লেষণ, বিন্যাস প্রয়োগ সম্বন্ধে জানা যে কোন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

মানুষের আচরণ সরল থেকে জটিল হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষা সরল থেকে জটিল, সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা অভিমুখে চালিত। সেজন্য শিক্ষার লক্ষ্যগুলিও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। প্রাথমিক বা তাৎক্ষণিক লক্ষ্য দিয়ে শুরু করে আরও উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। তখন শিক্ষা শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক আচরণের সমষ্টিমাত্র থাকে না, তাদের সমন্বয়ের ফলে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। যেমন,

● শিক্ষা কার্যক্রমের গতি ও দিক্ নির্দেশ করার জন্য উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। কোন কার্যক্রম হয় শুধুমাত্র তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আবার কোন কার্যক্রমের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ত বিচার বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন করা। কার্যক্রমের গতি প্রকৃতি নির্ভর করবে এই ধরনের লক্ষ্যগুলির উপর।

● বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত দুটি উদাহরণে কার্যক্রমের প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটির ক্ষেত্রে তথ্যের সমাবেশ ঘটানোর পর শিক্ষার্থী কী, কোন্‌টি, কতগুলি, কখন ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সে কেন, কীভাবে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করবে। ফলে লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যক্রমের প্রকৃতিও হবে ভিন্ন।

● উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন পরিকল্পনা রচনা করা যায় না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে সার্থক কোন পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনার গতি, প্রকৃতি, কার্যকারিতা, তাৎপর্য বিচার বা মূল্যায়ন ও পরিমার্জনা কোন কিছুই লক্ষ্য নিরপেক্ষ নয়।

● শিক্ষার লক্ষ্য পঠনপাঠনের প্রধান ভিত্তি। শিক্ষার্থী এর ফলে বুঝতে পারে তার কাছে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে আর শিক্ষক নিশ্চিত থাকেন তিনি কী করতে চাইছেন বা কেন চাইছেন। এর ফলে সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। শিক্ষার মান ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

● শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও তার সদ্ব্যবহার শিক্ষার বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে সংহতি এনে দেয়। পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, ফলাফলের তাৎপর্য বিচার এই সব বিষয়গুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই সুসংহত কার্যক্রমে পরিণত হয়।

● বলাবাহুল্য শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়নের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। যেমন মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন রচনার সময় শিক্ষার্থীকে কোন্ কাজটি (Task) সম্পন্ন করতে বলা হবে। যদি শিক্ষক প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে থাকেন তবে নির্বাচিত কাজটি সেই উদ্দেশ্যেই স্থির করা হবে। না হলে পঠন পাঠন ও মূল্যায়নের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় মূল্যায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

● শিক্ষায় নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and counseling) একটি আবশ্যিক কার্যক্রম। শিক্ষার লক্ষ্য এই কার্যক্রমের প্রাথমিক উপাদানগুলির অন্যতম। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিতে হলে তার জন্য প্রথমেই উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির করা দরকার। পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যগুলি সার্থকভাবে অর্জন করার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। এই কাজে সহায়তা করার নামই নির্দেশনা দান।

● যে ক্ষেত্রে পাঠক্রম নির্বাচনের সুযোগ আছে সে ক্ষেত্রেও লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান পাঠক্রম নির্বাচনের সহায়ক। শুধু তাই নয়, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম স্থির করার বেলাতেও এই লক্ষ্যগুলির কিছু ভূমিকা আছে।

● শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন, প্রচেষ্টার সাফল্য, ব্যর্থতা ও সাফল্যের মান শিক্ষার্থীদের শক্তি (Strength) ও দুর্বলতার (Weakness) স্থানগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে তার প্রতিবিধানেও সাহায্য করে।

● শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের একটি সাধারণ ভাষা (Common Language) হিসাবে কাজ করে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে সাহায্য করা হয়।

● কখনও কখনও শিক্ষার লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অসাফল্য এবং শিক্ষকদের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং শিক্ষকের কার্যকরী সার্থকতা (Teacher effectiveness) বিচারের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

২.১.১ শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ (Type of Eduational Objectives)

পূর্ববর্তী অংশের সর্বত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ শিক্ষার লক্ষ্য এক প্রকার নয়। ক্লাসে প্রত্যক্ষ পঠন পাঠনের সময় শিক্ষকের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে, শিক্ষার্থীরা যা জানেনা অথচ তাদের জানা প্রয়োজন, সেইসব বিষয় জানানো। কিন্তু জানার প্রক্রিয়ার মধ্যেও অনেক রকমফের আছে। কারণ জানার উপযুক্ত তথ্য আবার বহু প্রকার। জ্ঞাত বিষয়গুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের ভাণ্ডার হিসাবে আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত করি না। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, প্রয়োগ আরও উচ্চতর জ্ঞানের সৃষ্টি করে। সুতরাং এদের প্রকারভেদও শিক্ষক ও শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জানা প্রয়োজন।

জানার কাজটি মানুষের সারাজীবন জুড়েই চলতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, জানার ফলে মানুষের মধ্যে আর কী কী পরিবর্তন হয়? সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জ্ঞান (Knowledge) সামগ্রিক ভাবে ব্যক্তি হিসাবে মানুষকে অনেক পরিবর্তন করে দেয়। একজন অজ্ঞ মানুষের তুলনায় জ্ঞানী মানুষের আচরণ ভিন্নরকম। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতির রাজ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটে।

অন্যদিকে, জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র মানসিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সক্রিয়তা ও সঞ্চালনমূলক ক্রিয়াগুলিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে না। পড়া, লেখা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি অসংখ্য সহযোগী ক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়। এই কারণে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞাণীরা প্রধানত তিন রকম লক্ষ্যের কথা বলেছেন। এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যকে প্রজ্ঞামূলক (Cognitive), অনুভবমূলক (Affective) এবং সঞ্চালনমূলক (Psychomotor) এই তিনটি বর্গে (Domain) ভাগ করা হয়েছে।

কিন্তু তিনটি শ্রেণির নাম জানাটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার লক্ষ্যগুলির প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে এদের শ্রেণি বিভাগের ভিত্তিটি ভালো করে জানা দরকার।

২.২ শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণি বিন্যাস (Taxonomy of Educational Objectives)

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করা নয়। শৈশবে তথ্য আহরণ করার মধ্যে দিয়ে বাইরের জগৎ জানার কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই এই তথ্যগুলির যথাযথ সমন্বয় সাধন করে, নানাভাবে কাজে লাগিয়ে, বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক মানুষই উন্নততর জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তোলে। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজেঁ থেকে শুরু থেকে আধুনিক প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যগুলির ধাপে ধাপে বিন্যস্ত হওয়ার দরুন শুধুমাত্র এদের শ্রেণিবিভাগ (Classification) করাই যথেষ্ট নয় স্তরবিন্যাসটি বোঝা দরকার। এখানে স্তর বা শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomy) এবং শ্রেণিবিভাগ (Classification) এই দুটি কথার পার্থক্য একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শ্রেণী বিভাগ একটি এক মাত্রিক (Unidimensional) পৃথকীকরণ। অর্থাৎ যখন একদল ব্যক্তি বা কিছুসংখ্যক বস্তুকে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের ভিত্তিতে দুটি বা তার বেশি পৃথক দলে ভাগ করা হয় তখন তাকে বলা যায় শ্রেণি বিভাগ। এর প্রধান শর্ত হল, কোন ব্যক্তি বা বস্তু শ্রেণিবিভাগ করার সময় একদলের প্রতিনিধিত্ব করলে অপরদলের প্রতিনিধিত্ব' করতে পারবে না। নারী-পুরুষ, পাশ-ফেল, অন্তর্মুখী-বহির্মুখী, ধাতু-অধাতু ইত্যাদি শ্রেণিবিভাগের এক মাত্রিকতার উদাহরণ। কোন একটি ব্যক্তি শ্রেণি বিভাগের সময় পুরুষ শ্রেণিভুক্ত হলে, একই সঙ্গে নারী শ্রেণিভুক্ত হতে পারবে না। সেদিক থেকে শ্রেণি বিভাগ একটি অপেক্ষাকৃত সরল বিভাজন প্রক্রিয়া।

কিন্তু যদি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু স্বাভাবিক ভাবে এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয় যে তাদের মধ্য উচ্চতর-নিম্নতর, উন্নত-কম উন্নত বা অনুরূপ কোন স্তর বর্তমান তখন সরল শ্রেণি বিভাগ করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য বা সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। উদ্ভিদ জগতের শ্রেণি বিন্যাস করার সময় প্রথমেই অপুষ্পক ও সপুষ্পক এই দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে এই ধারণাও দেওয়া হয়েছে যে অপুষ্পক উদ্ভিদ অপেক্ষা সপুষ্পক উদ্ভিদ্ উন্নততর। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে আরও শ্রেণিবিভাগ করার সময়ও বিন্যাসের ভিত্তিটি একই। প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেও যখন মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডী এইভাবে ভাগ করা হয়, তখন একথাও স্পষ্ট হয় যে মেরুদণ্ডীরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চেয়ে জৈবিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর।

সুতরাং শ্রেণিবিভাগের বেলায় যে প্রাথমিক শর্তটি বলা হয়েছে, শ্রেণিবিন্যাসে সেই শর্তটি ছাড়াও অতিরিক্ত হিসাবে উচ্চ-নিম্ন বা অনুরূপ কোন স্তর মাত্রা হিসাবে যুক্ত হয়। সেদিক থেকে, স্তরবিন্যাস প্রক্রিয়া বহু মাত্রিক। শিক্ষার লক্ষ্যগুলি যে ক্রমান্বয়ে সাধারণ তথ্য আহরণ থেকে শুরু হয়ে আরও উন্নততর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেজন্য এখানেও শ্রেণিবিভাগের চেয়ে শ্রেণিবিন্যাস অধিকতর উপযুক্ত। শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

২.২.১ শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য (Cognitive Objectives of Education)

বি. এস. ব্লুম (B. S. Bloom) ১৯৫৬ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Taxonomy of Educational Objectives গ্রন্থে প্রথম স্পষ্টভাবে বলেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। তিনি প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ স্তরবিন্যাস প্রকাশ করেন এবং এই স্তরবিন্যাস শিক্ষা চিন্তায় একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। তিনি জ্ঞানের স্তরগুলি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বলেছেন, জ্ঞান অনেকরকম আর এই স্তরগুলি অতিক্রম করেই মানুষ তার প্রজ্ঞামূলক ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

ব্লুম শুধুমাত্র স্তরগুলির স্তর ও নাম উল্লেখ করেই শেষ করেন নি। তিনি প্রতিটি স্তরের সংজ্ঞা ও বর্ণনা, এবং ঐ সব লক্ষ্য অর্জন করলে যে সব আচরণগত পরিবর্তন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘটবে তা স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে শিক্ষার দার্শনিক উদ্দেশ্যের মত উদ্দেশ্যগুলিকে কোন বিমূর্ত ধারণা হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলে যাতে এগুলিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার আচরণগত নির্দেশও তিনি দিয়েছেন।

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলি প্রধান ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

● **জ্ঞান (Knowledge) :** এইটি প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যর সর্বনিম্ন স্তর। অবগত হওয়ার অর্থ কোন কিছু সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যের বিষয়ে সচেতনতা। যিনি অবগত হয়েছেন, তিনি বলতে পারবেন আমি জানি। কোন তথ্যকে প্রায় অবিকল স্মৃতিতে ধরে রাখার নাম জ্ঞান। এই লক্ষ্যটি আবার আরও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত।

(ক) নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge about specifies) :

নির্দিষ্ট বিষয় বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যার কোন অন্য পরিচয়সূচক নাম বা বর্ণনা হওয়া সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির পরিচয় একটি নামের মধ্যেই ধরা থাকে। এই রকম নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে জানাই হল নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান। এই উদ্দেশ্য দুই প্রকার, যথা, সংজ্ঞা বিষয়ক জ্ঞান (Knowledge about Terminology) এবং নির্দিষ্ট তথ্যের জ্ঞান (Knowledge about facts)। এর প্রথমটি হল কোন বিষয়ের পরিচয়সূচক সংজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। সমতলে দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কমদূরত্বে সূচক রেখাকে সরলরেখা বলে, এটি একটি সংজ্ঞা। কিন্তু এখানে সংজ্ঞা অর্থে যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি অথবা ধারণার অনুরূপ পরিচয় সূচক নির্দিষ্ট বর্ণনাকেই সংজ্ঞা হিসাবে ধরা হয়। নির্দিষ্ট তথ্যের জ্ঞান অর্থাৎ কোন

ঘটনা, কোন স্থায়ী সম্পর্ক, যা অপরিবর্তনীয়, সে সম্বন্ধে জানা। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এই তথ্যটি সূর্য, পূর্বদিক এবং উদয় নামক ঘটনাটির মধ্যে যে স্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম—এটিও একটি ঘটনা। শিক্ষার এই ধরনের লক্ষ্য পূরণ হলে শিক্ষার্থী কোন কিছুর সংজ্ঞা, কিছু তথ্য বলতে পারবে বা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

(খ) **নির্দিষ্ট বিষয়ের চর্চা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about ways and Means to deal with specifics) :**

সংজ্ঞা বা তথ্য জানা হলে তার পরবর্তী পর্যায়ে নির্দিষ্ট বস্তুকে বা তথ্যকে কিভাবে চর্চা করা হয় তার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারবে। যেহেতু তথ্য জানা না থাকলে, পদ্ধতি জানা সম্ভব নয় সেহেতু এই লক্ষ্য পূর্ববর্তী লক্ষ্য থেকে উচ্চতর। পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান পাঁচ প্রকার।

(১) **প্রথা সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about convention) :** শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রথাগত ভাবে কিছু কিছু কাজ সম্পন্ন করা হয়। চর্চার পদ্ধতি হিসাবে প্রথাগত জ্ঞান কাজ সহজ করে দেয়। গুণ অঙ্ক করার সময় বড় সংখ্যাটিকে গুণ্য (Multiplicand) এবং ছোট সংখ্যাটিকে গুণক (Multiplier) হিসাবে লেখাই প্রথা। ভাজ্যকে মাঝখানে রেখে বাঁদিকে ভাজক এবং ডানদিকে ভাগফল লেখাই প্রথা। এই প্রথা সম্বন্ধে জানার লক্ষ্যই হল প্রথা সম্বন্ধে জ্ঞান।

(২) **গতি প্রকৃতি এবং পারম্পর্য সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about Trends and Sequences) :**

কোন একটি ঘটনা বা তথ্য যদি এমন হয় যে তা প্রায় স্বাভাবিক পারম্পর্যের ফল, অথবা কিছু সংখ্যক সুনির্দিষ্ট তথ্য একটি ক্রমানুসারে সাজানো থাকাটাই নিয়ম তবে ঐ ধরনের পারম্পর্য ও ক্রম সম্বন্ধে জানার লক্ষ্য হল গতি প্রকৃতি এবং পারম্পর্য সম্বন্ধে জ্ঞান। বেগুনী, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল ঐ 'বর্ণগুলির নাম জানা হল নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান এই লক্ষ্যের অন্তর্গত। এই লক্ষ্য পূরণ হলে অর্থাৎ নামগুলির জানা হলে, পরবর্তী লক্ষ্য হল এদের পরস্পর অবস্থান সম্বন্ধে জানা। আবার হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে যে কোন ডিগ্রিকোর্সে পড়া যায়, আগে নাম তালিকাভুক্ত করলেপরে কোন একটি সুযোগ পাওয়া যাবে এই ধরনের পারম্পর্য সম্বন্ধে জানাই হল গতিপ্রকৃতি ও পারম্পর্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৩) **শ্রেণি ও শ্রেণিবিভাজন সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about classification and Categories) :** আমাদের ধারণা গঠনের (concept formation) অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল শ্রেণি ও শ্রেণি বিভাজন। অসংখ্য নির্দিষ্ট তথ্য, নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষকে জানতে হয় কিন্তু একককভাবে প্রতিটি তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র শ্রেণি বিভাজনের মাধ্যমেই তথ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সেজন্য জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ের লক্ষ্য হল শ্রেণি এবং শ্রেণি বিভাজন সম্বন্ধে জ্ঞান। উদ্ভিদ বিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা পাতার শ্রেণি বিভাজন বা পুষ্পবিন্যাসের শ্রেণিবিভাজন করে অসংখ্য পাতা ও ফুলের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে। রসায়নের ছাত্রছাত্রীরা পর্যায় সারণির (Periodic Table) সাহায্যে মৌলিক পদার্থগুলির ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হয়, ভাষা শিক্ষার সময় পদগুলির শ্রেণি বিভাজন শিখতে হয়, এবং এই কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রেণি ও শ্রেণি বিভাজন সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থান করে।

(৪) **লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge of Criteria) :** কোন শ্রেণিবিভাজন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছাড়া সম্ভব নয়। এই কথার অর্থ হল, কোন্ গুণ, বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হবে তা স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। কিসের ভিত্তিতে একটি পদ বিশেষ্য বা বিশেষণ শ্রেণিভুক্ত হবে, তা স্থির করা না থাকলে পদগুলির শ্রেণি বিভাগ করা যাবে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন একটি বস্তু বা তথ্য একটি বিশেষ শ্রেণির অন্তর্গত কি না তা জানা হয়ে গেলে, কোন লক্ষণের ভিত্তিতে এই শ্রেণি বিভাজন সেটাও জানা দরকার। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, কোন একটি বস্তু বা তথ্য বিশেষ শ্রেণির অন্তর্গত হওয়ার দরুন কী কী গুণ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ইত্যাদি তার মধ্যে বর্তমান, সে সম্বন্ধে ধারণা নিশ্চিত হয় তখনই যখন শ্রেণি বিভাজনের লক্ষণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। লেবু টক স্বাদযুক্ত অতএব লেবুর রস অম্ল (Acid) বা লেবুর রস অম্লজাতীয় অতএব লেবুর স্বাদ টক হবে এই উভয় সিদ্ধান্তই নির্ভর করে অম্লের অন্যতম লক্ষণ টক স্বাদ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর।

(৫) **রীতি পদ্ধতির জ্ঞান (Knowledge about Methodology) :** সমস্যা সমাধানমূলক কাজ অথবা গতানুগতিক কাজ যাই হোক না, প্রতিটি কাজের একটি রীতি পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতি অনুসরণ না করলে কাজটি সম্পন্ন করা যায় না। কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে ফ্রিকোয়েন্সি টেবল্ (Frequency Table) তৈরি করা যাবে তার একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম আছে যা অবিকল পালন করতে হবে। না হলে ঐ সারণি তৈরি করা যাবে না। নির্দিষ্ট বিষয়ের চর্চা করা পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about ways and means to deal with specifics) পর্যায়ে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল এই ধরনের কার্যক্রম গুলির জ্ঞান। এখানে রীতি পদ্ধতি (Metodology) কথাটির অর্থ, বলাবাহুল্য একটি পূর্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম যার সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থা থেকে পর পর নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে।

(গ) সর্বজনীনতা ও বিমূর্তায়নের জ্ঞান (Knowledge about Universals and Abstraction) :

জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হল সর্বজনীনতাবোধ ও বিমূর্তায়ন। এখানে সর্বজনীনতার অর্থ হল জ্ঞানের সামান্যীকরণ (Generalisation)। যখন নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের পর শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত করতে পারে যে এই জ্ঞান একটি স্থানে, একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সর্বত্র একইভাবে প্রযোজ্য, তখন তার সামান্য ধারণা (Generalised Concept) হয়েছে বলা যাবে। পূর্বোক্ত উদাহরণের পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, যখন একটি নির্দিষ্ট তথ্য অবগত হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারবে যে, পৃথিবীর সর্বত্র সমস্তপ্রকার লেবুজাতীয় ফলই অম্লরসযুক্ত তখন একেই বলা হবে সর্বজনীনতাবোধ, সর্বজননীতা ও বিমূর্তয়ানের জ্ঞান হওয়ার ফল। শিক্ষার এই লক্ষ্য দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) **নীতি ও সামান্যীকরণের জ্ঞান (Knowledge of Principles and Generalisation) :**

উপরের অনুচ্ছেদে সর্বজনীনতা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার মূল কথা হল, শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন একটি বোধ জন্মানো যে অবগত বিষয়গুলি একক বা বিচ্ছিন্ন নয়। যে সাধারণ (Common) সূত্রের ভিত্তিতে একাধিক আপাত বিচ্ছিন্ন জ্ঞান একটি সামগ্রিক জ্ঞানে পরিণত হয় তাকেই বলা হয় নীতি (Principle)। নীতি বিপরীতক্রমে নতুন জ্ঞান সহজ করে দেয়। তখন পূর্বে অর্জিত নীতির ভিত্তিতে যে কোন নতুন বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীনতার অন্তর্গত করে নেওয়া যায়। এর ফলে নীতির

সংগঠন আরও দৃঢ় হয় এবং ক্রমশঃ একটি স্থায়ী সর্বজনীনতাবোধ তৈরি হয়। যদি গৃহীত নীতি এই হয় যে ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক ত্রিভূজটির ক্ষেত্রফলের সমান, তবে নীতিটি যে কোন ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্র, তা ছোট, বড় বা যেমনই হোক, তার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য প্রয়োগ করা যাবে। ওই বোধ ক্রমশঃ দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, যখন দেখা যায় কোন ত্রিভুজের বেলাতেই এর ব্যতিক্রম নেই।

(২) **তত্ত্ব ও সংগঠন সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge about Theories and Structure) :** অভ্রান্ত নীতি, প্রায় ব্যতিক্রমহীন নীতিই শেষপর্যন্ত তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয়। কখনও কখনও একাধিক নীতির সমন্বয়েও এক একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান পর্যায়ে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল জ্ঞাত বিষয়গুলির শেষ পর্যন্ত একটি তত্ত্বে সংহত হওয়া। কোন প্রতিক্রিয়া (Response) পুরস্কৃত হলে সেই প্রতিক্রিয়াটি বার বার করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সেটি স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়, এই নীতি যখন সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীন ভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তখন নীতিটি একটি তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয় (প্রবলন তত্ত্ব বা Reinforcement theory)। সংগঠন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সংগঠন (Structure) কথাটি এখানে একাধিক নীতির সমন্বয়ে জ্ঞানের জটিল পরস্পর সম্পর্কিত আকৃতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের জ্ঞান সর্বোচ্চ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক তত্ত্বের সংগঠন মাত্র।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জ্ঞান অন্যসব কিছুর ভিত্তি কিন্তু প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য এখানেই শেষ হয়। পরবর্তী স্তরে আছে আরও পাঁচটি পর্যায়।

তাৎপর্যবোধ (Comprehension)

জ্ঞানের পরবর্তী স্তর হল তাৎপর্যবোধ। কোন কিছু জানার পর বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি একত্রিত করে সমগ্রভাবে যে অর্থবোধ হয় তাকেই বলা হয় তাৎপর্যবোধ (Comprehension)। মর্ম গ্রহণ, অন্তর্নিহিত অর্থবোধ ইত্যাদি কথাগুলির কেন্দ্রে আছে তাৎপর্যবোধ। এক, দুই, তিন এই সংখ্যাগুলি এককভাবে জ্ঞান পর্যায়ে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন ধারণা হিসাবে গৃহীত হওয়ার পর যখন ৩২১ এই সংখ্যাটি লেখা হয় তখন, প্রতিটি একক, তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও অবস্থানগত মূল্য এই সব মিলে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থবোধ নিয়ে আসে। এই হল তাৎপর্যবোধ। তাৎপর্যবোধ হল জ্ঞানের উচ্চতর লক্ষ্য। এই পর্যায়ে তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

(ক) **রূপান্তরণ (Translation) :** কোন তথ্যের তাৎপর্যবোধ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল শিক্ষার্থী ঐ তথ্যের রূপান্তর ঘটাতে পারবে। একটি তত্ত্ব, যা জ্ঞান পর্যায়ের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার রূপান্তর ঘটানোর অর্থ যেভাবে তত্ত্বটি আছে তাকে অন্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা জন্মানো। যেমন ত্রিভুজের তিনটি কোণর সমষ্টি দুই সমকোণের সমান—এই তত্ত্বটির তাৎপর্যবোধ হলে শিক্ষার্থীরা তাকে অন্যভাবে লিখতে পারবে (মনে করা যাক, যদি তিনটি রেখা এমনভাবে একটি তলকে বেষ্টন করে যে তার ফলে উৎপন্ন অন্তস্থ কোণগুলির সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হয়, তবে ঐ বেষ্টিত ক্ষেত্রটি একটি ত্রিভুজ, এইভাবে লেখা হল)।

(খ) **সংব্যাখ্যা (Interpretation) :** কোন বিষয়বস্তুর মধ্যে সরাসরি যে কথা বলা হয়নি কিন্তু পরোক্ষভাবে ভিন্নতর তাৎপর্যের ভিত্তিতে সেরকম কোন সিদ্ধান্ত, অর্থ ইত্যাদি অন্বেষণ ও প্রকাশ করা সংব্যাখ্যা দানের কাজ। সংব্যাখ্যা দানের ফলে কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিন্ন তাৎপর্য পাওয়া যায়। যেমন, কোন কবিতা বা গদ্যাংশকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দান কিংবা ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে অন্য ধরনের ব্যাখ্যাদান এইগুলি সংব্যাখ্যাদানের উদাহরণ।

(গ) **তাৎপর্য অন্বেষণ (Extrapolation) :** সংব্যাখ্যার পরবর্তী স্তর হল তাৎপর্য সন্ধান। তাৎপর্যবোধের এইটিই চূড়ান্ত প্রকাশ। কোন পাঠ্যাংশ যে উদ্দেশ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে, তাৎপর্যবোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থী তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরতর অর্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা চর্যাগীতির আক্ষরিক অর্থের বাইরে তার যে গূঢ় অর্থ আছে তা উদ্ধার করতে পারেন— এটি হল সংব্যাখ্যা দান। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যখন চর্যাগীতির মধ্যে সমকালীন সামাজিক চিত্রের সন্ধান করা হয়, তা হল তাৎপর্য অন্বেষণ (Extrapolation)।

প্রয়োগ (Application)

শিক্ষার অন্যতম সার্থকতা হল অর্জিত শিক্ষাকে জীবনের নানাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারার দক্ষতার মধ্যে। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বাস্তব সমস্যা সমাধান, অন্য কোন শিক্ষা আয়ত্ত করার সময়, অথবা বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার নামই হল প্রয়োগ (Application)। জ্ঞান সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলি অর্জন করা হলে তখনই অবগত বিষয়কে প্রয়োগ করার দক্ষতা জন্মায়। যেমন গণিতের কোন সূত্র শেখা হলে ঐ সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা। সন্ধির সূত্রগুলি জানা হলে তার সাহায্যে যে কোন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারা, সম্যক বিচ্যুতির (Standard Deviation) ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা হলে তার সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, এইগুলি প্রয়োগের উদাহরণ। যেহেতু বিষয়টি না জানলে এবং তার তাৎপর্যবোধ না হলে প্রয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে না, সেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে প্রয়োগ জ্ঞানের পরবর্তী বা উচ্চতর ধাপ।

বিশ্লেষণ (Analysis)

বিশ্লেষণ (Analysis) করার অর্থ কোন জটিল বিষয়, ধারণা বা সংগঠনের অপেক্ষাকৃত সরল অংশ, একক বা উপাদনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা। যে কোন জটিল সংগঠনের উপাদানগুলি বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে পরস্পরযুক্ত হয়ে সংগঠনটির নির্মাণ ঘটায়। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। কোন নিয়মে তারা সংগঠিত হয়েছে সেই নিয়মটিও বুঝে নেওয়া। স্পীয়ার ম্যান বুদ্ধির উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করেই কাজ শেষ করেন নি, উপাদানগুলির সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করে বুদ্ধি নামক জটিল ধারণাটির স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্রা যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করে যে সব উপাদান পাওয়া যায় তার বিশ্লেষণ যেমন করেছেন, তেমনি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সূত্রগুলিও ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে জ্ঞানের উপর এবং তারপরে প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞানকে আরও সুদৃঢ় করার উপর। আবার স্পীয়ারম্যানের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণের পূর্বে তিনি বুদ্ধির সংজ্ঞা, বুদ্ধির পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য এবং বুদ্ধির আচরণগত বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন, সেগুলির প্রয়োগ করেছেন এবং তারই ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য হিসাবে বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্লেষণের ফলেই কোন জটিল ধারণার সাংগঠনিক রূপটি বোঝা যায় এবং উপাদানগুলির মাধ্যমে তার সরলতম রূপ সম্বন্ধেও বোধ জন্মায়।

সংশ্লেষণ (Synthesis)

বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে একটি সংহত সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার নাম সংশ্লেষণ (Synthesis)। ছোট শিশুরা তাদের খেলনাগুলির বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে ফেলে (বিশ্লেষণ) কিন্তু আরও অনেক পরে ঐ অংশগুলিকে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ আগে বিশ্লেষণ ক্ষমতা আয়ত্ত হয় তার পরে আসে সংশ্লেষণ। ইতিহাস পাঠের সময় কোন রাজত্বের পতনের কারণগুলি একে একে আলাদা করে চিহ্নিত করা হল বিশ্লেষণ। কিন্তু কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনাকে একত্রিত করে, তাকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পরিণত করার কাজ হল সংশ্লেষণ। বলাবাহুল্য জ্ঞান, তাৎপর্যবোধ, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, এই ধাপগুলি অতিক্রম করে তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে সংশ্লেষণকে স্থান দেওয়া যায়।

মূল্যায়ন (Evaluation)

শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যগুলির চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে মূল্যায়ন (Evaluation)। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে মূল্যায়ন কথাটির অর্থ অর্জিত জ্ঞানের গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার ভালোমন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, নান্দনিক মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিচার। এই অন্তিম লক্ষ্যটি মানুষের জীবনে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন আনে। একটি কবিতা পড়ার পর শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাৎপর্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখা দেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া তথ্য ও যুক্তিগুলির তাৎপর্য বুঝতে পারলে তার সাহায্যে কবিতাটির বিশ্লেষণ করতে পারে এবং কবি, তাঁর কাব্যরীতি, অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ, এই সব তথ্য একত্রিত করে ঐ কবিতার রসগ্রহণ সম্পূর্ণ করতে পারে যা কবিতাটিকে তাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান করে তোলে। এইভাবে প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে কাব্য বিচার করার একটি স্থায়ী ক্ষমতা দান করে।

শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যগুলি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে ধারণার ফলে শিক্ষক গোড়াতেই স্থির করে নিতে পারেন তাঁরা শিক্ষার্থীর মধ্যে কী কী আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে চান। একটি সারণিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তার সঙ্গে যুক্ত আচরণগুলি উল্লেখ করা হল।

<u>সারণি ১ : শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় আচরণ।</u>

উদ্দেশ্যের স্তর	সাধারণ উদ্দেশ্য	নির্দিষ্ট আচরণ
জ্ঞান	সংজ্ঞা জানে, নির্দিষ্ট তথ্য জানে, নিয়ম জানে, গতিপ্রকৃতি ও ক্রমপর্যায়, শ্রেণি ও শ্রেণি বিভাগ জানে, পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।	সংজ্ঞা দিতে পারে, নাম উল্লেখ করতে পারে, বলতে পারে। চিহ্নিত করতে পারে। বর্ণনা করতে পারে, রূপরেখা দিতে পারে, পুনরায় বলতে পারে।
তাৎপর্যবোধ	রূপান্তর ঘটাতে পারে, সম্পর্ক বুঝতে পারে এবং তথ্য বুঝতে পারে।	সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারে, অন্যরকম করে বলতে পারে। অনুমান করতে পারে। সামান্যীকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দেশ্যের স্তর	সাধারণ উদ্দেশ্য	নির্দিষ্ট আচরণ
প্রয়োগ	নীতি বা সূত্রের ব্যবহার করতে পারে	কাজে লাগাতে পারে, সমস্যা সমাধান করতে পারে, নির্মাণ করতে পারে, প্রস্তুত করতে পারে, প্রদর্শন করতে পারে।
বিশ্লেষণ	গঠন ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারে। অকথিত ধারণাগুলি চিনতে পারে।	পৃথকীকরণ, পার্থক্য নির্ণয়, অংশ ও উপাংশগুলি চিহ্নিত করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে।
সংশ্লেষণ	নতুন সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে।	নক্সা প্রস্তুত করতে পারে। সংগঠিত করতে পারে, নতুন করে বিন্যস্ত করতে পারে। সংকলন করতে পারে, পরিবর্তন করতে ও সৃষ্টি করতে পারে।
মূল্যায়ন	বহির্লক্ষণের সাহায্যে বিচার করে। প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে।	মূল্যবিচার, তুলনা, পার্থক্য বিচার, সমালোচনা, যুক্তিসহ সমর্থন, ও রসগ্রহণ করতে পারে।

২.২.৩ শিক্ষার অনুভবমূলক উদ্দেশ্য (Affective Educational Objectives)

প্রজ্ঞামূলক মানসিক ক্রিয়াগুলির অন্যতম হল, বুদ্ধি, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, যুক্তি ইত্যাদি। একথা সহজেই বোঝা যায় এই মানসিক ক্রিয়াগুলি আমাদের জানা, বোঝা, প্রয়োগ করা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করা এবং মূল্যবিচার করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু এইসব ছাড়াও প্রতিন্যাস (Attitude), মূল্যবোধ (Values), আগ্রহ (Interest) ইত্যাদি অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা সরাসরি প্রজ্ঞামূলক মানসিক ক্রিয়া নয় কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অর্থাৎ শিক্ষা শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান বা প্রজ্ঞার জগতেই পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, তার ব্যক্তিত্বের অনুভবজগতেও (Affective World) পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনগুলি শিক্ষার অন্তিম ফল নয়। শিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীনই ধাপে ধাপে মনোজগতের এই সব পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার ফলে অনুভবমূলক পরিবর্তনগুলি অনেক সময়ই সরাসরি পরিমাপ বা প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু এগুলি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, পরবর্তী জীবনে অর্জিত জ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি মানুষ ভুলে যায় কিন্তু অনুভবমূলক পরিবর্তনগুলি স্থায়ীভাবে মানুষের আচরণে সারাজীবন ধরেই প্রকাশ পায়। অনুভবমূলক লক্ষ্যগুলি বিস্তারিতভাবে পাঠ করার সময় দেখা যাবে যে পরোক্ষভাবে কাজ করলেও পঠন-পাঠন এবং প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুভবমূলক পরিবর্তনগুলি একান্ত অপরিহার্য।

১৯৬৪ সালে ক্র্যাথওয়ল (Krathwohl), ব্লুম (Bloom) ও ম্যাসিয়া (Masia), শিক্ষার অনুভবমূলক

উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যগুলিও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। সেজন্য প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও ক্রমিক পরিবর্তন এই পর্যায়ের ক্ষেত্রেও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ্রহণমনস্কতা বা মনঃসংযোগ (Receiving or Attending)

ক্লাসে যখন পড়ার কাজ শুরু হয়, সাধারণত শিক্ষার্থীরা সকলেই তখন মনঃসংযোগের জন্য প্রস্তুত থাকে না। অথচ শিক্ষকের দিক থেকে যা কিছু উপস্থাপন করা হবে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকলে শিক্ষার কোন লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। সেজন্য অনুভবমূলক লক্ষ্যের প্রথম স্তর হল গ্রহণমনস্কতা বা মনঃসংযোগ (Receiving or Attending)। প্রকৃত মনঃসংযোগ ঘটার পূর্বে যে মানসিক প্রস্তুতি তাকেই বলা হয়েছে গ্রহণমনস্কতা। এই প্রস্তুতি তিনটি পর্যায়ে তৈরি হয়।

সচেতনতা (Awarness) : ক্লাসের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকের উপস্থিতি, ক্লাসের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার যে এখনই পঠন পাঠন প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করার পরেও অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের নিয়ে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে সেই অবস্থায় পড়ানোর কাজ শুরু করলে তার প্রথমদিকটা অনেকেই গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং শিক্ষকের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, তাঁকে সক্রিয়ভাবে এমন পদক্ষেপ নিতে হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা গ্রহণ মনস্ক হয়ে মনঃসংযোগ করতে প্রস্তুত হয়। এই কারণেই সচেতনতা সৃষ্টিকে সরাসরি শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রহণের ইচ্ছা (Willingness to receive) : সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া তথ্য, উদাহরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। ক্লাসের পড়া গ্রহণ করার জন্য এই প্রস্তুতি না থাকলে কোন তথ্যেরই জ্ঞান হতে পারে না। ক্লাসের সমস্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য কাজকর্ম খোলামনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য এবং এই প্রস্তুতি শুধু একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নয়। ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সমস্তটা জুড়েই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রিত বা নির্বাচিত মনোযোগ (Controlled or Selected Attention) : ক্লাসের মধ্যেকার অনেক কাজ কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর মনোযোগ হওয়া দরকার একমুখী। কারণ শিক্ষকের কথা বা অন্যান্য কাজ ছাড়াও আরও অসংখ্য উদ্দীপক নানাভাবে ক্লাস চলাকালীন সক্রিয় থাকে। আবার পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেক উদ্দীপক শিক্ষককে আশ্রয় করেও দেখা দিতে পারে। যেমন, শিক্ষক একই সঙ্গে কথা বলেন ও ব্ল্যাকবোর্ডে লেখেন (দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রত্যক্ষণ), শিক্ষকের হাঁটাচলা, কথা বলার ও মুখের ভঙ্গী ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক, কিছু কিছু শিক্ষার বাধা স্বরূপ (যেমন, শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের কথার চেয়ে তার মুখভঙ্গীর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়)। এই কারণে গ্রহণমনস্কতার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী যাতে তার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে নির্বাচিত অংশের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে এই শিক্ষাও শিক্ষারই অংশ। শিক্ষকেরই দায়িত্ব এই বিষয়টি ক্লাসে নিশ্চিত করা।

প্রত্যুত্তর দান (Responding) : মনোযোগ একটি চিরস্থায়ী অবস্থা নয়। তার বিচলন (Fluctuation)

ও বিদোলন (Oscillation) ঘটে। আবার শিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষার্থীর মনোযোগের উপস্থিতি বা অভাব সরাসরি জানা সম্ভব নয়। সেজন্য ক্লাসে পড়া চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যুত্তর দানের প্রস্তুতি তৈরি করে দিতে হয় শিক্ষককেই। সেজন্য মনঃসংযোগের পরের ধাপই হল প্রত্যুত্তর দান (Responding)। এই লক্ষ্যেরও তিনটি স্তর।

প্রত্যুত্তর দানে সম্মতি (Acquiesence in responding) : মনঃসংযোগ করার পর প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যও শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার। ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রীই শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চায়। এর কারণ উত্তরদানের প্রস্তুতির অভাব। এখানে উত্তর দেওয়া অর্থে শুধুমাত্র প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়াকেই বোঝায় না। ক্লাসের কাজ চলাকালনী শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি, দেহভঙ্গিমা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সবকিছুকেই বোঝায়। শিক্ষকের নির্দেশ মত কাজ করা, ক্লাসের নিয়মাবলী মেনে নেওয়া, অন্য ছাত্রছাত্রীর দেওয়া উত্তরের উপর মন্তব্য করা এরকম বহু আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যুত্তর দানের সম্মতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

প্রত্যুত্তর দানের ইচ্ছা (Willingness to responding) : প্রত্যুত্তরের সম্মতি থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরদানের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় নয়। শিক্ষক ক্লাসে পাঠ দান ও তার সঙ্গে যুক্ত নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলেন। সেই জন্যই উত্তর দেওয়ার ইচ্ছাকে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, যে শিক্ষক, ভুল উত্তর দিলে তা সংশোধন করে দেওয়ার পরিবর্তে বা উত্তর দিতে সাহায্য না করে শুধুই বকাবকি করেন, তাঁর ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দেওয়ায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বিপরীতক্রমে যিনি উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উৎসাহ দেন, সাহায্য করেন, তাঁর ক্লাসে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা সহজেই জাগ্রত হয়। স্বেচ্ছায় উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তুলে বা অন্যভাবে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা, ক্লাসের আলোচনায় অংশগ্রহণ করা এই সব আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যুত্তর দানের ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

প্রত্যুত্তরদানে সন্তুষ্টি (Satisfaction in responding) : স্বেচ্ছায় উত্তরদান করার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একধরনের তৃপ্তিদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। উত্তরদানের সাফল্য তারমধ্যে যে সন্তুষ্টি নিয়ে আসে তা পরবর্তী শিখনে সাহায্য করে। যদি ক্লাসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রকে ক্রমাগত কঠিন প্রশ্ন করা হয়, তাহলে ব্যর্থতার দরুন কখনই সে সঠিক উত্তর দেওয়ার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না। তার উত্তরদানের ইচ্ছা ও প্রস্তুতিও থাকবে না এবং পর্যায়ক্রমে মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছাও নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের অতিরিক্ত সহজ প্রশ্ন করলেও প্রায় একই ফল হতে পারে। তারা উত্তর দিয়ে তৃপ্তি না পাওয়ায় তাদের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নষ্ট হতে পারে। ক্লাসের সমস্ত কাজে অংশগ্রহণের প্রবল উৎসাহ, বিতর্কে-আলোচনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি শিক্ষার এই লক্ষ্যপূরণের প্রকাশ।

গুরুত্বদান (Valuing) :

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যদি গুরুত্বহীন মনে হয় তবে শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। ক্রমাগত প্রত্যুত্তরদানে সন্তুষ্ট হতে থাকলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয়, ক্লাসের কার্যক্রম,

বিতর্ক, আলোচনা, শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষণ প্রক্রিয়া সমস্তই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনটি পর্যায়ে এই গুরুত্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গুরুত্ব স্বীকার (Acceptance of Value) : যখন শিক্ষার্থী মেনে নেয় যে শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান তখন সে গুরুত্ব স্বীকারের পর্যায়ে উপস্থিত হল। শিক্ষকের নির্দেশ মেনে কোন কাজে সফল হলে শিক্ষার্থী যে আনন্দ পায় তা শিক্ষণীয় বিষয়কে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। সুতরাং শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারবেন কি না তা নির্ভর করে পূর্ববর্তী লক্ষ্যগুলি সঠিকভাবে অর্জন করার উপর।

মনোনীত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ (Preference for Value) : শিক্ষণীয় বিষয়ের সমস্ত অংশের গুরুত্ব শিক্ষার্থীর কাছে সমান হয় না। কোন পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার পর সে অংশ বিশেষের উপর স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। শিক্ষাদানের রকমফের, শিক্ষকের আচরণ, পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি নানা কারণে শিক্ষার্থীর কাছে এক একটি অংশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এর ফলে সে ক্রমশ বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে শেখে, বিচার বিশ্লেষণ ও বিনিশ্চয় তাকে নির্বাচিত অংশের স্বতন্ত্র গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। যেমন, শিক্ষক নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন তুলে ধরার পর কোন ছাত্রের কাছে হয়ত স্নায়ুতন্ত্রের পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে।

আনুগত্য (Commitment) : এখানে আনুগত্য কথাটির অর্থ কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি একাত্মতা ও একনিষ্ঠতা। পাঠ্য বিষয়ের অংশ বিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে, ক্রমশ শিক্ষার্থীর কাছে সমগ্র বিষয়টিই এমনভাবে মূল্যবান করে তোলে যে সে বিষয়টির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। আমার বিষয় গণিত, আমি গণিত ভালোবাসি কারণ গণিত পৃথিবীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়, গণিত একটুও কঠিন বিষয় নয় বেশ সহজ, এই জাতীয় অনুভূতি হল আনুগত্যের লক্ষণ। বিষয়ের প্রতি আনুগত্য শেষপর্যন্ত মানুষের চরিত্রে স্থায়ীভাবে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এই অবস্থায়, বিনা প্ররোচনায় তার বিষয়টির পাঠ চর্চা ও প্রসারে উৎসাহী হয়ে ওঠে মানুষ। নিজের জানা বিষয় অন্যকে শেখাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিশুরা প্রাথমিক বা প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন কিছু শিখে আসার পর বিষয়টি তার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে তার প্রতি সাময়িক শিশু সুলভ একটি আনুগত্য বোধ জন্মায়। তার ফলে বাড়িতে তার শেখা বিদ্যাটি অন্যদের শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সংগঠন (Organisation) :

কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন তত্ব, তথ্য ও অন্যান্য উপাদানগুলির প্রতি ক্রমাগত আনুগত্য জন্মানোর ফলে, বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের বিচারবোধ গড়ে ওঠে। এইটিই মূল্যবোধের সংগঠন। দুটি স্তরে এই সংগঠন সৃষ্টি হয়।

গুরত্ববোধের ধারণা গঠন (Conceptualization of Value) : যখন শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ আর স্বতন্ত্রভাবে না থেকে, তার সামগ্রিক ও স্থায়ীও স্থায়ী মূল্যবোধের অংশীভূত হয়ে যায়, তখন তার মূল্যবোধ একটি স্থায়ী ধারণায় পরিণত হয় যা তার আচরণকে সম্পূর্ণভাবে

নিয়ন্ত্রণ করে। পুর্বোক্ত উদাহরণের গণিতপ্রেমী ব্যক্তি যখন তার গণিত সংক্রান্ত মূল্যবোধকে স্থায়ী ধারণায় পরিণত করেন, তখন গণিত তাঁর আচরণকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করে।

মূল্যবোধের পরম সংগঠন (Organization of a Value System) : সংগঠিত মূল্যবোধ ক্রমশ একটি জটিল পরম সংগঠনে পরিণত হয়। এই সংগঠন মানুষের বিচারবোধের প্রধান পরিস্রাবক (Filter) হিসাবে কাজ করে। সাহিত্যিক মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ, দার্শনিক মূল্যবোধ জাতীয় কথাগুলি আর কিছুই নয়, শুধু এক একটি স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। এইগুলি সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শনের বিভিন্ন ধারায় গুরুত্বদানের ফলে তৈরি হওয়া এক একটি মূল্যবোধের পরম সংগঠন। শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য (Aims of Education) মানুষের মধ্যে এই চরম মূল্যবোধের সংগঠন সৃষ্টি করা।

মূল্যবোধের মাধ্যমে চরিত্রায়ণ (Characterisation by value or value complex) : এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছিল যে গুরুত্ববোধ ক্রমাগত যে জটিল মানসিক ধারণা সৃষ্টি করে তা মানুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনা, জীবন যাপন, বিচার বিশ্লেষণ, কার্যকারণ ব্যাখ্যা, যাই হোক না কেন, সর্বত্র ব্যক্তির মূল্যবোধের জটিল সংগঠন, যা চরিত্রের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তার প্রভাব পড়ে। একজন দর্শনের ছাত্র, একজন বিজ্ঞানের উপাসক, সাহিত্য, গণিত কিংবা অর্থনীতির প্রতি অনুগত মানুষ জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীও সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। একজন মনোবিজ্ঞানী কোন শিক্ষার্থীর অসঙ্গত আচরণের কারণ হিসাবে তার অভিযোজন ও মানসিক সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে পারেন, একজন সমাজতাত্ত্বিক সেখানে, তাকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন।

সুতরাং শিক্ষার অনুভবমূলক লক্ষ্যগুলি শুধুমাত্র যে প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য অর্জনের আবশ্যিক একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে তাই নয়, প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্য অর্জনের পরও অর্জিত জ্ঞানকে আরও চারিত্রিক স্থায়ীত্ব দান করে। মানুষ একসময় অর্জিত জ্ঞানের অনেক কিছুই ভুলে যায় বা অর্জিত তথ্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকায় অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সারাজীবন স্থায়ী হয়।

২.২.৪ শিক্ষার সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য (Psychomotor Objectives of Education)

শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক ও অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের মতই সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চালন (Psychomotor) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে একটি বিশেষ অর্থে। শরীরের পেশীগুলির সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার করার দরুন আমাদের যে দক্ষতা (Skill) জন্মায় এবং যে দক্ষতা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তাই হল সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (Psychomotor skill)। হাঁটা, দৌড়ানো, লেখা, ছবি আঁকা বা অন্য যে কোন কাজ করা, কথা বলা, ইত্যাদি অসংখ্য সঞ্চালনমূলক দক্ষতা প্রতিনিয়ত আমাদের নির্দিষ্ট কাজ করতে সাহায্য করে। এই দক্ষতাগুলির জন্য পরিনমণ (Maturation) যেমন দরকার তেমনি দরকার শেখার সুযোগ (Opportunity to learn) এবং প্রশিক্ষণ (Training)। বলাবাহুল্য সঞ্চালনমূলক দক্ষতাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালে এলিজাবেথ সিম্পসন (Elizabeth Simpson) সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশ করেন। তাঁর শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম পর্যায়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষণের উপর।

প্রত্যক্ষণ (Perception) :

শিক্ষার সূত্রপাত এবং প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়ার নাম প্রত্যক্ষণ। এখানে প্রত্যক্ষণ কথাটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রাহক স্নায়ুর (Receptor) উত্তেজনা প্রসূত যে মানসিক প্রক্রিয়ার কথা আমরা জানি, তার অতিরিক্ত কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে কোন উদ্দীপক আমাদের দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে যখন উদ্দীপিত করে তখন সেই উদ্দীপনা স্নায়ুবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছালে প্রাথমিক সংবেদন প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। তখন আমরা যা দেখছি বা শুনছি তার অর্থবোধ করতে পারি। কিন্তু শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে করা হয়, এই ঘটনা যান্ত্রিকভাবে ঘটতে পারে না। তার জন্য সংবেদন গ্রহীতার কিছুটা প্রস্তুতির দরকার হয়। এটাই হল প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ শুধুমাত্র দেখা বা শোনা নয় তার শারীর মানস (Physio-psychological) প্রস্তুতিও। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে এই প্রস্তুতি তিনটি স্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

সংবেদনের উদ্দীপনা (Sensory Stimulation) : এর অর্থ, সংবেদন গ্রহণ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ ও সতর্ক রাখা যাতে প্রত্যক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন উদ্দীপনাই যেন চেতনার বাইরে না থেকে যায়। যখন শিক্ষক একটি ম্যাপ এঁকে দেখাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিবরণ মুখে বলে যাচ্ছেন, তখন শিক্ষার্থী তাঁর হস্তচালনার প্রতিটি খুঁটিনাটি, কথার প্রতিটি অংশ শোনার জন্য তার ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্মুখ করে রাখে, যাতে কোন কিছু দৃষ্টি বা শ্রবণ এড়িয়ে না যায়। একেই এখানে বলা হয়েছে সংবেদনের উদ্দীপনা (Sensory Stimulation)।

ইঙ্গিত নির্বাচন (Cue Selection) : উদ্দীপনা গ্রহণের ফলে যে প্রত্যক্ষণ ঘটছে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করে নেওয়ার নাম ইঙ্গিত নির্বাচন। যেমন, উপরের উদাহরণে শিক্ষকের হাতের গতি অনুসরণ করে কোথায় কোনদিকে রেখার দিক পরিবর্তন হচ্ছে তা লক্ষ্য করা অথবা শব্দের উচ্চারণ, ঝোঁক এসব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে বানান সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি হল ইঙ্গিত নির্বাচন। সঠিক ইঙ্গিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচন করতে পারে, তার জন্য শিক্ষককেও সচেতন থাকতে হয় এবং উদ্দীপনার বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলি যাতে তারা চিহ্নিত করতে পারে তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করতে হয়।

রূপান্তরকরণ (Translation) : প্রত্যক্ষণজনিত অভিজ্ঞতাকে কাজে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয়েছে রূপান্তরকরণ (Translation)। ইন্দ্রিয়গুলির প্রস্তুতি ও ইঙ্গিত গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে যে মানসিক প্রতিরূপ (Mental representation) গড়ে ওঠে তাকে চেষ্টায় পরিণত করার মাধ্যমে সঞ্চালনমূলক শিক্ষা হয়। আবার পূর্বের উদাহরণ উল্লেখ করে বলা যায়, শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেখাদেখি নিজেই যখন ম্যাপটি আঁকতে চেষ্টা করে বা যে কথাটি শিক্ষকের মুখ থেকে শুনেছে তাকে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে বা লিখতে চেষ্টা করে তখন তাকে বলা হয় রূপান্তরকরণ। যদি শিক্ষকের কাজ তার মনে কোন মানসিক প্রতিরূপ গঠন করতে পারে তবে তার রূপান্তরকরণের প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ শিক্ষকের ম্যাপ আঁকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করলে বা তাঁর কথা না শুনলে, শিক্ষার্থী আঁকতে বা উচ্চারণ করতে পারবে না। শিক্ষার প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত লক্ষ্যও ব্যর্থ হবে।

প্রস্তুতি (Set) :

সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যের পরবর্তী স্তর হল প্রস্তুতি (Set)। এই প্রস্তুতি এক ধরনের শারীরিক মানসিক প্রস্তুতি যা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য একান্ত আবশ্যিক। প্রস্তুতির তিনটি স্তর আছে।

মানসিক প্রস্তুতি (Mental Set) : মানসিক প্রস্তুতি কথার অর্থ যে সঞ্চালনমূলক ক্রিয়াটি সম্পাদন করতে হবে তার ধাপগুলি পর্যায়ক্রমে মনে মনে সাজিয়ে নেওয়া। প্রত্যক্ষণের ফলে যে মানসিক প্রতিরূপটি তৈরি হয়েছে, তার ভিত্তিতে ম্যাপ আঁকার আগে প্রথমে কোথা থেকে শুরু করে তারপর কি ভাবে কোন পর্যন্ত যেতে হবে তার ক্রমপর্যায়টি ভেবে নিয়ে তারপর শিক্ষার্থী আঁকার কাজ শুরু করবে অথবা কোন কবিতা শিক্ষক যেভাবে পড়ে শুনিয়েছেন, নিজে পড়ার আগে সে সম্বন্ধে আনুপূর্বিক ভেবে নিয়ে পড়া শুরু করা, এগুলি মানসিক প্রস্তুতির উদাহরণ।

দৈহিক প্রস্তুতি (Physical Set) ঃ সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (Psychomotor skill) একাধারে দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতার সমন্বয়। একথা নাম থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং মানসিক প্রস্তুতির পর দৈহিক প্রস্তুতি না হলে সঞ্চালনমূলক ক্রিয়া সম্পাদন করা যায় না। মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর শিক্ষার্থী সঞ্চালনমূলক কাজটি করার জন্য, শারীরিক অবস্থান, বসার ভঙ্গী, প্রয়োজনীয় পেশীগুলির সমন্বয় সাধন করার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। যেমন, কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীরা মানসিকভাবে দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহভঙ্গিমা, অবস্থান ইত্যাদি এমনভাবে পরিবর্তন করে নেয় যে পরবর্তী সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই তারা দৌড় শুরু করতে পারে। অথবা, ম্যাপ আঁকার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর, নিজেকে দৈহিকভাবেও প্রস্তুত করে নেয়—ম্যাপ আঁকার উপযোগী ভঙ্গীতে বসে, ঠিকভাবে পেন্সিল ধরে, দৃষ্টিকে ঠিক জায়গায় নিবদ্ধ করে ইত্যাদি।

প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি (Emotional Set) ঃ মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতিও দরকার। যে সঞ্চালনমূলক কাজটি করতে হবে, তারজন্য ব্যর্থতার ভয় ও উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন, সফল হলে আনন্দ পাওয়ার আশাও থাকা প্রয়োজন, এমনকি প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হলেও, কিছুটা সাফল্যের জন্য আত্মবিশ্বাস ও তৃপ্তির আংশিক অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। সুতরাং সঞ্চালনমূলক কাজটি শেষ করার পর যে প্রত্যাশিত তৃপ্তি ও আনন্দ, তার সম্বন্ধে কাজ শুরু করার পূর্বেই কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন, না হলে কাজটি শুরু করা যায় না। একেই বলা হয়েছে প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি। পূর্বোক্ত উদাহরণের কোন প্রতিযোগী মানসিক ও দৈহিকভাবে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যদি মনে করে, সে ব্যর্থ হবে তবে তার পক্ষে সঠিকভাবে দৌড়ানো সম্ভব নয়। বরং সাফল্যের আশা ও আনন্দ তাকে দৌড়ানোর কাজটি যথাসাধ্য ভালোভাবে করতে সাহায্য করবে।

শিক্ষার্থীকে মানসিক, দৈহিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতিতে সাহায্য করা শিক্ষকের শিক্ষাদানেরই অঙ্গ ও দায়িত্ব। এই জন্যই প্রস্তুতি ব্যক্তিগত বিষয় হলেও তা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য হল প্রকৃত কর্ম সম্পাদন নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া।

নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া (Guided Response) ঃ

প্রত্যক্ষণ যথাযথ হলে এবং সমস্তরকমে প্রস্তুত হলে, পরবর্তী পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া (Guided Response), যার প্রকৃত অর্থ, শিক্ষকের নির্দেশমত পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা। নির্দেশিত প্রতিক্রিয়ার দুটি স্তর আছে।

অনুকরণ (Iimitation) ঃ সঞ্চালনমূলক ক্রিয়া সম্পাদন করে যে দক্ষতা অর্জন করা যায় তা বর্ণনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে শেখা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন কাজটি করে দেখানো। আর শেখার জন্যও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণ ও প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। প্রস্তুতির পর প্রতিক্রিয়া হিসাবে শিক্ষক ঠিক যেভাবে কাজটি করে দেখিয়েছেন, হুবহু তার অনুসরণ করে কাজটি করার চেষ্টা করা। এটাই হল অনুকরণ (Imitation)। ছোটরা যখন প্রথম লিখতে শেখে তখন প্রশিক্ষক যেভাবে একটি অক্ষর লিখে দেখান, তারা ঠিক সেই ভাবেই অক্ষরটি লিখতে চেষ্টা করে। একটি বৃত্ত আঁকার জন্য শিক্ষক যেভাবে পেন্সিল কম্পাস ধরে বৃত্তটি আঁকেন, শিক্ষার্থীরা তার অনুকরণ করে আঁকতে চেষ্টা করে।

প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি (Trial and Error) ঃ অনুকরণের সাহায্যে চেষ্টা শুরু হলেও প্রথম প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী বার বার চেষ্টা করে, ভুল হলে তা সংশোধন করে আবার চেষ্টা করে। সংশোধন কখনও কখনও নিজস্ব ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা থেকে আবার কখনও বা শিক্ষকের নির্দেশমত করা হয়। ছোটদের লেখা শেখার সময় তারা বার বার রবার দিয়ে ঘষে ভুল জায়গায় আঁকা রেখা মুছে দিয়ে সংশোধন করে। অনেক সময়ই বড়রা নির্দেশ দেয় সংশোধনের জন্য। এই কারণেই অনুকরণ, প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি এগুলি নির্দেশিত প্রতিক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত। জীব বিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে কেমন করে স্লাইডের দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করতে হবে তা নির্দেশিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিখতে হয়। সুতরাং যে কোন সঞ্চালনমূলক দক্ষতা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেই নির্দেশিত এবং প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি এই দুই লক্ষ্য স্থির করতে হয়।

কৌশল (Mechanism) ঃ

নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া বার বার করতে করতে ক্রমশ শিক্ষার্থী সঞ্চালনমূলক কাজটির প্রকৃত কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। শিক্ষকের উদ্দেশ্যও তাই তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল কৌশলটি রপ্ত করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশিত প্রতিক্রিয়ায় উৎসাহ দিয়ে যান। অক্ষর লেখার কৌশল, ম্যাপ আঁকা কিংবা মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করা, সবক্ষেত্রেই কৌশল আয়ত্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থী নিজে নিজেই কাজটি পারে, আর কোন নির্দেশের দরকার হয় না।

জটিল ও প্রত্যক্ষগোচর প্রতিক্রিয়া (Complex and Overt Responsi) ঃ

কৌশল আয়ত্ত হলেই সঞ্চালনমূলক শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা হয় না। কারণ কৌশল আয়ত্ত হলে একাধিক কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীরা আরও জটিল ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার শেখা কৌশলগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটায় যার ফলে অপেক্ষাকৃত জটিল কাজ করার কৌশল তাদের আয়ত্ত হয়। যেমন, কম্পিউটারের কীবোর্ড ও মাউস ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করার পর, শিক্ষার্থী ঐ কৌশল কাজে লাগিয়ে লেখা, চিত্রাঙ্কন বা তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। এই বিষয়টি নির্ভর

করে যথাযথভাবে কৌশল আয়ত্ত করার উপর। সেই জন্য শিক্ষার সঞ্চালনমূলক লক্ষ্য হিসাবে একে কৌশলের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

অভিযোজন (Adaptation) ঃ

জটিল কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নতুন শেখা সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অভিযোজন (Adpation) ঘটে। অভিযোজন কথাটির সাধারণ অর্থ পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী নিজের প্রতিক্রিয়াকে পরিবর্তিত করা যা প্রচলিত ভাষায় খাপ খাওয়ানো। মানিয়ে নেওয়া, সামঞ্জস্য বিধান এই জাতীয় শব্দে বোঝানো হয়। শিক্ষার সঞ্চালনমূলক লক্ষ্য হিসাবে অভিযোজন কথাটির ব্যবহার পুরোপুরি সমার্থক না হলেও অনেকটা কাছাকাছি। পরিস্থিতি বা প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কৌশলের পরিবর্তন ঘটানো বা পূর্ববর্তী কৌশলের সমন্বয়ে কৌশলের ভিন্নতর প্রয়োগ এগুলির মাধ্যমে বোঝা যায় শিক্ষার্থী তার শেখা কৌশল যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের স্তর অতিক্রম করে আরও উচ্চতর পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। লেখার কৌশল আয়ত্ত করার পর যখন কোন শিক্ষার্থী একটি বাক্য, অনুচ্ছেদ বা আরও দীর্ঘ কিছু লেখার কাজে তার কৌশল কাজে লাগায় তখন তাকে বলা যেতে পারে জটিল ও প্রত্যক্ষ গোচর প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের দক্ষতা। কিন্তু যখন লেখার কৌশল নানাভাবে ব্যবহার করতে করতে একজন লিপি-কৌশল বিদ্যায় (Caligraphy) দক্ষ হয়ে ওঠে তখন সে প্রয়োজন মত ছোট, বড় বা বিভিন্ন ধরনের লিপি ব্যবহার করতে পারে। সে সাইনবোর্ডের অক্ষর লিখতে যেমন, সেইরকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরে অক্ষর লিখতেও তেমন পটুত্ব দেখাতে পারে। একেই বলা হয় অভিযোজন (Adaptation)।

সৃজন (Origination) ঃ

সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যের এইটিই সর্বোচ্চ স্তর। সৃজন কথাটির অর্থ নতুন কৌশলের উদ্ভাবন। দক্ষতার অভিযোজন ঘটলে তখন ব্যক্তি শেখা কৌশলগুলির মধ্যে অভিনব পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন কৌশল সৃষ্টি করতে পারেন। চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের নতুন রীতি সৃষ্টি করেন। নৃত্যশিল্পী তাঁর শেখা নাচের মুদ্রা ও দেহভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নৃত্যশৈলী সৃষ্টি করেন। গায়ক নতুন গায়কী বা নতুন সুর সৃষ্টি করেন। একজন যন্ত্রী তাঁর যন্ত্র ব্যবহারের নতুন কৌশল প্রবর্তন করেন। এইভাবে প্রতিটি সঞ্চালনমূলক দক্ষতার ক্ষেত্রেই শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সৃজনশীলতার স্তরে পৌছানো সম্ভব। শিক্ষকের পক্ষে তার ছাত্রছাত্রীদের কৌশল অর্জন করার শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তারা যাতে শেষ পর্যন্ত কৌশলের অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে সৃজনশীলতার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে, সেই শিক্ষা দেওয়া।

শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির এই শ্রেণি বিন্যাস থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় যে ধাপে ধাপে সবগুলি লক্ষ্য অর্জন করা হলে, শিক্ষার যে বৃহত্তর আদর্শবাদী উদ্দেশ্য তার অনেকটাই সফল হতে পারে। তখন সমাজে শিক্ষিত মানুষের বর্ণনায় বিচারমনস্ক, মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত, সৃজনশীল মানুষরাই প্রাধান্য পাবেন। কিন্তু শিক্ষার পরিকল্পনা, পরিচালনা, দৈনন্দিন, পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষার লক্ষণগুলি প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে কাজ করলে তবেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব। সর্বস্তরে যেমন সমস্ত লক্ষ্য ধার্য করা যায় না, তেমনি সমস্ত ছাত্রছাত্রীই চরম লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা।

২.৩ শিক্ষার লক্ষ্যের উৎস (Sources of Educational Objectives)

মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে অত্যন্ত সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করলেও, এই শ্রেণি বিন্যাসের কিছু কিছু রকমফের শিক্ষাবিদ্‌রা করেছেন। বিশেষত সামগ্রিকভাবে যখন শিক্ষার লক্ষ্যগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটে তখন দেখা যায় নানা উৎস থেকে লক্ষ্যগুলি নির্ধারিত হয়। এখানে উৎস (Source) কথাটির তাৎপর্য হল যে সব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্দেশ্যগুলি নির্বাচন করা হয় সেইগুলি। শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি যতই দৃঢ় হোক অনেক সময়ই উদ্দেশ্য স্থির করার সময় সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা করা হয় না।

যে সব উৎস থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়, তা অনেক। তার সবগুলিই যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন তা নয় বরং অনেকটাই পরস্পর সম্পর্কিত এবং সম্পর্কের প্রকৃতিও যথেষ্ট জটিল। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, ঐতিহ্যগত ইত্যাদি অনেক দৃষ্টিভঙ্গীই শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম, পরিকল্পনা, পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যাঁদের অগ্রণী ভূমিকা থাকে তাঁরা যে সব সময় মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন, এমন নয়। বরং তাঁদের ব্যক্তিগত চিন্তা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ (Central Board of Secondary Education) তাঁদের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে—

- শিক্ষার উদ্দেশ্য পঠন-পাঠনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যেসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবর্তন ঘটে তার দিক নির্দেশ করে।
- পঠন-পাঠন পর্যায়ে কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি মানসিক প্রক্রিয়া ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন।
- এই সব দক্ষতা ও মানসিক প্রক্রিয়া মানুষের চিন্তন কৌশল ও স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকেও এদের স্থায়ীত্ব বেশি হয়।
- বিষয়বস্তুর জ্ঞান শুধুমাত্র এইসব উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট দক্ষতাগুলির ভিত্তিতেই শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতিটি ক্ষুদ্রতম এককের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে নিলে শিক্ষণ ও পরীক্ষণ কার্য সুসম্পন্ন হবে।

এই বক্তব্যগুলি বিচার করলে দেখা যাবে, এখানে অনেকটা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য থাকলেও তা উপযুক্ত ক্রমানুসারে এবং যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, স্পষ্ট করে বলা হয়নি শিক্ষার কোন্ স্তরে কোন্ লক্ষ্যগুলি অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। আবার জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ (National Council of Educational Research and Training) বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত সরল (Simplified) ও একমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের চিন্তায় সামগ্রিকভাবে দেশের বিদ্যালয় শিক্ষা, শিক্ষক ও তাদের দক্ষতার যে বাস্তব প্রেক্ষাপট আছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

পৃথিবীর বহুদেশেই সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে। এমনকি একই দেশে ধর্মীয় মিশন পরিচালিত শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার লক্ষ্য কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বায়ন (Globalization) একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি হিসাবে শিক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দৈনন্দিন পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন ও শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক শ্রেণি বিন্যাসের কোন বিকল্প নেই।

২.৩.১ মূল্যায়নে শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রয়োগ (Application of Educational Objectives in Evaluation)

সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের মধ্যে একটি দ্বিমুখী সম্পর্ক আছে। এই বিষয়টি পূর্ববর্তী এককে একবার আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এই সম্পর্ক আরও একটু বিশদভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। শিক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান অংশই ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ বা সেই সংক্রান্ত গুণগত তথ্য আহরণ করার উপর নির্ভর করে। এক ধরনের বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব। এগুলি শিক্ষার উপর যতটা নির্ভরশীল তার থেকে বেশি নির্ভরশীল পরিনমণের উপর যেমন, তাদের দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য। আর এক ধরনের তথ্য পরিনমণের উপর কিছুটা নির্ভরশীল আর কিছুটা স্বাভাবিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, যেমন, কোন মানুষের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শিক্ষা তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতারই অংশ বিশেষ।

কিন্তু যে সব বৈশিষ্ট্য একান্তই শিক্ষা নির্ভর তাদের পরিমাপ মূল্যায়নের একটি প্রধান কাজ। অর্জিত জ্ঞান, শিক্ষালব্ধ দক্ষতা, শিক্ষার চরিত্রায়ণ এগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আর এখানেই শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকাগুলি সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হল।

● **মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ঃ** মূল্যায়নের উদ্দেশ্য আর শিক্ষার লক্ষ্য অভিন্ন। যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় জ্ঞান কিংবা তাৎপর্যবোধ, তবে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যও হবে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়টি কতটা অবগত আছে বা বিষয়টির তাৎপর্য সম্বন্ধে কতটা তাৎপর্য বোধ হয়েছে। এই কথা শুধুমাত্র বাৎসরিক বা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাৎক্ষণিক ভাবে ক্লাসের পড়া চলাকালীনও উভয়ের সম্পর্ক একই।

● **মূল্যায়নের হাতিয়ার ঃ** মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরিমাপ করতে হলে উপযুক্ত হাতিয়ার দরকার। শিক্ষক নির্মিত প্রশ্ন, আদর্শমান নির্ভর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত বা রচনাধর্মী প্রশ্ন যাই হোক না কেন সবকয়টির একটিই উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ করা। কিন্তু প্রশ্ন রচনা করার ভিত্তি ও ভাষা কি হবে, উত্তরের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা কিসের ভিত্তিতে বিচার হবে এসবই শিক্ষার লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও ভাষা হবে শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী, উত্তরের শুদ্ধতা অশুদ্ধতাও সেই ভাবেই বিচার্য হবে।

● **মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ঃ** যদি মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার করতে হয়, তবে সংস্কারের অভিমুখ স্থির করার জন্যও প্রয়োজন শিক্ষার লক্ষ্যগুলির সাহায্য। রচনাধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়নের এখনও

একটি প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার সমস্ত উচ্চতর লক্ষ্য পরিমাপ করতে পারে না। সুতরাং পরীক্ষা পদ্ধতি এমনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন যে তা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তাৎপর্যবোধ করার ক্ষমতা ইত্যাদির যথাযথ পরিমাপ করতে পারবে, এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে অনায়াসে মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার সাধনে শিক্ষার লক্ষ্যগুলির ভূমিকা বুঝে নেওয়া যায়।

● **শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঃ** কখনও কখনও দেখা যায় শিক্ষার লক্ষ্যগুলিরও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মূল্যায়নের মাধ্যমেই ভালোভাবে বোঝা যায়। কোন বিশেষ শ্রেণিতে সাহিত্যপাঠের জন্য হয়ত লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analysis and synthesis)। কিন্তু এই দুই লক্ষ্যের মূল্যায়ন করার উপযোগী প্রশ্ন করার পর দেখা গেল তা শিক্ষার্থীদের বয়স ও পরিনমণের অনুপযোগী। তখন লক্ষ্যগুলির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।

● **শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ** শিক্ষণ পদ্ধতি এবং নিবিড় শিক্ষণের পরিকল্পনা দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ। শিক্ষণ কৌশলের উপযোগী বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis) কথাটির অর্থ যে বিষয়টি পড়াতে হবে তার এককগুলিকে চিহ্নিত করে, প্রত্যেকটি এককের জন্য এক বা একাধিক লক্ষ্য নির্বাচন করা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচন করা। এই কাজ প্রস্তুতিমূলক কারণ প্রকৃত শিক্ষণ শুরু করার আগে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য এই ধরনের বিশ্লেষণ দরকার। এই প্রস্তুতিরই পরবর্তী ধাপ পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) রচনা করা, যে পরিকল্পনায় আরও স্পষ্ট ভাবে শিক্ষক ক্লাসে তাঁর সম্ভাব্য কাজগুলির খুঁটিনাটি ঠিক করে লিখে রাখেন।

শিক্ষার লক্ষ্যগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাহীন। কিন্তু প্রধানতঃ উপরোক্ত প্রয়োগগুলি সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

২.৪ সারসংক্ষেপ (Summary)

মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন শিখনজনিত যে সমস্ত পরিবর্তন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘটে সেগুলির নানা রকমফের আছে। এই সব প্রত্যাশিত পরিবর্তন আগে থেকে জানা থাকলে এবং পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখলে, শিক্ষক তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষণ পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন এবং মূল্যায়ন করার সময়ও সঠিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে পারেন। এই সব প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলিই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

আরও দেখা গেছে যে এই সব উদ্দেশ্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। নিম্নতর স্তরকে অতিক্রম করে উচ্চতর উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যায় না। সেজন্য শিক্ষক ও মূল্যায়ন বিশারদ সকলেরই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ও তাদের স্তর বিন্যাস সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রধানত তিনপ্রকার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার ফলে মানুষের জ্ঞানরাজ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিকভাবে এই উদ্দেশ্যগুলি প্রজ্ঞামূলক বর্গের (Cognitive Domain) অন্তর্গত। অনুভবমূলক উদ্দেশ্যগুলি (Affective) শিক্ষার ফলে মানুষের সামগ্রিক আচরণ, বিচার বোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তারই

বিন্যাসকে নির্দেশ করে। আর শিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সঞ্চালনমূলক (Psychomotor) আচরণের পরিবর্তনগুলি তৃতীয় প্রধান শ্রেণিতে বিন্যস্ত।

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রধান স্তরগুলি হল জ্ঞান, তাৎপর্যবোধ, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, ও মূল্যায়ন। অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের প্রধান স্তর—গ্রহণমনস্কতা বা মনসংযোগ, প্রত্যুত্তরদান, গুরুত্বদান, সংগঠন, মূল্যবোধের পরম সংগঠন ও চরিত্রায়ণ। সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যগুলি হল প্রত্যক্ষণ, প্রস্তুতি, নির্দেশিত প্রতিক্রিয়া, কৌশল, জটিল ও প্রত্যক্ষগোচর প্রতিক্রিয়া, অভিযোজন ও সৃজন।

শিক্ষা লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাচিত হলেও দৈনন্দিন পঠন পাঠন ও তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন বিকল্প নেই। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

২.৫ অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ—

১। শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অর্থ কী?

২। প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য বলতে কী বোঝায়?

৩। শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। সঞ্চলনমূলক উদ্দেশ্যের অর্থ কী?

৫। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তা উল্লেখ করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ—

১। অনুভবমূলক স্তরের অন্তর্গত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির বিবরণ দিন।

২। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝেন? এগুলি কী উদ্দেশ্য সমাধান করে?

৩। প্রজ্ঞামূলক বর্গের অন্তর্গত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির ব্যাখ্যা করুন।

৪। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির উৎস বলতে কী বোঝেন? কিভাবে এ উদ্দেশ্যগুলি প্রয়োগ করা হয়?

৫। শিক্ষায় সঞ্চলনমূলক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কী? সঞ্চলনমূলক বর্গের অন্তর্গত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

একক ৩ ❒ মূল্যায়নের হাতিয়ার (Tools of Evaluation)

গঠন
সূচনা
উদ্দেশ্য
৩.১ মূল্যায়নের হাতিয়ার
৩.১.১ মূল্যায়নের হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা
৩.১.২ হাতিয়ারের প্রকারভেদ
৩.১.৩ উত্তম হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য
৩.২ সাফল্যসূচক অভীক্ষা
৩.২.১ সাফল্যসূচক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য
৩.২.২ সাফল্যসূচক অভীক্ষার ব্যবহার
৩.২.৩ সাফল্যসূচক অভীক্ষার সীমাবদ্ধতা
৩.২.৪ সাফল্যসূচক অভীক্ষা নির্মাণের পদ্ধতি
৩.৩ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা
৩.৩.১ আর্দশমান ভিত্তিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য
৩.৩.২ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ
৩.৪ রচনাধর্মী অভীক্ষা
৩.৪.১ রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণ
৩.৪.২ রচনাধর্মী অভীক্ষার ত্রুটি
৩.৪.৩ রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতিসাধন
৩.৫ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা
৩.৫.১ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ
৩.৫.২ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ
৩.৫.৩ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ত্রুটি
৩.৫.৪ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি
৩.৬ বুদ্ধির অভীক্ষা
৩.৬.১ মূল্যায়নে বুদ্ধি অভীক্ষার ব্যবহার
৩.৭ বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা
৩.৮ সৃজনশীলতার অভীক্ষা
৩.৯ ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা
৩.১০ আগ্রহ উন্মোচনী
৩.১১ প্রতিন্যাস অভীক্ষা
৩.১২ নিদানমূলক অভীক্ষা
৩.১৩ সারসংক্ষেপ
৩.১৪ অনুশীলনী

সূচনা (Introduction)

মূল্যায়ন পরিমাপ পরীক্ষা ইত্যাদি শব্দগুলি সম্বন্ধে যে ধারণা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে তাতে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সমস্ত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই সব তথ্য কোন পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়না। সুতরাং নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ভরযোগ্য তথ্য আহরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় এমন কিছু হাতিয়ার যার সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হলে তা হবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং ব্যবহারযোগ্য।

উচ্চতা পরিমাপের জন্য প্রয়োজন স্কেল, ওজন মাপার জন্য উপযুক্ত ওজন যন্ত্র যেমন প্রয়োজন তেমনি মানসিক বৈশিষ্ট্য (Attributes) ও অর্জিত শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে হলেও দরকার উপযুক্ত পরিমাপক। বর্তমান এককটিতে এই সব পরিমাপক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সাধারণ ধারণা দেওয়া হবে, এদের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ, ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে এবং সেই সঙ্গে এদের প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিকেও চিহ্নিত করা হবে।

উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- মূল্যায়নের হাতিয়ার কাকে বলে, তাদের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- সাফল্য সূচক অভীক্ষার ব্যবহার, বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটি উল্লেখ করতে পারবেন।
- সাফল্য সূচক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি জানতে পারবেন।
- আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার ব্যবহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণ, ত্রুটি এবং সংশোধনের উপায়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ, গুণ ও ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, প্রতিন্যাস ও বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারবেন।
- নিদান মূলক অভীক্ষা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৩.১ মূল্যায়নের হাতিয়ার (Tools of Evaluation)

হাতিয়ার (Tool) শব্দটি ব্যবহৃত হয় অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। যে যন্ত্র, পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় বা যা নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলে আর কোন ভাবে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না তাই হল হাতিয়ার (Any instrument, method or technique which is used to achieve a goal or that without which it is impossible to achieve a particular goal, is called a tool)।

এখানে হাতিয়ার কথাটি মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে যেগুলি ছাড়া মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না এবং মুল্যায়নের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। কাজেই মূল্যায়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ারগুলি সম্বন্ধে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক সকলেরই জানা প্রয়োজন। যেহেতু মূল্যায়নের জন্য নানা ধরনের তথ্য প্রয়োজন হয় সেহেতু হাতিয়ারগুলির মধ্যেও অনেক প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু প্রকার ভেদ সম্বন্ধে জানার আগে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ আলোচনা দরকার।

৩.১.১ মূল্যায়নের হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা (Needs for the Tools of Evaluation)

প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে যে মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য হাতিয়ারগুলিই একমাত্র উপায়। কিন্তু এই কথার মধ্যে দিয়ে হাতিয়ারের গুরুত্ব যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়না। পরিমাপ সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা গেছে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করতে হলে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিশেষ কোন স্কেল অনুযায়ী (যেমন, অনুপাত বা আন্তর স্কেল) তথ্য সংগ্রহ করা না হলে তার কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু এর জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কারণ যখন পরিমাপের প্রয়োজন, তখনই উপস্থিত হাতের কাজে যা আছে তাই পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলিই এক একটি স্থায়ী পদ্ধতি বা কৌশল যা নির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি করা হয় এবং উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। সুতরাং মূল্যায়নের হাতিয়ার হল তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য কৌশল (Tool of evaluation is a permanent device usable for the collection of data)।

কোন একটি কৌশল একবার মাত্র প্রয়োগ করে যদি তা পরিত্যাগ করতে হয় তবে তাকে ব্যবহার করে আর দ্বিতীয়বার তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না। সুতরাং তথ্যসংগ্রহের কৌশল এমন হওয়া দরকার যা বার বার ব্যবহার করা যায়, প্রতিবারের পাওয়া তথ্য তুলনা করা যায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি বার বার ব্যবহার করা যায় এবং তার ফলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সুতরাং মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটি প্রধান বাহন।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সার্বজনীন (Universal) হওয়া প্রয়োজন। কারণ মূল্যায়নের কৌশলটি যদি সকলের কাছে গ্রাহ্য না হয় বা সমস্ত একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য না হয় তবে মূল্যায়ন অর্থহীন। কোন ছাত্রকে কেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হবে, তার ভিত্তি কি, তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে সকলে ছাত্রটির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে না। মূল্যায়নের হাতিয়ার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে সর্বজনীনতা দান করে, তাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, এবং সেজন্য সকলেই সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেয়।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। স্বচ্ছতা সর্বজনীনতার অন্যতম শর্ত। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে যত সন্দেহ, বিতর্ক দেখা দেয় তার কারণ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়। কিন্তু মূল্যায়নের হাতিয়ার এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যার নির্মাণ কৌশল থেকে শুরু করে প্রয়োগ পর্যন্ত সমস্তটাই ব্যাখ্যা করে সকলের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। সুতরাং উপযুক্ত হাতিয়ার ব্যবহার করার অর্থ মূল্যবান প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট স্বচ্ছ করে তোলা।

এক একটি মূল্যায়নের হাতিয়ার খুব নির্দিষ্ট ভাবে একটি বা খুব অল্প সংখ্যক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারে। মূল্যায়নের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্য প্রয়োজন তা খুব স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করে দেওয়া হয়। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলিও সেইসব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারে। যদি বুদ্ধির পরিমাপ জানা প্রয়োজন হয়, তবে বুদ্ধির অভীক্ষা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সহজেই বুদ্ধি মাপা যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে একজনের আগ্রহ বা ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা যাবে না। তার জন্য স্বতন্ত্র হাতিয়ার প্রয়োজন। সুতরাং মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি একদিকে যেমন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে তেমনি কোন তথ্য পাওয়া যাবে বা। যাবেনা অথবা তারজন্য কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে সে সম্বন্ধে ধারণা দেয়। অর্থাৎ হাতিয়ারগুলি মূল্যায়নের কাজকে একটি নির্দিষ্ট গতিদান করে, সুশৃঙ্খল করে তুলতে সাহায্য করে।

এরপর পরবর্তী একটি অংশে যখন একটি উত্তম হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য (Characteristies of a good evaluation tool) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে তখন দেখা যাবে হাতিয়ারগুলির জন্যই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্য (Reliable), যথার্থ (Valid) ও নৈর্ব্যক্তিক (Objective) গুণ সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

একটি স্থায়ী, স্বচ্ছ, সর্বজনীন ও সুনির্দিষ্ট কৌশল হিসাবে মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি অপরিহার্য।

৩.১.২ হাতিয়ারের প্রকারভেদ (Types of Tools)

সাধারণভাবে মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির প্রকারভেদ নির্ভর করে যে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করার জন্য হাতিয়ারটি নির্মিত হয়েছে তার উপর। যেমন বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা, বিশেষ প্রবণতার জন্য অভীক্ষা, আগ্রহ উন্মোচনী ইত্যাদি। এই প্রকারভেদ হাতিয়ারগুলির প্রকৃত প্রকারভেদ নয়, বৈশিষ্ট্যের বা তথ্যের প্রকারভেদ মাত্র। অন্যদিকে পদ্ধতিগত দিক থেকে হাতিয়ারগুলির মধ্যে আর একধরনের প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন, অভীক্ষা (Test), স্কেল (Scale), উন্মোচনী (Inventory), প্রশ্নোত্তরিকা (Questionnaire), সাক্ষাৎ কারিকা (Interview schedule) ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য যেমন আছে তেমনি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও (Common Characteristics) অনেক আছে। সেগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে জানা সহজ হবে। এখানে অন্যান্য যে সব প্রকারভেদ আছে সে সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার যে হাতিয়ারগুলির শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে করা হয় এবং সে অনুযায়ী শ্রেণিগুলির নামও আলাদা হয়ে থাকে। মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসাবে প্রশ্নোত্তরিকা, মতামত ও সাক্ষাৎকারিকা ইত্যাদির গুরুত্ব কম, সেজন্য শ্রেণি বিভাগের আলোচনায় এবং পরবর্তী বিশদ উল্লেখের সময় এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অভীক্ষার পদ বা প্রশ্নের ধরন (Types of Test Items)

কিভাবে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বা কিভাবে উত্তর করতে হবে সে অনুযায়ী সবচেয়ে প্রচলিত শ্রেণি বিভাগ হল রচনাত্মক অভীক্ষা (Essay Test) ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Test)। পরে এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আপাতত জানা দরকার যে রচনাত্মক অভীক্ষায় এমনভাবে প্রশ্ন করা হয় যে একটি দীর্ঘ সুসংবদ্ধ নিবন্ধ রচনা করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রশ্নের ভাষায় আলোচনা কর, বর্ণনা দাও, বিশ্লেষণ কর, ব্যাখ্যা কর, এই জাতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র শব্দ বা কখনও ছোট শব্দগুচ্ছ উত্তর হিসাবে চাওয়া হয়। এই উত্তরটি সমস্ত উত্তরদাতার ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এই দুই প্রকারের মধ্যবর্তী একপ্রকার অভীক্ষায় পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধের পরিবর্তে উত্তর হিসাবে কয়েকটি বাক্য বা একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে বলা হয়। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত উত্তর জাতীয় অভীক্ষা (Short Answer type test)।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরটি যদি অভীক্ষার্থীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য স্মরণ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে বলা হয় স্মরণক্রিয়া ভিত্তিক অভীক্ষা (Recall Type Test)। যেমন, প্রবলন তত্ত্বের জনক কে? অপরপক্ষে যখন একাধিক সম্ভাব্য অথচ ভুল উত্তরের মধ্যে থেকে একটি সঠিক উত্তর বেছে নিতে বলা হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা ভিত্তিক অভীক্ষা (Recognition type Test)। এই শ্রেণি বিভাগ চূড়ান্ত নয়। কারণ একই অভীক্ষা উভয় প্রকার পদ্ধতিতেই তৈরি হতে পারে। যেমন, প্রবলন তত্ত্বের জনক ছিলেন—(থর্ণডাইক, পাভলভ, স্কিনার, কোহলার)।

অভীক্ষার ব্যবহার বা প্রয়োগভিত্তিক প্রকারভেদ (Types of Test according to administration)

অনেক হাতিয়ার আছে যেগুলি একসঙ্গে একদল মানুষের উপর প্রয়োগ করে একযোগে অনেকের সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা যায়। এতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু অনেক বিষয় সকলের বেলায় সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় দলগত অভীক্ষা (Group Test)। আবার কিছু কিছু হাতিয়ার আছে যা কেবলমাত্র একজন মানুষের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। এতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু অনেক ব্যক্তির তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সময় লাগে। এই জাতীয় অভীক্ষাকে বলা হয় একক অভীক্ষা (Individual Test)। ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি (Projective Tests of personality) একক অভীক্ষার উদাহরণ। একক অভীক্ষা অনেক সময়ই মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে গভীর তথ্য (Indepth data) ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারে।

অভীক্ষায় ব্যবহৃত করণীয় কর্মের প্রকৃতি (Nature of Task in the Test)

অভীক্ষায় উত্তর দেওয়ার জন্য অভীক্ষার্থীর কৃত্য কর্মের দুই প্রকার ভিত্তি হতে পারে। যদি অভীক্ষাটি এমনভাবে গঠন করা হয় যে উত্তরদানের নির্দেশ ভাষার মাধ্যমে দেওয়া এবং উত্তরও ভাষাতেই দিতে হবে তবে তাকে বলা হয় ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা (Verbal Test)। প্রচলিত পরীক্ষা মূলত ভাষাভিত্তিক কারণ ভাষার মাধ্যমেই প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশ করা হয়। বহু ক্ষেত্রেই অভীক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে যে সব বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাওয়া হয় ভাষাই তাদের একমাত্র বাহন। যেমন, শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, নিজের যুক্তি সাজানোর ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপ করতে চাইলে, ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

আবার যে ক্ষেত্রে উত্তরটি কোন ভাষা ব্যবহার না করে শুধু মাত্র করে দেখাতে হবে, সেক্ষেত্রে প্রশ্নটি ভাষাভিত্তিক হলেও তাকে বলা হয় অবাচনিক অভীক্ষা (Nonverbal Test)। ম্যাপের মধ্যে কোন একটি

স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করতে বললে, একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে বা লিখে তা দেখানো সম্ভব। মূলতঃ সঞ্চালনমূলক কাজের (Psychomotor function) মাধ্যমে যে সব অবাচনিক অভীক্ষার উত্তর দিতে হয় তাদের একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয় সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)। কিন্তু ভাষার পরিবর্তে সংকেত, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করে যে অভীক্ষা নির্মিত হয় সেগুলিও অবাচনিক অভীক্ষার শ্রেণিভুক্ত। বুদ্ধির পরিমাপক অভীক্ষাগুলির মধ্যে কোহ্ ব্লক ডিজাইন টেস্ট (Koh Block Design Test) সম্পাদনী অভীক্ষার উদাহরণ। র‍্যাভেনের অভীক্ষাগুলি (Raven's Test) সবই অবাচনিক কিন্তু সম্পাদনী অভীক্ষা নয়।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রশ্ন বা নির্দেশ এবং উত্তর প্রদান কোনটিতেই ভাষা ব্যবহার করা যায় না। ইঙ্গিত সংকেত ইত্যাদির মাধ্যমে পরিমাপের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। বধিরদের জন্য ব্যবহৃত হাতের ভাষা (Manual of Sign language) প্রশ্ন ও উত্তর উভয় ক্ষেত্রেপ্রয়োগ করা হয় বলে এই জাতীয় অভীক্ষাকে ভাষাবিহীন অভীক্ষা (Non language Test) বলা হয়। কিন্তু দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের বেলায়, ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও তা বাচনিক বলেই গণ্য হবে। কারণ ব্রেইল একটি লিপি কৌশল মাত্র যার সাহায্যে যে কোন বিষয়কেই তার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

সময়সীমা ভিত্তিক প্রকারভেদ (Types according to time limit)

মানসিক বা দৈহিক সক্ষমতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে যে সমস্ত কৃত্যকাজের (Task) সাহায্যে পরিমাপ করতে হয়ে সেগুলি কতটা সহজ বা কঠিন তাই নির্দেশ করে দেয় ব্যক্তির সক্ষমতা কতটা। যে যত বেশি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারে তার সক্ষমতা বেশি এতে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য অনেক অভীক্ষা এমন ভাবে তৈরি হয় যে প্রথমে খুব সহজ প্রশ্ন বা পদ দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কঠিনতর পদ দেওয়া হয়। শেষের দিকে পদগুলি থাকে অত্যন্ত কঠিন। অভীক্ষা নির্মাতা মনে করেন যার যতটা সক্ষমতা সে ততদূর কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এতে সময়ের কোন ভূমিকা নেই। এই জাতীয় অভীক্ষা যা প্রশ্নের কাঠিন্যের ভিত্তিতে নির্মিত সেগুলিকে বলে বলভিত্তিক অভীক্ষা (Power Test)। র‍্যাভেনের অভীক্ষাগুলি প্রকৃত বলভিত্তিক অভীক্ষার উদাহরণ কারণ এর নির্দেশিকায় বলা আছে অভীক্ষা শেষ করার জন্য কোন সময় সীমা নেই, অভীক্ষার্থী যত ইচ্ছা সময় নিতে পারে।

অন্যদিকে যদি কোন অভীক্ষা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে প্রশ্নগুলি মোটামুটি সমান কঠিন কিন্তু সংখ্যায় অনেক। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তি যতগুলি সঠিক সমাধান করতে পারবে তাকেই তার সক্ষমতার মান হিসাবে গ্রহণ করা হবে। মনে করা হয় যার সক্ষমতা যত বেশি সে নির্দিষ্ট সময়ে তত বেশি প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় দ্রুতি অভীক্ষা (Speed Test)।

তবে প্রচলিত অধিকাংশ অভীক্ষাই দুই প্রকার অভীক্ষার সংমিশ্রণ। অর্থাৎ এই সব অভীক্ষায় পদগুলি কাঠিন্যের মান অনুযায়ী সাজানো থাকে আবারএকটি সময় সীমাও দেওয়া থাকে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে সময় সীমা থাকে কিন্তু ইচ্ছামত যত খুশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া থাকে। আবার প্রশ্নগুলির কাঠিন্যের মানও স্থির করা থাকে না। ফলে এই জাতীয়

পরীক্ষাকে মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করলেও একে দ্রুতি অভীক্ষা বা বলভিত্তিক অভীক্ষা কোন শ্রেণিতেই স্থান দেওয়া যায় না।

৩.১.৩ উত্তম হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য

গবেষণার রীতি পদ্ধতি পাঠ করার সময় গবেষণার হাতিয়ারগুলি সম্বন্ধে তিনটি প্রধান আবশ্যিক গুণের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি হল, পরিমাপকের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity) এবং নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)। বিষয়গুলি এখানে আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করার কারণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বেলাতেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মূল্যায়ন যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির এই গুণ তিনটি থাকা একান্ত আবশ্যিক।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

কোন পরিমাপক যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সুস্থিতিকে নির্ভরযোগ্যতা বলে (Reliability is the internal consistency of a measuring instrument) অর্থাৎ কোন পরিমাপক একই ব্যক্তি বা বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য বার বার প্রয়োগ করা হলে একই ফল পাওয়া উচিত। যদি তা হয়, তবে ঐ পরিমাপকটির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি আছে এবং সেই জন্য এটি নির্ভরযোগ্য। যদি কোন অভীক্ষা একদল ব্যক্তির উপর বার বার প্রয়োগ করার পর প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়, তবে আমরা ঐ অভীক্ষার উপর নির্ভর করতে পারি না।

মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির বেলায়, নির্ভরযোগ্যতার মান নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা দরকার এবং কোন্ পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে তাও বলা দরকার। যে সব পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয় তার মধ্যে আছে—(১) পরীক্ষা—পুনঃ পরীক্ষা (Test-Retest) (২) অর্ধবিভাজন পদ্ধতি (Split-half method), (৩) সমান্তরাল অভীক্ষা (Parallel Test) এবং (৪) যৌক্তিক তুল্যতার পদ্ধতি (Method of Rational Equivalence)। প্রত্যেক পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করা আছে। সে সম্বন্ধে গবেষণার রীতি পদ্ধতিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যথার্থতা (Validity)

পরিমাপক হাতিয়ারটি যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশে নির্মিত, সঠিকভাবে সেইটিই পরিমাপ করলে, তাকে যথার্থতা বলা হয়। ভৌত পরিমাপের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি সবসময় খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন স্কেল, ওজন যন্ত্র বা ঘড়ি সত্যিই যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ওজন ও সময় পরিমাপ করছে কিনা সাধারণত এই সন্দেহ আমরা প্রকাশ করি না। কিন্তু কোন ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা সত্যিই ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম কিনা অথবা কোন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সত্যিই ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাপ নির্দেশ করে কি না, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ ব্যক্তিত্ব বা জ্ঞান দৈর্ঘ্য বা ওজনের মত স্পষ্ট ধারণা নয়। তাদের সংজ্ঞা, আচরণে তাদের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি নিয়ে নানা মত ও অস্পষ্টতা আছে।

সঠিকভাবে একটি মূল্যায়নের হাতিয়ার কতটা যথার্থ সেটাও জানা দরকার। না হলে, হাতিয়ারটি ব্যবহার করা অর্থহীন। অনেক প্রকার পদ্ধতিতে যথার্থতা নির্ণয় করা যায়। তার মধ্যে আছে, বিষয়বস্তুর যথার্থতা (Content Validity), ধারণাভিত্তিক যথার্থতা (Construct Validity), উপাদানগত যথার্থতা (Factorial Validity), আন্তঃ অভীক্ষা যথার্থতা (Cross Validity) এবং বহিঃশর্তভিত্তিক যথার্থতা (Validity against external criteria)। এক্ষেত্রেও এক এক ধরনের হাতিয়ারের বেলায় ভিন্ন পদ্ধতিতে যথার্থতা নির্ণয় করা হয়। অধিকাংশ সময়ই একাধিক পদ্ধতিতে যথার্থতা নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়। যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা পরস্পর সম্পর্কিত। কোন হাতিয়ার যথার্থ না হলে নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম আবার নির্ভরযোগ্যতাহীন হাতিয়ার কখনই যথার্থ হতে পারে না। যথার্থতার প্রসঙ্গটিও গবেষণার রীতি পদ্ধতিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

নৈর্ব্যক্তিকতা কথাটির অর্থ কোন পরিমাপক হাতিয়ার প্রয়োগ কর্তার দক্ষতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে কিনা। ব্যক্তি নিরপেক্ষ না হলে হাতিয়ার হিসাবে কোন কিছুরই মূল্য নেই। গবেষণার রীতি পদ্ধতিতে তিন প্রকার নৈর্ব্যক্তিকতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিন দিক থেকে কোন হাতিয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

এক, প্রয়োগ সংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা। পরিমাপক হাতিয়ারটির প্রয়োগ বিধি এমন হওয়া দরকার যে, প্রয়োগ কর্তার দক্ষতার উপর তা যেন নির্ভর না করে। যে ব্যক্তিই হাতিয়ারটি ব্যবহার করুন তিনি একই শর্তে, একই পদ্ধতিতে সেটি প্রয়োগ করবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা হাতিয়ারের একটি আবশ্যিক অঙ্গ।

দুই, মূল্যায়ন সম্পর্কিত নৈর্ব্যক্তিকতা। পরিমাপক হাতিয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে প্রয়োগ করার পর প্রাপ্ত উত্তরগুলির মূল্যায়ন করার, (যেমন নম্বর দেওয়া, গ্রেড ঠিক করা, শ্রেণি বিভাগ করা ইত্যাদি) ব্যবস্থাটিও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া দরকার। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক যদি ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দেন, তাঁদের মূল্যায়ণের মধ্যে যদি সংগতি না থাকে, এমনকি একই ব্যক্তি একই উত্তরের যদি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন করেন, তবে ঐ হাতিয়ারটি কোন মূল্যায়নের কাজেই ব্যবহার করা যাবে না। প্রত্যেক হাতিয়ার নির্মাতা ব্যবহার বিধির পাশাপাশি উত্তরগুলির মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে তাঁর হাতিয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখেন।

তিন, তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নৈর্ব্যক্তিকতা। সঠিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার পরবর্তী প্রশ্ন হল, মূল্যায়ন লব্ধ ফলকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কোন ছাত্র পরীক্ষায় শতকরা ৭০ নম্বর পেয়েছে। এর অর্থ, কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। অর্থাৎ আদর্শমানের (Norm) ভিত্তিতে শতকরা নম্বর ভালো, মন্দ বা মাঝামাঝি তা নির্ণয় করার পদ্ধতিও ব্যবহারকারীর জানা দরকার।

মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলিতে উপরোক্ত গুণগুলির যে কোন অভাব থাকলে তাকে মূল্যায়নের উপযোগী উত্তম হাতিয়ার বলা যাবে না।

৩.২ সাফল্য সূচক অভীক্ষা (Criterion Referenced Test)

মূল্যায়নের কিছু কিছু হাতিয়ার আছে যার উদ্দেশ্য কিছুটা সীমিত। পঠন-পাঠনের সময় কোন একটি অংশে শিক্ষকের কাছে একটি প্রধান এবং প্রাথমিক প্রশ্ন হল ছাত্রছাত্রীরা একটি নির্দিষ্ট করণীয় কৃত্য (task) সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারছে কি পারছে না, এই উদ্দেশ্যে তাঁকে সাফল্যের একটি মান, লক্ষণ বা চিহ্ন নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। এইটিই হল সাফল্যের সূচক (Criterion of success)। সূচকটি অতিক্রম করতে পারলে শিক্ষার্থী সফল। নতুবা অসফল বলে গণ্য হবে। এই অর্থেই ইংরাজী Criterion Referenced কথাটির বাংলা হিসাবে সাফল্য সূচক কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোন ছাত্র কোন একটি সমাসের সংজ্ঞা বুঝে থাকে তবে সে একটি সমাসবন্ধ পদ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারবে। এখানে, উদাহরণ দিতে পারাটাই হল সাফল্যের সূচক, পারলে সংজ্ঞা শেখায় সফল না পারলে সংজ্ঞা শেখায় ব্যর্থ—আবার শিখতে হবে।

সাফল্য সূচক অভীক্ষার সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন লেখকরা তাঁদের নিজেদের মত অনুযায়ী প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৩ সালে Glaser প্রথম এই জাতীয় অভীক্ষার কথা বলেন। সাফল্যের সূচক শব্দটির দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন কোন নির্দিষ্ট আচরণ আয়ত্ত করতে সাফল্যকে। উপরের উদাহরণে বলা হয়েছে সমাসের উদাহরণ দেওয়া নামক আচরণটি হল সূচক বা আরও পরিষ্কার ভাষায়, উদাহরণ দিতে পারা ও না পারার মধ্যে যে পার্থক্য তাই হল সমাসের ধারণা করায় সাফল্যের সূচক।

পপহ্যাম ও হিউসেক (Popham and Husek, 1969) সাফল্য সূচক অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যে অভীক্ষার সাহায্যে কোন একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের মান স্থির করা যায় তাই হল সাফল্য সূচক অভীক্ষা (A Criterion reference test is one that is used to determine the level of success of a learner)। এই কথার অর্থ হল শিক্ষার্থী নিজে কতটা সফল বা অসফল তা স্থির করার জন্যই সাফল্য সূচক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। তাঁরা আরও বলেছেন সাফল্যের এই মান পূর্ব নির্দিষ্ট এবং সেই মান পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হলে তবেই উদ্দিষ্ট আচরণটি আরও করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সফল বলে মনে করা হবে। আইভনের (Ivon 1970) মতে সাফল্য সূচক অভীক্ষায় এমনভাবে পদ বা কৃত্য নির্বাচন করা হয় যা শিক্ষার্থীর আচরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয়। হ্যারিস ও স্টুয়ার্ট (Harris and Stewart 1971) বলেছেন অনেকগুলি সাফল্য সূচক আচরণ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক আচরণগুলিকে বাছাই করে একত্রিত করলেই সাফল্যসূচক অভীক্ষা তৈরি হল (Criterion referenced test is constructed by selecting an assembly of representative behaviour from a host of creterion behaviour)। গ্রোনলান্ড (Gronlund, 1985) বলেছেন, সাফল্যসূচক অভীক্ষা পরিকল্পনা করার সময় দেখা হয় কোন কোন কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সাফল্য বা ব্যর্থতার পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের আরও সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকটিতেই সাফল্য সূচক অভীক্ষার উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.২.১ সাফল্য সূচক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Criterion Referenced Test)

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে দিয়ে সাফল্য সূচক অভীক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত এই অভীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ব্যক্তির সাফল্য বা অসাফল্যের স্তর ঠিক করে দেওয়া। প্রশ্ন হল সাফল্যের মান আচরণ ভিত্তিক হলেও, কিসের ভিত্তিতে সাফল্য সূচক আরচরণগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। শিক্ষাবিদ্‌দের মতে একক ভাবে শিক্ষার লক্ষ্যগুলিই সাফল্যের মান সূচক আচরণগুলিকে চিহ্নিত করে দিতে পারে। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ পরিবর্তন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয়। নীচের সারণিতে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি দেখানো হল।

শিক্ষণীয় বিষয়	শিক্ষার লক্ষ্য	সাফল্য সূচক আচরণ
মধ্যমা (Median)	- সংজ্ঞা বিষয়ক অবগমন - রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগমন -তাৎপর্যবোধ	-মধ্যমার সংজ্ঞা বলতে পারবে -অসংগঠিত রাশির মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্র বলতে পারবে। -মধ্যমার সূত্রকে প্রথম চতুর্থকের (First quartile) সূত্রে রূপান্তরিত করতে পারবে।

উপরের সারণিতে তৃতীয় স্তম্ভে যে আচরণগুলি দেওয়া আছে সেগুলিই সাফল্যের সূচক। অর্থাৎ সংজ্ঞা বলতে পারা, সূত্র বলতে পারা, মধ্যমার সূত্রের সাধারণ নীতি বুঝে তাকে অন্যভাবে রূপান্তরিত করতে পারা- এই কাজগুলিতে সফল হলে শিক্ষক বুঝতে পারবেন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী সফল।

দ্বিতীয় সাফল্য সূচক অভীক্ষা নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা পাঠক্রমের ভিত্তিতে নির্মিত হয়। উপরের উদাহরণে যে স্তরে শিক্ষার্থীরা মধ্যমার পাঠ নেয়, একমাত্র সেই স্তরেই মধ্যমা শেখায় শিক্ষার্থীর সাফল্য অসাফল্য নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এই সূচক সমস্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এক রকম নাও হতে পারে। যদি ক্লাসে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কিছু ছাত্র থাকে যাদের পক্ষে রূপান্তরকরণ সাফল্যের সূচক হিসাবে যথেষ্ট কঠিন, তাদের জন্য শিক্ষক ভিন্ন সাফল্যের সূচক স্থির করতে পারেন (যেমন কিছু অসংগঠিত সংখ্যা দেওয়া থাকলে, মধ্যমাটি চিহ্নিত করতে পারবে)। অর্থাৎ জটিল সূত্র পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির না করে অসংগঠিত সংখ্যার সূত্রটির সহজ প্রয়োগকেই সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে পারেন। সুতরাং সাফল্যের সূচক ও তার পরীক্ষা সর্বজনীন নয়-তা ব্যক্তিমুখী।

তৃতীয়ত সাফল্যের সূচক নির্বাচন ব্যক্তিমুখী হওয়ায় একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য বা অসাফল্যের অন্যের সাফল্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অবশ্য কোন একটি সাফল্যের সূচক সমস্ত ছাত্রছাত্রী স্পর্শ করতে পারলে তা সর্বজনীন সাফল্যের সূচক হিসাবে গণ্য হতে পারে এবং শিক্ষক সেটিকেই সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরে নিয়ে শিক্ষণ কার্যে অগ্রসর হতে পারেন। যেমন কোন পরীক্ষায় শতকরা চল্লিশ নম্বর পেলে একজন ছাত্রকে

পাশ বলে ধরা হবে। এখানে সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধার্য হয়েছে মোট শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ, যা শিখতে পারলেই শিক্ষার্থী সফল বলে গণ্য হবে। আবার সর্বশিক্ষা অভিযান নামক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনায় স্বাক্ষরতার ন্যূনতম মান (Minimum Learning Level or MLL) ধার্য হয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ, অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ের সাফল্য সূচক যে আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্ত শতকরা ৪০ ভাগ, অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ের সাফল্য সূচক যে আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত শতকরা ৪০ ভাগ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে না পারলে তাকে স্বাক্ষর বলা যাবে না।

চতুর্থতঃ সাফল্য সূচক অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার কোন সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয় না। সেই কারণেই প্রতিটি একক লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়। এমন কি একটি লক্ষ্য অর্জনের সাফল্যের সঙ্গে অন্য একটি সাফল্যের সম্পর্ক থাকার প্রশ্নটিও সবসময় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে যদি একটি শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর সাফল্য সূচক আচরণগুলি এমন ভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে যে তাদের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তবে ঐ লক্ষ্যগুলি সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

পঞ্চমত উপরোক্ত কারণে, অর্থাৎ প্রতিটি সাফল্য সূচক আচরণ আয়ত্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ার দরুন, সাফল্য সূচক অভীক্ষায় মোট প্রাপ্ত স্কোরের গুরুত্ব বেশি নয়।

সবশেষে, সাফল্য সূচক অভীক্ষা কোন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ও পরে ব্যবহার করা যায়। কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের 'প্রারম্ভিক' স্তর কোন পর্যায়ে আছে জেনে নিতে চাইলে সাফল্য সূচক অভীক্ষা (অবশ্যই পূর্ববর্তী কোন কার্যক্রমের ভিত্তিতে) প্রয়োগ করতে পারেন। কার্যক্রম শেষ হলে সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ হয়েছে তা জানার জন্য সাফল্য সূচক অভীক্ষা আবার প্রয়োগ করতে পারেন। এখানে পরবর্তী অর্থে কোন দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের কথা বলা হচ্ছে না। দৈনন্দিন পাঠ বা তার অংশবিশেষকেই কার্যক্রম বলা হয়েছে।

৩.২.২ সাফল্য সূচক অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Criterion Referenced Tests)

সাফল্য সূচক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রসংঙ্গে ব্যবহারের কথাও কিছুটা বলা হয়েছে। এর ব্যবহারের পরিসর অপেক্ষাকৃত সীমিত হলেও ব্যবহারের গুরুত্ব কম নয়।

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার সাফল্য সূচক অভীক্ষা পঠন পাঠনের গতি বজায় রাখার জন্য এবং সঠিক প্রগতির মান বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিক্ষক প্রতিদিনকার পঠন পাঠনের মূল্যায়নের জন্য সাফল্য সূচক অভীক্ষা প্রয়োগ করলে তিনি নিশ্চিত থাকেন তার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রগতি যথার্থ। প্রতিদিনকার পঠন পাঠনে ব্যবহৃত সাফল্য সূচক অভীক্ষাকে অনেক সময় শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা (Teacher made test) বলা হয় কারণ এই জাতীয় অভীক্ষা পূর্ব কল্পিত হলেও তাৎক্ষণিক ভাবে শিক্ষককে অভীক্ষা ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্রিক (Personalised) ও কার্যকরী না হলে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষণ পদ্ধতি ও তার কার্যকারিতার মূল্যায়ন করার জন্য সাফল্য সূচক অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে শিক্ষক পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রতিসংঙ্কেত (feedback) পেয়ে যান।

সাফল্যসূচক অভীক্ষা পঠন পাঠন চলাকালীনই ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের সাফল্যের মাত্রা সম্বন্ধে একটা প্রতিসঙ্কেত দিয়ে থাকে। তারা বুঝতে পারে তাদের দুর্বলতা কোথায় এবং সেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা নিজেরাই তৎপর হয়।

ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সাফল্য সূচক অভীক্ষাই মূল্যায়নের একমাত্র হাতিয়ার। কারণ শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিকতার দরুন, তাদের জন্য সাফল্যের লক্ষ্য মাত্রা স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে ভিন্ন। এই দুই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে তুলনা করা যায় না। আবার একজন প্রতিবন্ধীর সংঙ্গে অন্য প্রতিবন্ধীর সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি। ফলে একজনের জন্য নির্ধারিত সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা অন্যের বেলায় প্রায়ই প্রযোজ্য হয় না। সে কারণে মূল্যায়নের সময় প্রত্যেকের জন্য আলাদা সাফল্য সূচক অভীক্ষার প্রয়োজন হয়।

অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) অপেক্ষা ধারাবাহিক মূল্যায়নে ((Formative Evaluation) সাফল্য সূচক অভীক্ষা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ, অন্তিম মূল্যায়ন করা হয় একটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শিক্ষা কার্যক্রমের শেষে। তখন প্রতিটি একক সাফল্যসূচকের ভিত্তিতে অভীক্ষা গঠন করা সম্ভব নয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষাকার্যক্রমের এক একটি ক্ষুদ্রতর অংশের উপর ক্রমাগত মূল্যায়ন চলতে থাকে। তখন প্রতিটি সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করে অভীক্ষা নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

আর সর্বশেষ প্রসঙ্গ হল সাফল্য সূচক অভীক্ষার ব্যবহার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি শ্রেণির প্রতিবছরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একই পাঠক্রম নির্দিষ্ট থাকলেও এবং মোটামুটি ভাবে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি এক প্রকার হলেও, ক্লাসের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের নানা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং সাফল্য সূচক অভীক্ষাকেও পরিবর্তিত করে ব্যবহার করতে হয়।

৩.২.৩ সাফল্য সূচক অভীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Criterion Referenced Test)

সাফল্য সূচক অভীক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও মূল্যায়নে এক অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অভীক্ষার ব্যবহারে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রথমত, এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন একটি শিক্ষার্থীর শিক্ষণের দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা যায় কিন্তু তাঁর শিক্ষার সমগ্ররূপটি বা সামগ্রিক সক্ষমতার পরিমাপ করা যায় না। পাঠক্রমের একটি ক্ষুদ্রতর অংশের ক্ষেত্রে এই অভীক্ষার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা সার্থক। সমগ্র পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সাফল্যের মান সাফল্য সূচক অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সাফল্যসূচক আচরণ নির্বাচন ও সাফল্যের মান নির্দিষ্ট করা এইগুলিই সাফল্য সূচক অভীক্ষার মূল ভিত্তি। কিন্তু অনেক সময় শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। অর্থাৎ সাফল্য সূচক অভীক্ষা সঠিক অর্থে কখনও নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার লক্ষ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস যে ভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমস্ত লক্ষ্যগুলিই সাফল্য সূচক অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। শুধুমাত্র জ্ঞান মূলক লক্ষ্যগুলি এবং সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে সাফল্যের সূচক নির্বাচন করা যায়। উচ্চতর লক্ষ্য, যেমন, মূল্যায়ন (Evaluation) কিম্বা সৃজন (Origination) ইত্যাদির পরিমাপও সাফল্য সূচক অভীক্ষার সাহায্যে করা যায় না।

চতুর্থত, স্বাভাবিক ভাবেই সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাফল্য সূচক অভীক্ষা অপেক্ষাকৃত বহৎ ছাত্র গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ করা যায় না।

এ ছাড়াও শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা দ্রুত তাৎক্ষণিক ভাবে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করে তার ফলাফল ও প্রভাবও খুব স্থায়ী নয়। অর্থাৎ শ্রেণি কক্ষে তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবহার করার পর এই পরিমাপের আর কোন গুরুত্ব থাকে না, অভীক্ষার প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়।

৩.২.৪ সাফল্য সূচক অভীক্ষার রচনা পদ্ধতি (Method of Preparing Criterion Referenced Test)

সাফল্য সূচক অভীক্ষার রচনা পদ্ধতি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত, যথা, অভীক্ষার লক্ষ্য, অভীক্ষার পদ, নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সাফল্যের মাত্রা।

অভীক্ষার লক্ষ্য (Objectives of the Test)

এখানে অভীক্ষার লক্ষ্য কথার অর্থ শুধুমাত্র সমগ্র অভীক্ষার লক্ষ্য নয়। যদি সমগ্র অভীক্ষার একটি লক্ষ্য থাকে তা অভীক্ষা পরিকল্পনার পর্যায়েই স্থির করা হয়। পরবর্তী ধাপগুলি হল ঃ

- অভীক্ষা রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায়, সঠিক শব্দ ব্যবহার করে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখতে হবে।
- পাঠ্যাংশের ধারণা (Concept) গুলি চিহ্নিত করে ছোট ছোট এককে ভাগ করে নিয়ে প্রতিটি এককের লক্ষ্য স্থির করতে হবে।
- এই লক্ষ্যগুলি এমন ভাবে স্থির করতে হয় যে একটি লক্ষ্য একটি মাত্র প্রশ্ন বা কৃত্য (Task) নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।
- প্রতিটি লক্ষ্য নির্বাচনে যুক্তি থাকা দরকার। কেন লক্ষ্যটি উপযোগী তা স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে।
- প্রতিটি লক্ষ্য পাঠ্যাংশের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকা দরকার।

অভীক্ষার পদ রচনা (Writing Test Items)

অভীক্ষার পদ একটি প্রশ্ন বা অন্য কোন কৃত্য হিসাবে রচনা করা হয়। পদ রচনার নীতিগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হল।

- অভীক্ষার পদ রচনার সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ ক্লাসের বিশেষ বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর সুবিধা বা অসুবিধা হবে এরকম ভাবে পদ রচনা করা উচিত নয়।
- অভীক্ষার পদরচনায় কোন কৌশলগত ত্রুটি যেন না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যেমন, কোন লক্ষ্যের বেলায় হয়ত প্রশ্নাকারে পদটি রচনা করা ভালো, কোনো ক্ষেত্রে হয়ত বিশেষ ধরনের সঞ্চালন ক্রিয়া দরকার। কিন্তু এর বিপরীত হলে, অভীক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে না।
- প্রশ্নের ভাষায় বা অন্য নির্দেশিকায় যে লক্ষ্যটি পরিমাপ করা হবে তার যথোপযুক্ত প্রতিফলন হওয়া দরকার।
- প্রতিটি পদের বিষয়বস্তুগত যথার্থতা (Content validity) সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার
- পদ বিশ্লেষণ (Item Analysis) করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না প্রয়োজন হয়। সেজন্য প্রতিটি পদের ভাষা, সম্ভাব্য উত্তর ইত্যাদি বিষয়ে বার বার পরিমার্জন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- প্রশ্ন ও নির্দেশিকার ভাষা সহজ, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার।

নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা (Reliability and Validity)

অন্যান্য অভীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য যত যত্ন নেওয়া হয় সাফল্য সূচক অভীক্ষার ক্ষেত্রে সবসময় তা সম্ভব হয় না। শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা হলে এই প্রয়াস আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নির্ভরযোগ্যতার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে অভীক্ষার কোন গুরুত্ব থাকে না। সেজন্য ন্যূনতম কয়েকটি নীতি মানা দরকার।

- অভীক্ষার পদসংখ্যা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য খুব কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ অভীক্ষার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে নির্ভরযোগ্যতার খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান।
- সাফল্য সূচক অভীক্ষা একই দলের উপর দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পুনঃ পরীক্ষণ (Retest) পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। অভীক্ষার দৈর্ঘ্য বড় হলে অর্ধ বিভাজন পদ্ধতি (Split half method), কোন কোন ক্ষেত্রে সমান্তরাল অভীক্ষা এবং সবক্ষেত্রেই যৌক্তিক তুল্যতার (Rational Equivalence) পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে।
- যদি উদ্দেশ্য সংক্রান্ত এবং পদ রচনার নীতিগুলি যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয় তবে বিষয় ভিত্তিক যথার্থতা অনেকটা নিশ্চিত হয়। এছাড়াও বহির্লক্ষণ (External criteria) পদ্ধতিতে যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব।

সাফল্যের মাত্রা (Level of Success)

সাফল্য সূচক অভীক্ষার যতগুলি পদ বা কৃত্য নির্দিষ্ট আছে তারমধ্যে কতদূর পর্যন্ত সফল" হলে অভীক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যাংশের শিখনে সফল বলে স্থির করা হবে তাকেই বলা হয় সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা বা সাফল্যের মাত্রা (Level of success)।

- কোন পাঠ্যাংশে একজন শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নতম একটি স্কোর স্থির করে তার প্রাথমিক সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঐ মাত্রা অতিক্রম করতে পারলে তবেই শিক্ষার্থীকে পরবর্তী পাঠ্যাংশের যোগ্য বলে মনে করা হয়।
- সাফল্যের মাত্রা সকলের বেলায় এক রকম নাও হতে পারে। কিন্তু যদি সমস্ত শিক্ষার্থীর কাছে একই ধরনের সাফল্য প্রত্যাশা করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকে, তবে সাফল্যের একটিই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা দরকার।
- সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণ করার কারণ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার এবং অভীক্ষার নির্দেশিকায় তার উল্লেখ থাকতে হবে।
- একটিমাত্র সাফল্যের মাত্রা নির্ধারিত হলে তা ক্লাসের অতিদুর্বল বা সবচেয়ে ভালো ছাত্রছাত্রীদের নিরিখে স্থির করা বাঞ্ছনীয় নয়। অধিকাংশ মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত আচরণের ভিত্তিতে তা স্থির করা দরকার।

৩.৩ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা (Norm Referenced Test)

সাফল্য সূচক অভীক্ষার সঙ্গে আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার প্রধান পার্থক্য হল প্রথমটির সাহায্যে 'প্রতিটি একক শিক্ষার্থীর' সাফল্যের মান স্থির করা হয় আর দ্বিতীয়টির বেলায় সমতুল একদল ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের তুলনায় একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের স্তর কোন পর্যায়ে আছে তা স্থির করা হয়। যখন কোন ছাত্রকে উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণ বা কৃতকার্য-অকৃতকার্য এই অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ করা হয়, তখন উত্তীর্ণ বা কৃতকার্য হওয়ার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তা অতিক্রম করতে পারা বা না পারাটাই প্রধান। সেখানে অন্যরা উত্তীর্ণ কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মূল অংশে এক জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, তা নির্ভর করে কোন একটি পূর্বনির্ধারিত মান (যেমন, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য লাফ দিতে পারা, কোন দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য নির্ধারিত সময়ের কম সময়ে দৌড়ানো ইত্যাদি) পর্যন্ত পৌঁছানোর উপর। এইগুলি সাফল্যের মাত্রা, যা সাফল্য সূচক অভীক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আদর্শমান কথাটির অর্থ কোন একটি সমসত্বদল (Homogeneous group) দলগত ভাবে যে লক্ষ্য অর্জন করে তাই। অর্থাৎ দল যদি কোন পরীক্ষায় গড়নম্বর ৪০ পায়, তবে ঐ নম্বরটি দলের আদর্শমান। কোন একজন ব্যক্তি ৪০ বা তার কম অথবা বেশি নম্বর পেলে দলগতভাবে সে ভালো , সাধারণ বা মন্দ এই ধরনের বিশেষণ লাভ করবে। সুতরাং আদর্শমান মানুষের তুলনামূলক অবস্থানের একটি মাপকাঠি (Norm is a measure of ones relative position)।

গ্রোনলান্ড (Gronlund) আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা দলের মধ্যে ব্যক্তির ক্রমিক অবস্থান নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে এমনভাবে নির্মিত হয় যে ঐ অবস্থানকে উচ্চ, নিম্ন বা মাঝামাঝি এরকম বর্ণনাত্মক ভাষায় প্রকাশ করতে সাহায্য করে (Norm referenced tests are constructed with a view to determine the serial position of an individual in his group so as to help expression of that position in descriptive languages like high, low or average.) ।

বরমাথ (Bormuth, 1970) বলেছেন, আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা নির্মাণের উদ্দেশ্য একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের মানকে দলের অন্যান্যদের তুলনায় ক্রমিক অবস্থান রূপে প্রকাশ করা। সামগ্রিকভাবে দলের সাফল্যের মানকে কোন একটি সূচক দ্বারা প্রকাশ করা হলে ঐ সূচকটিকে দলের আদর্শমান বলে। এই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আদর্শমানের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন,

(ক) শতাংশ ক্রম বা বিন্দু (Percentile Rank)

দলের মধ্যে শতকরা কতজন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে নিচে অবস্থান করছে অর্থাৎ তারচেয়ে কম সফল সেই সূচককে বলে শতাংশ ক্রম বা বিন্দু।

(খ) আদর্শ স্কোর (Standard Score)

সমগ্রদলের গড় নম্বর ও সম্যক বিচ্যুতির সাহায্যে আদর্শ স্কোর নির্ণয় করা হয়। গড় নম্বর থেকে ব্যক্তির নম্বরের যে ব্যবধান তার সঙ্গে সম্যক বিচ্যুতির অনুপাতই আদর্শ স্কোর।

(গ) গ্রেড তুল্যতা (Grade Equivalence)

দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাফল্যের মান হিসাবে নম্বরের পরিবর্তে যদি পর্যায়ক্রমিক গ্রেডে, অর্থাৎ ছোট ছোট উপদলে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে একটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তবে সেগুলিকে গ্রেড বলা হয়। এবার দলের অধিকাংশ 'সদস্য' যে গ্রেড পেয়েছে (Modal grade) বা দলের গড় নম্বরের ভিত্তিতে দলের জন্য একটি মান সূচক গ্রেডকে তুলনীয় হিসাবে ধরে ব্যক্তির গ্রেডকে করলে তাকে গ্রেড তুল্যতা বলে।

আদর্শমান সম্বন্ধে গবেষণার রীতিপদ্ধতিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং গ্রেডিং পদ্ধতি সম্বন্ধে পরবর্তী একটি এককে আরও আলোচনা করা হবে। এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল শুধু এটুকু বোঝানোর জন্য যে আদর্শমান ভিত্তিক যে কোন অভীক্ষায় উপরোক্ত এক বা একাধিক আদর্শমান নির্ণয় করা আবশ্যিক।

৩.৩.১ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Norm Referenced Test)

আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার সংজ্ঞা ও বর্ণনা থেকে এর যে সব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

- এই জাতীয় অভীক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রম ভিত্তিক সাফল্যের তুলনামূলক বিচার করা। পাঠক্রম ছাড়াও

অনেক মানসিক সক্ষমতার পরিমাপ করার জন্য মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত অভীক্ষা ব্যবহৃত হয় সেগুলিও আদর্শমান ভিত্তিক। অর্থাৎ যে কোন অভীক্ষা আদর্শমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির দলগত অবস্থা নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হলে তাকেই আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা বলা হয়।

- আদর্শমান নির্ণয় করার প্রক্রিয়া এই জাতীয় অভীক্ষা নির্মাণের একটি আবশ্যিক অঙ্গ।
- পাঠক্রমের একটি বৃহৎ অংশের অথবা এমনকি সমগ্র পাঠক্রমের জন্যও একটি আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা নির্মাণ করা যায়।
- শ্রেণি কক্ষের দৈনন্দিন পঠন পাঠনের মূল্যায়নের জন্য আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা উপযোগী নয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নের চেয়ে, অন্তিম মূল্যায়নে এই জাতীয় অভীক্ষা প্রয়োগ অধিক যুক্তিযুক্ত।
- ব্যক্তির একক স্কোরের কোন স্থায়ী মূল্য নেই। কোন কারণে আদর্শমান পরিবর্তিত হলে, ব্যক্তির স্কোরের তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন, কোন একটি দলের আদর্শমান অনুযায়ী একজন ছাত্রের নম্বর উচ্চশ্রেণির বলে গণ্য হওয়ার পর আরও বড় দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে হয়ত দেখা গেল নতুন আদর্শমান পূর্ববর্তী আদর্শমানের চেয়ে বেশি। নতুন আদর্শমানের ভিত্তিতে উক্ত ছাত্রটি এবার মাঝামাঝি বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।
- আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ব্যক্তির সাফল্যকে সকলের বোধগম্য বর্ণনাত্মক ভাষায় প্রকাশ করা। ভালো ছাত্র বা মাঝারি ছাত্র এই জাতীয় ভাষা সকলের বোধগম্য, রাশিবিজ্ঞানের ভাষা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার ঐ জাতীয় বর্ণনারও কোনো চিরন্তন মূল্য নেই। এই বর্ণনা শুধুমাত্রই একটি দলের তুলনায় ব্যক্তির অবস্থান।

আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি গবেষণার রীতি পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। নির্মাণের প্রাথমিক ধাপগুলি সাফল্য সূচক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি অনুরূপ। কিন্তু অভীক্ষাটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষা গঠন সম্পূর্ণ হয়। এগুলি হল,

- নমুনাদলের উপর প্রয়োগ এবং পদবিশ্লেষণ (Item Analysis) করে পদগুলির কাঠিন্যের মান (Difficulty value), বিনিশ্চয় ক্ষমতা (Discriminating power) ইত্যাদি নির্ণয় করা।
- যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা।
- আদর্শমান নির্ণয় করা। অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক দলের জন্য আলাদা আলাদা আদর্শমান নির্ণয় করা।
- ব্যবহার বিধি ও নির্দেশিকা তৈরি করা।

প্রয়োজন, প্রকরণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আদর্শমান অভীক্ষার কয়েকটি প্রকারভেদ আছে।

৩.৩.১ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ (Types of Norm Referenced Test)

আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার শ্রেণি বিভাগ প্রধানত প্রয়োজন হয় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য। মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের আয়ত্তজ্ঞান (Achievement) পরিমাপের জন্যই আদর্শমান

ভিত্তিক অভীক্ষার নানা প্রকারভেদ সৃষ্টি হয়েছে। নীচের ছকটিতে এ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে।

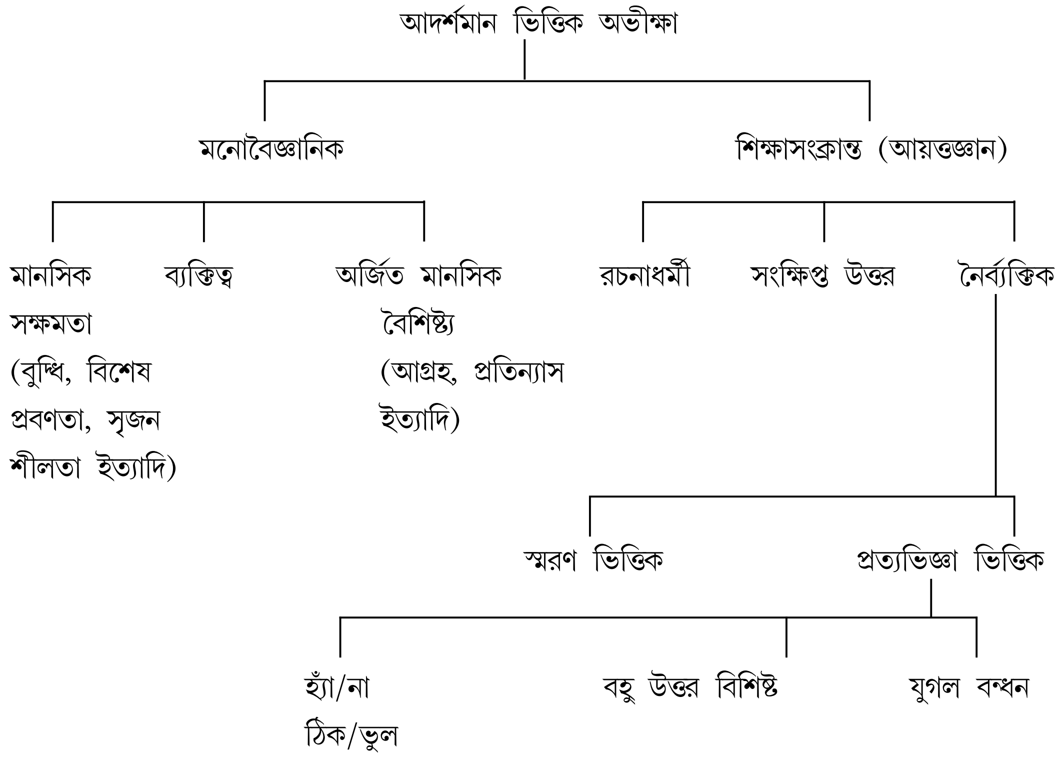

উপরোক্ত শ্রেণি বিভাগের ছকটি বিভিন্ন লেখকরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে এর দুই একটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে প্রথমেই আয়ত্তজ্ঞান অভীক্ষার বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে। তারপর মনোবৈজ্ঞানিক হাতিয়ারগুলিও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে। কারণ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করা প্রয়োজন।

৩.৪ রচনাধর্মী অভীক্ষা (Essay Test)

রচনাধর্মী অভীক্ষাকে আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ, রচনাত্মক অভীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর দলগত সাফল্য অসাফল্যের নিরিখে বিচার করা হয়। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ রচনাত্মক অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের আয়ত্তজ্ঞান পরিমাপ করা। রচনাত্মক অভীক্ষার ব্যবহার দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত থর্নডাইক (Thorndike) বলেছেন এই পরীক্ষা খ্রিষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দেও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এই ধরনের

পরীক্ষার ব্যাপক প্রচলন ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে বা ইংরাজী প্রথায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সময় থেকে। নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও রচনাত্মক অভীক্ষার অবলুপ্তির আশু কোনো সম্ভাবনা নেই। সেজন্য মূল্যায়নের জন্য এর ব্যবহার, দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্য জানা একান্ত আবশ্যক।

ইবেল ও ফ্রিসবি (Ebel and Frisbie) তাঁদের Esentials of Educational Measurement (1986) নামক পুস্তকে বলেছেন, একাধিক প্রশ্নের দীর্ঘ লিখিত উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান নির্ণয় করার পদ্ধতিই হল রচনাধর্মী অভীক্ষা (The method of assessing the level of learning by long answers to more than one question is called essay test)।

স্যাক্স (Sax, 1989) তাঁর Principles of Educational and psychological Measurement and Evaluation গ্রন্থে বলেছেন, রচনাত্মক অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক প্রশ্নের দীর্ঘ লিখিত উত্তর দিতে বলা হয়।

রচনাত্মক অভীক্ষায় প্রশ্নগুলি সাধারণত নানা প্রকার জিজ্ঞাসা সূচক বা নির্দেশমূলক ভাষায় লেখা হয়। যেমন,

- কি, কে, কেন, কোনটি, কোথায়, ইত্যাদি (What, who, why, which one, where etc.)
- তালিকা দিন (Give a list of)
- রূপরেখা বর্ণনা করুন (Give an outline of)
- বর্ণনা করুন (Describe)
- পার্থক্য নির্দেশ করুন (Differentiate)
- তুলনা করুন (Compare)
- ব্যাখ্যা করুন (Explain)
- আলোচনা করুন (Discuss)
- পরিস্ফুট করুন (Elucidate)
- মূল্যায়ন করুন বা বিচার করুন (Evaluate)
- সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করুন (Write briefly)

মনরো ও কার্টার (Monroe and Carter, 1993) রচনাধর্মী প্রশ্নে নিম্নলিখিত প্রকারভেদগুলি নির্দেশ করেছেন।

(ক) বিশ্লেষণ, (খ) সূত্র, নীতি বা নিয়মের নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ, (গ) কার্যকারণ নির্ণয়, (ঘ) শ্রেণি বিভাজন, (ঙ) দুইটি ধারণা বা বিষয়ের সঠিক তুলনা, (চ) দুইটি ধারণা বা বিষয়কে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলনা, (ছ) কোন বক্তব্যের যথার্থতা, সত্যতা, তাৎপর্য বিষয়ক সমালোচনা, (জ) পক্ষে বা বিপক্ষে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (ঝ) কোন বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য নির্ণয়, (ঞ) মূল্যায়ন, (ট) নূতন প্রশ্ন উত্থাপন। সমস্যা নির্ধারণ বা আলোচনা, (ঠ) উদাহরণ দেওয়া, (ড) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, (ঢ) নতুন কার্যপ্রণালী নির্ণয়, (ণ) রূপরেখা, (ত) তথ্যের পুনঃ সংগঠন, (থ) সম্পর্ক নির্ণয় এবং (দ) সার সংক্ষেপ লেখা।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, প্রশ্নকর্তার ব্যক্তিগত দক্ষতা উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষার স্তর এবং সক্ষমতা এই সবের পার্থক্যের দরুন রচনাত্মক অভীক্ষার ভাষায় অসংখ্য বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সেজন্য রচনাত্মক অভীক্ষার ভাষার যেকোন তালিকাই রচনাত্মক অসম্পূর্ণ অভীক্ষায় যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়, সেহেতু একে দ্রুতি অভীক্ষা (Speed Test) শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

৩.৪.১ রচনাধর্মী অভীক্ষাগুণ (Merits of Essay Test)

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে হাতিয়ারগুলি সম্বন্ধে যত সমালোচনা হয়ে থাকে তার একটা প্রধান অংশই রচনাধর্মী বা রচনাত্মক অভীক্ষা প্রসঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরনের অভীক্ষার এমন কিছুগুণ আছে যা অন্য অভীক্ষার বেলায় অনুপস্থিত। যেমন,

- ধারাবাহিকভাবে যুক্তি সাজিয়ে, নিজের মত করে বক্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ একমাত্র রচনাত্মক অভীক্ষাতেই আছে। নিজেকে স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করার সুযোগ, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা প্রথম থেকেই রচনাত্মক অভীক্ষার মাধ্যমে পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের যৌক্তিক বিকাশ ঠিকমত হতে পারে।
- উত্তর লেখার ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা করার প্রেরণা দেয় রচনাত্মক অভীক্ষা। শিক্ষকরা যদি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন না হন, তবে রচনাত্মক অভীক্ষার পথধরে ছাত্রছাত্রীরা সৃজনশীল চিন্তায় উৎসাহিত হয়।
- এই অভীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের সারসংক্ষেপ তৈরি করা, রচনাত্মক উত্তর সঠিকভাবে তাদের ব্যবহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু আত্মস্থ করার ক্ষমতা জন্মে। প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সার্থকভাবে পরীক্ষা করার উৎকৃষ্ট উপায় রচনাত্মক অভীক্ষা।
- শিক্ষার্থীর চিন্তার প্রসার গ্রহণ ক্ষমতা, যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা, আলোচনা-সমালোচনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় রচনাত্মক অভীক্ষার উত্তর লেখার মধ্য দিয়ে।
- সাধারণভাবে যৌক্তিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে, তা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। অর্থাৎ যৌক্তিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন হয় সবচেয়ে বেশি।
- রচনাত্মক অভীক্ষা তৈরি করা তুলনামূলকভাবে সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ। পাঠ্যাংশগুলি নির্বাচিত

হলে, তার মূল্য বিষয়গুলিকে জানতে চেয়ে প্রশ্ন বা নির্দেশ আকারে প্রকাশ করলেই রচনাত্মক অভীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করা হল।

- এই জাতীয় অভীক্ষা দলগতভাবে একযোগে বহু ছাত্রছাত্রীর উপর প্রয়োগ করা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একই দিনে এক সঙ্গে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেওয়া হয়।
- উত্তরপত্র পরীক্ষা করা ও নম্বর দেওয়ার কাজে খুব বেশি খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া হয় না। ফলে প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া পদ্ধতিতে মূল্যায়নের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।
- অনুমান নির্ভর উত্তর লেখার সুযোগ রচনাত্মক অভীক্ষায় কম। অনুমানের ভিত্তিতে সমস্ত যুক্তি তথ্য সাজানো যায় না।
- ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual Difference) প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রচনাত্মক অভীক্ষার উত্তর লেখায়। প্রশ্ন নির্বাচন থেকেই ব্যক্তিগত বৈষম্যের সূত্রপাত হয়। উত্তরের উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তির স্বকীয়তা ফুটে ওঠে।
- এই অভীক্ষার প্রশ্নপত্র ছোট হওয়ার দরুন সহজেই তৈরি করা যায়। এমনকি প্রয়োজন হলে ব্ল্যাকবোর্ডেও লিখে দেওয়া যায়। বিশেষত প্রশ্নগুলিই নির্দেশমূলক হওয়াতে আর বিশেষ কোন স্বতন্ত্র নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। ফলে ছোট কাগজে মুদ্রিত আকারে বিতরণ করতে কোন সমস্যা হয় না।
- অভীক্ষা নির্মাণ ও পরীক্ষার ব্যয় কম। অন্যান্য উপকরণ বিশেষ প্রয়োজন না হলে, একটি প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার জন্য সাদা উত্তরপত্র হলেই কাজ চলে।
- এই অভীক্ষার সাহায্যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির পরিমাপ করা যায়। যুক্তি, চিন্তা ইত্যাদি ছাড়াও, কিভাবে পরীক্ষার্থী কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়, কিভাবে ভয় এবং উদ্বেগ জয় করে, ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতিফলন ঘটে অভীক্ষার লিখিত উত্তরে।
- শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ও তার কারণ নির্ণয় করা যায় রচনাত্মক অভীক্ষার মাধ্যমে। অর্থাৎ রচনাত্মক অভীক্ষার একটি নিদানমূলক ভূমিকা (Diagnostic role) আছে।
- প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীকে বিচ্ছিন্নভাবে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে পাঠ্যাংশের সমগ্র অংশের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। এর ফলে তার একটি সমগ্রতাবোধ জন্মে।
- এতে অসাধু উপায় অবলম্বনের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম।
- উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষকের বিচারবোধ সদা সক্রিয় রাখার প্রয়োজন হয়। ফলে শিক্ষকদের নৈতিক ও পেশা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

এইসব-গুণগুলির সবকয়টি সমস্ত রচনাত্মক অভীক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর না হলেও, মোটের ওপর রচনাত্মক

অভীক্ষার গুণ কখনই অস্বীকার করা যায়নি। নানা সমালোচনা হলেও শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রয়োজনে রচনাত্মক অভীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার কথা কোনো শিক্ষাবিদই বলতে পারেননি। রচনাত্মক অভীক্ষা যে সমস্ত কারণে সমালোচিত হয় সেই সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গাটিও জানা দরকার।

৩.৪ রচনাধর্মী অভীক্ষার ত্রুটি (Demerits of Essay Test)

রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণগুলি প্রায়ই যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় না। পরিবর্তে এই জাতীয় অভীক্ষাকে একটি সহজ ও সুবিধাজনক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত করার প্রবণতা বেশি। এই ত্রুটিগুলির কথা একে একে উল্লেখ করা হল ঃ

- এই অভীক্ষায় মুখস্থ করা তথ্যের উপর জোর দেওয়া হয় বেশি। যারা যত বেশি তথ্য মুখস্থ করতে পারে পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা তাদের ততই বেশি।
- রচনাধর্মী অভীক্ষায় বিষয়বস্তুগত যথার্থতা (Content validity) বেশ কম। কারণ প্রথমত অল্প সংখ্যক প্রশ্ন রচনা করার সুযোগ থাকায় পাঠক্রমের অল্প অংশের ভিত্তিতে প্রশ্নরচনা করা সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বিষয়বস্তু ছাড়াও আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (যেমন— রচনাশৈলি, ভাষার উৎকর্ষ ইত্যাদি) প্রাধান্য পায়।
- রচনাত্মক অভীক্ষায় উত্তর পত্র মূল্যায়ন করার সময় নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় থাকে না। কারণ উত্তরের মান সম্বন্ধে প্রায়ই কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। পরীক্ষক তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী নম্বর দেন। এর ফলে একই উত্তর একাধিক পরীক্ষক মূল্যায়ন করলে নম্বরের পার্থক্য কখনও কখনও অস্বাভাবিক বেশি হয়। এমন কি একই উত্তর একই পরীক্ষক ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করে আলাদা নম্বর দিতে পারেন।
- পরীক্ষক যখন অনেক উত্তর পত্র পরীক্ষা করেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন দিনে মূল্যায়ন করা উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমতা থাকে না। তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার প্রভাব কখনও কখনও মূল্যায়নের উপর নিজের অজ্ঞাতেই পড়ে।
- যদি পরীক্ষার্থীর পরিচয় জানা থাকে তবে মূল্যায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভালোছাত্রের খাতা, মন্দ ছাত্রের খাতা সবসময় সমান বিচার পায়না। অবশ্য নিরপেক্ষ পরীক্ষক উত্তরপত্র পরীক্ষা করলে এই ত্রুটি নাও হতে পারে।
- উপরোক্ত পক্ষপাতিত্ব অন্যভাবেও হতে পারে। রচনাধর্মী অভীক্ষার মুল্যায়ন করা হয় আপেক্ষিক ভালোমন্দের বিচারে। সে ক্ষেত্রে একই পরীক্ষার্থী দুই একটি খুব ভালো লেখার পর যখন একটি সাধারণ উত্তর লেখে তখন অনেক সময় সাধারণ উত্তরটি নিজের উত্তরের সঙ্গো তুলনামূলক বিচারে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেতে পারে যা সাধারণের চেয়েও কম।
- নানা অবান্তর বিষয় উত্তর পত্রের মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। যেমন হাতের লেখা, বানান, দৃষ্টি আকর্ষণী চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি পরীক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- পরীক্ষকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রভাব ফেলে। কোন পরীক্ষক কিছুটা উদার

কেউ অকারণ কঠোর, কেউ ধৈর্যহীন বা বিরক্তিপ্রবণ, এই সব কারণে নম্বর দেওয়ার সময় সঠিক তুলনামূলক বিচার ব্যাহত হয়।

- অনেক সময়ই পরীক্ষার্থীর নিজস্ব জ্ঞান, 'যুক্তিবোধ, তথ্যআহরণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ রচনাধর্মী অভীক্ষায় ধরা পড়েনা। অন্যের লেখা উত্তর মুখস্থ করে বা না বুঝে মুখস্থ করে ভালো নম্বর পাওয়ার অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

অভীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে মূল্যায়নের জন্য বহু সময় প্রয়োজন হয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখার জন্য যদি একই উত্তর দুইজন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন করেন, তবে আরও বেশি সময় দরকার হয়।

- উপরোক্ত ত্রুটিগুলি সংশোধন করে রচনাত্মক অভীক্ষার অনেকটা উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

৩.৪.৩ রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতি সাধন (Improvement of Essay Test)

তিনটি পর্যায়ে রচনাত্মক অভীক্ষার উন্নতি করা সম্ভব—অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনা, অভীক্ষার প্রয়োগ এবং উত্তর পত্রের মূল্যায়ন।

অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনা

- অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনা সময়, প্রশ্নকর্তা উত্তরের আদর্শ নমুনা তৈরি করে দেবেন। উত্তরের দৈর্ঘ্য (যেমন ২৫০টি শব্দ), সম্ভাব্য সময় ইত্যাদিও উল্লেখ করা দরকার।
- যতদূর সম্ভব পাঠ্যাংশের অধিকাংশ বিষয় প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কোন প্রশ্ন, পাঠ্যাংশের কোন অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বিকল্প প্রশ্ন রচনার সময় দেখা দরকার যে প্রতিটি বিকল্পপ্রশ্নের কাঠিন্যের মান, দৈর্ঘ্য ও সময় যেন যথা—সম্ভব সমান থাকে। অর্থাৎ শুধু সহজ প্রশ্ন বাছাই করে ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা যেন না থাকে। আবার বিকল্প প্রশ্নের বিন্যাস যেন এমন হয় যে বাছাই করার দরুন, পাঠ্যাংশের অংশবিশেষ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে যেতে না পারে।
- পাঠ্যাংশের সরাসরি বর্ণনা অপেক্ষা সংগঠিত উত্তর দেওয়ার মত প্রশ্ন রচনা করা উচিত। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতা (Cognitive skill), যুক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদির প্রয়োগ যাতে বেশি হয় প্রশ্ন রচনার সময় তা দেখা দরকার।
- প্রশ্নের ভাষা সহজ, বোধগম্য এবং সরল হওয়া প্রয়োজন যাতে পরীক্ষার্থী শুধু প্রশ্ন না বুঝতে পারার দরুন অনুমান নির্ভর উত্তর না দেয়।
- প্রশ্ন রচনা করার সময় উত্তরের সময়সীমা মাঝামাঝি রাখা উচিত। কারণ যারা মধ্যমগতিতে উত্তর লেখে তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। অতিরিক্ত দ্রুত উত্তর লিখতে বাধ্য করলে অনেক সময় হাতের লেখা অপাঠ্য হয়। মুখস্থ উত্তর লেখার প্রবণতা বাড়ে, পরীক্ষার্থীরা নিজস্ব যুক্তি, বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যবহার করার সময় কম পায়। অনেক উত্তর কার্যত অসম্পূর্ণ থাকে।
- শিক্ষার লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের প্রশ্নের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। অবগমন মূলক

(Knowledge), তাৎপর্যবোধ (Comprehension), প্রয়োগ (Application) ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের লক্ষ্য এমনভাবে প্রশ্নে থাকা দরকার যে পরীক্ষার্থী যেন শুধু মুখস্থ করে উত্তর দিতে না পারে।

- সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া আলোচনা, বর্ণনা বা বিন্যাস অনুসরণ করে প্রশ্ন রচনা না করে নিম্নলিখিত ধাপ অনুযায়ী প্রশ্ন রচনা করলে অনেকটা ত্রুটিমুক্ত অভীক্ষা রচনা করা সম্ভব।

(ক) প্রথমে পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্নের উপযুক্ত বিষয় বা ধারণাগুলিকে চিহ্নিত করে নিতে হবে। স্থির করে নিতে হবে কোন্ অংশ থেকে কয়টি কিধরনের প্রশ্ন রচনা করা হবে।

(খ) তারপর নির্বাচিত বিষয়গুলির জন্য প্রশ্নের লক্ষ্য (objective) নির্বাচন করতে হবে এমনভাবে যেন প্রত্যেক প্রকার লক্ষ্য যথাসম্ভব প্রশ্নে থাকে। অবশ্য লক্ষ্য নির্বাচন বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী ঠিক করতে হবে।

(গ) এবার লক্ষ্যভিত্তিক প্রশ্নের খসড়া তৈরি করে দেখতে হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যগুলি প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। যেমন, কোন পরীক্ষায় মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হবে। প্রশ্নকর্তা ঠিক করে নিলেন, দুইটি অবগমন মূলক, দুইটি তাৎপর্যবোধ মূলক, একটি বিশ্লেষণাত্মক ও একটি প্রয়োগ মূলক প্রশ্ন যেন শিক্ষার্থীরা লেখে। এবার বিকল্প প্রশ্ন যদি আরও পাঁচটি থাকে, তবে তাদের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নীতি অনুসরণ করে প্রশ্ন রচনা করতে হবে।

(ঘ) খসড়া প্রশ্নের ভাষা বার বার পরিমার্জন করা দরকার। সম্ভব হলে একাধিক বিকল্প প্রশ্ন লিখে তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় লেখা প্রশ্নটিকে নির্বাচন করে অন্যগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য লক্ষ্য অনুযায়ী প্রশ্নের ভাষা আলাদা হবে।

(ঙ) এবার খসড়া প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কি হবে প্রশ্নকর্তা সেটি লিখতে চেষ্টা করবেন। যদি দেখা যায় কোথাও কোন অস্পষ্টতা আছে, তবে প্রশ্নের ভাষা আবার পরিবর্তন করতে হবে।

(চ) সবশেষে উত্তর অনুযায়ী নম্বর বিভাজন করে অভীক্ষার চূড়ান্ত রূপদান করতে হবে।

অভীক্ষার প্রয়োগ

রচনাত্মক অভীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবহার বিধি রচনা করা হয় না কিন্তু দুই একটি বিষয় মনে রাখলে এই জাতীয় অভীক্ষার ত্রুটি পরোক্ষভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- পরীক্ষা শুরুর কিছু আগে থেকেই পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে বসবে। বসার ব্যবস্থা ব্যবধানযুক্ত ও আরামদায়ক হওয়া দরকার।
- প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য এবং নির্বাচন করার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় দিলে শিক্ষার্থীরা উদ্বেগমুক্ত হবে।
- প্রত্যেক পরীক্ষার্থী প্রশ্নের সংখ্যা অনুযায়ী সময় বিভাজন করে রাখলে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সমমানের হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।
- অতিরিক্ত মন্থর বা অতিরিক্ত দ্রুত উত্তর লেখায় নিরুৎসাহিত করা দরকার। সময় সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সচেতন করে দেওয়া দরকার।

অভীক্ষার মূল্যায়ন

রচনাধর্মী অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পদ্ধতিটিই সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষক উত্তরটি মোটামুটি পড়ে তাৎক্ষণিক ধারণা অনুযায়ী একটি নম্বর বসান। প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত নম্বর যত বেশি ততই নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ হতে থাকে। এই জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে মুল্যায়নের ত্রুটি দূরকরা উচিত।

- সমস্ত পরীক্ষার্থীর একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে মূল্যায়ন করলে তুলনামূলক বিচার সহজ হবে।
- প্রথমেই নম্বর না দিয়ে উত্তরগুলিকে গুণানুসারে পাঁচটি বা সাতটি ক্রমিক স্তরে ভাগ করে নিয়ে তারপর ক্রম পর্যায়ে নম্বর দিলে সকলের প্রতি সুবিচার করা হবে। যেমন, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যারা এক নং প্রশ্নের উত্তর লিখেছে তাদের খাতাগুলি অসাধারণ, খুব ভালো, ভালো, মোটামুটি, খারাপ, খুব খারাপ, অবান্তর অথবা ভুল উত্তর এরকম সাতটি ভাগে ভাগ করে তারপর ক্রমান্বয়ে নম্বর দিলে তুলনামূলক বিচার সহজ হবে।
- যতদূর সম্ভব অবান্তর বিষয় যেমন হাতের লেখা, বানান, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, কোন বিশেষ চিন্তাধারার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি এড়িয়ে নম্বর দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- যদি আদর্শ উত্তর দেওয়া থাকে তবে উত্তর আদর্শের কতটা কাছাকাছি আছে তার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া যেতে পারে।
- যদি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা নম্বর ধার্য হয়ে থাকে তবে পৃথক পৃথক অংশের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নম্বর দেওয়া উচিত।
- প্রশ্নে লিখিত নির্দেশ সঠিকভাবে অনুসরণ করা দরকার। যদি বলা হয় কারণগুলি লেখ, তবে কারণ ছাড়া অন্য কিছু লিখলে তা নম্বরের জন্য বিবেচ্য হবে না।

৩.৫ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Tests)

রচনাধর্মী অভীক্ষার প্রধানতম ত্রুটি এর ব্যক্তিনির্ভরতা (Subjectivity) যত সতর্কতাই অবলম্বন করা হোকনা কেন, এই জাতীয় অভীক্ষাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ করে তোলা যায়না। সেই জন্য সমস্ত মূল্যায়ন বিশারদরা নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন। এক সময়ে এই অভীক্ষাগুলিকে নতুন প্রকার অভীক্ষা (New type test) বলা হত। এখন এই অভীক্ষা বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত হওয়ার দরুন আর এই নাম ব্যবহার করা হয়না। আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে প্রথমেই দেওয়া ছকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা কোনো একটি বিশেষ অভীক্ষা নয়— এক ধরনের অভীক্ষা।

ইবেল ও ফ্রিসবি (R.L. Ebel and D.A. Frisbie, 1986) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল—পূর্ব নির্ধারিত সরল ও নির্ভুল উত্তরের মাধ্যমে মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত বা

বিচারের প্রভাব দূর করার যে পদ্ধতি তাই হল নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective tests are the methods of removing subjective influences of personal opinion or judgement in assessment by predetermined simple and correct answers)।

ক্যারি (L. M. Carey, 1988) বলেছেন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় শিক্ষার্থীকে একটি মাত্র শব্দ বা সর্বোত্তম উত্তর বেছে নিতে বলা হয়। এই প্রশ্নগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক বলা হয় কারণ এদের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়াই মূল্যায়ন করা যায় (In objective test learners are asked to select only one correct or best answer. These are called objective becasue, they can be evaluated without any personal influence)।

সুতরাং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রধান এবং প্রাথমিক শর্ত হল, প্রত্যেক প্রশ্নের একটি মাত্র শুদ্ধ উত্তর থাকবে। এবং শুদ্ধ উত্তরটি প্রশ্ন রচনার সময়ই নির্দিষ্ট করা থাকবে। এখানে পরীক্ষকের পক্ষে একমাত্র দেখার বিষয় হল উত্তরদাতা নির্ধারিত সঠিক উত্তরটি লিখেছে কি না বা চিহ্নিত করেছে কিনা। নম্বর দেওয়ার সময়ও কোনো ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার সুযোগ থাকে না। শুদ্ধ হলে এক, ভুল হলে শূন্য এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বর নির্ণয় করা হয় একান্ত যান্ত্রিকভাবে।

৩.৫.১ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ (Types of objective Tests)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এখানে এই প্রকারভেদগুলি সম্বন্ধে আরও বিশদ ভাবে উল্লেখ করা হবে। প্রথমেই বলা হয়েছে দুটি প্রধান প্রকারভেদের কথা, স্মরণ ক্রিয়া ভিত্তিক (Recall type) এবং প্রত্যভিজ্ঞা ভিত্তিক (Reeognilion type)।

স্মরণ ক্রিয়া ভিত্তিক (Recall type) প্রশ্নগুলিতে সঠিক উত্তরটি প্রশ্নরচনার সময় স্থির করা হয় কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরটি দেওয়া থাকেনা। পরীক্ষার্থীকে তার স্মৃতি থেকে উত্তরটি মনে করে লিখতে হয়। উদাহরণ ঃ শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ ভারতের রাজধানীর নাম — । জিন বিজ্ঞানের জনকের নাম লেখো ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, রচনাধর্মী অভীক্ষাও এক হিসাবে স্মরণক্রিয়া ভিত্তিক অভীক্ষা। এই ধরনের অভীক্ষার প্রধান অসুবিধা হল, শিক্ষার্থী উত্তরটি জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ে স্মরণ করতে না পারার দরুন নম্বর না পেতে পারে। অর্থাৎ এখানে জানা বা না জানার চেয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মনে করতে পারা বা না পারার উপর।

দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্ন হল প্রত্যভিজ্ঞা ভিত্তিক (Recognition type)। এখানে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরটিও দেওয়া আছে। উত্তর দাতার কাজ সঠিক উত্তরটিকে চিনে নিয়ে চিহ্নিত করা। এর অনেকগুলি রকমফের আছে।

সত্যি-মিথ্যা (True-False)

এখানে একগুচ্ছ বক্তব্য বিষয় পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে কয়েকটি বক্তব্য সত্যি আর কয়েকটি মিথ্যা। অভীক্ষার্থীর কাজ কোন্‌গুলি সত্যি আর কোন্‌গুলি মিথ্যা তা চিহ্নিত করা। কখনও কখনও সত্যি-মিথ্যার পরিবর্তে হ্যাঁ-না (Yes - NO) এরকম বিকল্প উত্তরও দেওয়া হয়।

উদাহরণ ঃ মনঃ সমীক্ষণী মতবাদের উদগাতার নাম ইয়ুং (সত্যি/মিথ্যা অথবা হ্যাঁ/না)

টোলম্যান (Tolman) ছিলেন উদ্দেশ্যমুখী আচরণবাদী (Purposive behaviourist) (হ্যাঁ/না অথবা সত্যি/মিথ্যা)

এধরনের প্রশ্নেরও কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। সমস্ত প্রকার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা অসুবিধা প্রসঙ্গটি একসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে।

যুগল বন্ধন (Matching Type)

এই ধরনের প্রশ্নে পাশাপাশি দুইটি স্তম্ভে কিছু তথ্য দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাঁদিকের স্তম্ভের বিষয়ের সঙ্গে ডান দিকের স্তম্ভে দেওয়া তথ্যগুলির মধ্যে যেটি সম্পর্কিত সেটি চিহ্নিত করতে। অর্থাৎ দুই স্তম্ভ থেকে একটি করে বিষয় নিয়ে জোড়া তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উদাহরণ ঃ নীচের বাঁদিকে দেওয়া নামগুলির সঙ্গে ডানদিকের বিষয়গুলির যেটি যার সঙ্গে যাবে তা চিহ্নিত করে একই ক্রমিক নম্বর পাশের বন্ধনীতে লিখুন।

মেন্ডেল	( )	নির্মিতিবাদ	( )
ক্যাটেল	( )	আচরণবাদ	( )
ব্রুনার	( )	ব্যক্তিত্ব	( )
এবিংহস	( )	জিনতত্ত্ব	( )
ম্যাকডুগাল	( )	প্রজ্ঞাবাদ	( )
ওয়াটসন	( )	স্মৃতি	( )

এই অভীক্ষার সাহায্যে শুধুমাত্র অবগমন (Knowledge) বিষয়ক শিক্ষার লক্ষ্য পরিমাপ করা যায়। প্রয়োগ বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি লক্ষ্যগুলির পরিমাপ করা যায় না। পাঠ্যাংশের সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অভীক্ষা রচনা করা কঠিন কারণ সবসময় যুগল তথ্য পাওয়া কঠিন। কিন্তু যুগল বন্ধন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি এই যে এখানে অনুমান ভিত্তিক উত্তরের কিছুটা সুযোগ আছে। বিশেষত, যদি উত্তরদাতা একটি ছাড়া বাকি জোড়গুলি নিশ্চিতভাবে মেলাতে পারে তবে শেষেরটি স্বাভাবিকভাবেই মিলে যায় এবং অন্ততঃ একটি তথ্য না জেনেও পরীক্ষার্থী নম্বর পেতে পারে। অবশ্য একটি স্তম্ভে তিন চারটি অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করলে, এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষা (Multiple Choice Test)

শিক্ষায় আয়ত্তজ্ঞান অভীক্ষার (Achievement) ও মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত অধিকাংশ অভীক্ষায় এই জাতীয় প্রশ্ন বা পদ ব্যবহার করা হয়। নানা কারণে বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য তিন থেকে পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। সব কয়টি উত্তরই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত কিন্তু একটি মাত্র উত্তর প্রকৃত সঠিক। উত্তরদাতার কাজ প্রশ্নটি পড়ে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে চিহ্নিত করা। সেজন্য একে বহু উত্তর বিশিষ্ট (Multiple Choice) বলা হয়। অনেক সময়ই প্রশ্নপত্রেই উত্তর চিহ্নিত করার নির্দেশ থাকে। কিন্তু যদি একই প্রশ্নপত্র বার বার ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তবে স্বতন্ত্র উত্তরপত্র ব্যবহার করা হয়।

এই ধরনের প্রশ্নে অল্প কিছু রকম ফের করা যেতে পারে।

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন।

২। সর্বোত্তম উত্তর নির্বাচন—এক্ষেত্রে প্রদত্ত সবকয়টি উত্তরই ঠিক। কিন্তু একটি উত্তর সবচেয়ে ভালো, সেটিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। অর্থাৎ উত্তরদাতার বিচার ক্ষমতার পরিমাপ করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন রচনা করা হয়।

৩। একাধিক সঠিক উত্তর নির্বাচন—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত উত্তরগুলির সব কয়টিই ভুল উত্তর নয়। একাধিক সঠিক উত্তর সম্ভব। এই ধরনের প্রশ্নে উত্তরদাতা যতগুলি সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে পারবে তার প্রাপ্য নম্বর তত হবে। এক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কিছু বেশি দেওয়া হতে পারে।

৪। অসম্পূর্ণ বাক্য—এই জাতীয় প্রশ্নের বেলায় সাধারণত শূন্যস্থান পূরণ কর, 'বাক্যটি সম্পূর্ণ কর' এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ বা বাক্য সম্পূর্ণ করতে হবে তা বিকল্প উত্তরসহ দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ চিহ্নিত করতে বলা হয়।

এর মধ্যে প্রথম প্রকার প্রশ্নই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ সমস্তদিক 'বিবেচনা করলে' সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হয়।

৩.৫.২ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ (Merits of Objective Tests)

সামগ্রিক ভাবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ অনেকগুলি। তাছাড়াও বিশেষ ধরনের প্রশ্ন, যেমন, সত্যি-মিথ্যা, যুগল বন্ধন, বহু উত্তর বিশিষ্ট ইত্যাদি, পৃথক ভাবে বিচার করলে তাদের কিছু স্বতন্ত্র গুণ লক্ষ করা যায়।

- সত্যি-মিথ্যা জাতীয় অভীক্ষায় প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্নের উপাদানগুলি বেছে নিয়ে শুদ্ধ এবং ভুল এই দুই ভাবে প্রকাশ করলেই প্রশ্নপত্র তৈরি হয়ে যায়।
- পাঠ্যাংশের যে সব বিষয় সত্যি-মিথ্যা বা ভুল-শুদ্ধ এই দ্বিমাত্রিক শ্রেণি বিভাগের উপযোগী, তাদের সব কয়টিই এই জাতীয় অভীক্ষায় ব্যবহার করা যায়।

- শিক্ষার্থীকে কোন জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। এক মাত্রিক চিন্তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট।
- যুগল বন্ধন জাতীয় প্রশ্নে এক সঙ্গে অনেক বিষয় একটি প্রশ্নে সন্নিবেশ করা যায়। ফলে প্রশ্নের দৈর্ঘ্য বড় হওয়ায় অভীক্ষা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়।
- প্রশ্ন তৈরি করা খুবই সহজ কারণ প্রশ্নের ভাষা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হয় না।
- বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষা সামগ্রিক ভাবে অন্যান্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা অপেক্ষা বেশি মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং কার্যকর।
- এই অভীক্ষা প্রত্যভিক্ষা ভিত্তিক। সুতরাং তাৎক্ষণিক স্মরণক্রিয়ার কোন ভূমিকা থাকে না।
- বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি প্রাথমিক থেকে উচ্চতর সমস্ত স্তরে পরিমাপ করা যায়।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পাঠক্রমের বেশির ভাগটাই প্রশ্ন তৈরি করায় ব্যবহার করা যায়। কারণ অভীক্ষা দীর্ঘ হলেও শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখার পরিশ্রম খুবই কম।
- সত্যি-মিথ্যা, শুদ্ধ-ভুল এই জাতীয় প্রশ্ন এবং যুগল বন্ধন জাতীয় প্রশ্ন তৈরি করা যতটা সহজ, বহু উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন ততটা সহজ নয়। কিন্তু রচনাধর্মী অভীক্ষার অস্পষ্টতা এতে থাকে না।
- সমস্ত প্রকার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মূল্যায়ন খুবই সহজ। প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে সঠিক উত্তরের তালিকা দেওয়া থাকে। সেই তালিকা অনুযায়ী ভুল বা শুদ্ধ উত্তর চিহ্নিত করে নম্বর দিতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।
- বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষায় অনুমান নির্ভর উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। বিকল্প উত্তরের (Alternative Choice) সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই এই সম্ভাবনা কমবে। অবশ্য সত্যি-মিথ্যা জাতীয় প্রশ্নে অনুমান ভিত্তিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যতটুকু অনুমান নির্ভর উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা বহু উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্নে থাকে সেটুকুও নিয়ন্ত্রণ করা যায় যদি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত নম্বর কাটার ব্যবস্থা থাকে। একে বলে অনুমানের জন্য শুদ্ধি (Corretion for guessing)।

  মনোপরিমাপ বিজ্ঞানে (Psychometry) এই উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলি অনুমান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পদগুলি (Items) মনোপরিমাপ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করে কাঠিন্যের মান অনুযায়ী সাজানো যায়। অযথা অতিরিক্ত সহজ বা কঠিন প্রশ্ন অধিক সংখ্যায় দেওয়ার প্রবণতা কমানো যায়। প্রকৃতপক্ষে পদগুলির কাঠিন্যের মান নিয়ন্ত্রিত করে প্রত্যেক পদের বিনিশ্চয় ক্ষমতা (Discriminating power) বাড়ানোর ফলেই কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতাও অনেকটা নিশ্চিত করা যায়।
- এই জাতীয় অভীক্ষা যান্ত্রিকভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে কিংবা স্টেনসিল (Stensil) পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা যায়। ফলে অল্প সময়ে অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়।

- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। দলগত আদর্শমানও নির্ণয় করা যায়। রচনাধর্মী অভীক্ষার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা অনেক বেশি।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকৃতি রচনাধর্মী অভীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেজন্য রচনাধর্মী অভীক্ষার ত্রুটিগুলি এর সাহায্যে পূরণ করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষারও কিছু কিছু ত্রুটি আছে। যার ফলে এই জাতীয় অভীক্ষা মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

৩.৫.৩ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ত্রুটি (Demerits of Objetive Tests)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

- অনেক বিষয় আছে যেগুলি সরাসরি সত্যি-মিথ্যা, হ্যাঁ-না, শুদ্ধ-ভুল এই ভাবে প্রকাশ করা যায় না। শর্ত সাপেক্ষে অথবা তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু বিষয়ে বিচার ভিন্ন হতে পারে। এই জাতীয় প্রশ্নে আপেক্ষিকতার বিচার করা সম্ভব নয়।
- দুটি মাত্র বিকল্প উত্তর হওয়ায় আন্দাজে উত্তর দিলে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। সুতরাং আনুনিক উত্তর দেওয়ার প্রবণতা কিছুতেই কমানো যায় না। বহু উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্নে এই সম্ভাবনা কম।
- সত্যি-মিথ্যা জাতীয় প্রশ্নে জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের বাইরে অন্য লক্ষ্যগুলি পরিমাপের সুযোগ বিশেষ নেই। তারমধ্যেও মূল্যায়ন, সংশ্লেষণ জাতীয় লক্ষ্যগুলির পরিমাপ করা কঠিন।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্যগুলি মুখস্থ করতেই উৎসাহ দেখা যায়। নতুন তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ বিশেষ থাকে না।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত বা স্বকীয়তা দেখানোর কোন সুযোগ নেই। প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্যে একটি উত্তরকে পরীক্ষার্থী বেছে নিতে বাধ্য। অবশ্য প্রশ্ন রচনার সময়ই নিজস্ব উত্তর দেওয়ার সুযোগ ইচ্ছপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা নির্মাণের সময় বিকল্প উত্তরগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যে প্রতিটি উত্তরেরই শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি উত্তরই সঠিক। অনেক সময়ই এই আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায় চারটি বা পাঁচটি সম্ভাবনাযুক্ত বিকল্প উত্তর পাওয়া কঠিন। তখন এক বা একাধিক দুর্বল বিকল্প উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রশ্নটির মানও খুব নিকৃষ্ট হয়ে যায়।
- কোন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাতেই ভাষার দক্ষতা, যুক্তি ও বিচারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, উত্তর সংগঠন করার ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপ করা যায় না।
- এই অভীক্ষা নির্মাণ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। সঠিক প্রশিক্ষণ ও অভ্যাস ছাড়া নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা রচনায় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

- এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন তথ্য মুখস্থ করার প্রবণতা বাড়ে। সংগঠিত সামগ্রিক জ্ঞানের বিকাশ হয় না।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার বেলায় অনুমান প্রবণতা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
- অসাধু উপায়ে উত্তর সংগ্রহ করার প্রবণতাও অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায় কারণ একটি মাত্র শব্দ, নাম বা তথ্য সহজেই জেনে নেওয়া যায়।
- গুণ ও ত্রুটির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় রচনাধর্মী অভীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার কোনটিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সেজন্য একটিকে অপরটির বিকল্প হিসাবে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিক্ষাবিদরা উভয় প্রকার অভীক্ষার মিলিত ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধারণত উচ্চ শ্রেণিগুলিতে মোট নম্বরের শতকরা কুড়ি ভাগ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে এবং বাকি আশি ভাগ রচনাধর্মী অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়। তবে এই অনুপাত অভ্রান্ত বা সর্বজনীন তা বলা যাবে না। নিম্ন শ্রেণিগুলিতে অবশ্য, তুলনামূলক ভাবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ, নিম্ন শ্রেণিতে অবগমন মূলক লক্ষ্যের প্রাধান্য কিছুটা বেশি।

৩.৫.৪ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি (Methods of construction of objective Tests)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্মাণ পদ্ধতি জটিল ও দীর্ঘ। আদর্শমান বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা নির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণার রীতি পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষা কার্যক্রম হিসাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে তাদের আয়ত্তজ্ঞান (Achievement) পরিমাপ করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা নির্মাণের পদ্ধতি খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Content Analysis)—

যে বিষয়টির মূল্যায়ন করার জন্য অভীক্ষা নির্মাণ করা হবে তার মধ্যে থেকে উপযুক্ত ধারণা (Concept), একক, ইত্যাদি চিহ্নিত করা এই পর্যায়ের কাজ। সাফল্য সূচক অভীক্ষায় এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আদর্শমান যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি একই।

প্রশ্নের কাঠামো নির্বাচন (Selection of Question format)—

কোন প্রকারের প্রশ্ন কতগুলি থাকবে তার সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা করা। যেমন, কতগুলি সত্যি-মিথ্যা বা ভুল-শুদ্ধ প্রশ্ন, কয়টি যুগল বন্ধন বা বহু উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন তা স্থির করে নিতে হয় এই পর্যায়ে।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাচন (Selection of Educational Objection)—

নির্বাচিত একক বা ধারণাগুলির জন্য কোন্ কোন্ লক্ষ্য ভিত্তিক প্রশ্ন দেওয়া হবে এবং কেন দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে স্থির করা।

প্রশ্ন রচনা (Item writing)—

নির্বাচিত প্রশ্নের কাঠামো ও লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি ধারণাকে প্রশ্ন হিসাবে প্রকাশ করা এবং ক্রমাগত পরিমার্জনার মাধ্যমে অভীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা এই পর্যায়ের কাজ। এর পর একটি ছোট দলের উপর খসড়াটি প্রয়োগ করে তার ভিত্তিতে ছোট খাট সংশোধন করা হয় এবং বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষার ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরগুলি নির্বাচন করা হয়।

পদবিশ্লেষণ (Item Analysis)—

এবার যে জনগোষ্ঠীর জন্য অভীক্ষাটি তৈরি হয়েছে তার থেকে একটি নমুনা দল উপযুক্ত পদ্ধতিতে চয়ন করে, অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের কাঠিন্যের মান (Difficulty Value), ও বিনিশ্চয় ক্ষমতা (Discriminating Power) নির্ণয় করাই এই পর্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুই সূচকের ভিত্তিতে দুর্বল প্রশ্নগুলিকে বাদ দিয়ে চূড়ান্ত অভীক্ষা তৈরি করা হয়।

আদর্শায়ন (Standardisation)—

সবশেষে আরও বড় নমুনা দলের উপর চূড়ান্ত অভীক্ষা প্রয়োগ করে তার ভিত্তিতে আদর্শমান (Norm) স্থির করা হয়। এবং উপযুক্ত কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতিতে যথার্থতা ও নির্ভর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। এই সব কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মধে দিয়ে একটি ব্যবহারযোগ্য আদর্শমান ভিত্তিক নৈর্ব্যক্তিক আয়ত্তজ্ঞান অভীক্ষার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীর পূর্ণাংগ মূল্যায়নে শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিমাপ একটি অংশমাত্র। তার অন্যান্য মানসিক সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করতে হলে যে সব মানসিক অভীক্ষা ও পরিমাপক ব্যবহার করা দরকার সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা শিক্ষকদের থাকা দরকার। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বুদ্ধি পরিমাপের কথা।

৩.৬ বুদ্ধি অভীক্ষা (Intelligence Tests)

বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য অ্যালফ্রেড বিনে (Alfred Binet) প্রথম অভীক্ষাটি ১৯০৫ সালে প্রকাশ করার পর বিগত একশত বৎসরে তার অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন যেমন হয়েছে তেমনি এই নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষার গুরুত্ব সকলেই মেনে নিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের অসংখ্য অভীক্ষা নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিক্ষার সংগে বুদ্ধির সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরেই মানুষ অনুভব করে আসছে এমনকী বুদ্ধির ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিবিভাগ করার চিন্তাও শিক্ষাবিদরা করেছেন। কিন্তু পদ্ধতি হিসাবে বিনের পূর্ববর্তী গবেষকরা এমনকি প্রথম দিক বিনে নিজেও সংবেদন-প্রত্যক্ষণ ও কিছু কিছু শরীর বৃত্তীয় (Physiological) পরিমাপের ভিত্তিতে বুদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন, বিনে-সাইমন অভীক্ষায় প্রথম প্রধানত মানসিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার যে শ্রেণিবিভাগের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তার অনেকগুলিই বুদ্ধি অভীক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাচনিক বুদ্ধি অভীক্ষা, অবাচনিক অভীক্ষা, সম্পাদনী অভীক্ষা,

একক বা দলগত অভীক্ষা, দ্রুতি বা বলভিত্তিক ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের বুদ্ধি অভীক্ষা নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বিনে-সাইমন অভীক্ষা মূলত ভাষা ভিত্তিক, একক অভীক্ষা যদিও ছোটদের জন্য কিছু কিছু সম্পাদনী কৃত্য যুক্ত আছে। প্রথম প্রকাশের পর এই অভীক্ষা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বার বার সংস্কার করে তাকে আরও উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯১৬ সালে আমেরিকান স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টারম্যান (L.M. Terman) প্রথম এই অভীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করেন। স্টার্ন (Stern) নামক মনোবিজ্ঞানী প্রথম বুদ্ধ্যাঙ্কের ধারণা প্রচলন করার পর তা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। এছাড়াও যাঁরা বুদ্ধি অভীক্ষার সংস্কার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন, গডার্ড (Goddard), হেরিং (Herring) এবং কুলম্যান (Kuhlmann)। কিন্তু পরবর্তী কালে স্ট্যানফোর্ড স্কেল সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ও ব্যবহৃত হয়। ১৯১৬ সালের পর ১৯৩৭ সালে সহযোগী মেরিল (Merrill) কে সংগে নিয়ে বিনে-সাইমন স্কেলের আবার সংস্কার করেন টারম্যান। মূল অভীক্ষার সম্পূর্ণ নাম Stanford Revision of Binet Simon Intelligence Scale, এই সময় থেকে সংক্ষেপে টারম্যান-মেরিল স্কেল নামেও পরিচিত হতে থাকে। ১৯৬০ ও ১৯৭৬ এ এই স্কেল আবার সংস্কার করা হয়।

বিনে-সাইমন স্কেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Short Description of Binet-Simon Scale)—

এই স্কেলের বিবরণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পাঠে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৭ সালের স্কেল থেকে এতে দুটি সমান্তরাল অভীক্ষা L এবং M ফর্ম নির্মিত হয়, যার কোন একটিই বুদ্ধি পরিমাপ করতে সমান কার্যকর। মোট ১২৯টি পদ (Item) এই স্কেলে দেওয়া হয়। ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থীদের ছয়মাস অন্তর পরিমাপ করার মত পদ এবং ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত এক বছর অন্তর পরিমাপ করার মত পদ নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও উন্নত সাবালক—১, ২, ৩ চিহ্নিত তিন গুচ্ছপদ রাখা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমানদের পরিমাপ করার জন্য।

যে ধরনের পপ ঐ অভীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের অভীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তার মধ্যে আছে, আকৃতি প্রত্যক্ষণ, আকার ও আকৃতির প্রভেদ, দৃষ্টি-সঞ্চালন মূলক সমন্বয়. স্মৃতি, শব্দ ব্যবহার, নির্দেশ পালন, ভাষা বোধ, বিপরীত শব্দ, গাণিতিক যুক্তি, বাচনিক সংশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান, প্রতীক বিশ্লেষণ, প্রতিরূপ গঠন, দৃষ্টি ভিত্তিক সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি। বুদ্ধির যে সব উপাদান পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে এই সব পদ নির্বাচন করা হয়েছিল, তার অন্যতম হল, দৃষ্টি প্রত্যক্ষণ ও বিশ্লেষণ। সঞ্চালন ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষণের সমন্বয়, উপস্থিত স্মৃতি। ভাষার বিকাশ, ধারণার বিকাশ, যুক্তি ও বিমূর্ততার বিকাশ, সংখ্যা সংক্রান্ত যুক্তি ইত্যাদি।

বিনে-সাইমন স্কেল ব্যক্তিনির্ভর অভীক্ষা। ভাষা ও সাধারণভাবে শিক্ষার প্রভাব খুব বেশি হওয়ার, এর ব্যবহার কিছুটা সীমিত। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতিটিও একটু জটিল। প্রথমে মূল মানসিক বয়স (Basal Mental Age) নির্ণয় করে তারপর একটি করে বয়স ভিত্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত মানসিক বয়স নির্ণয় করা হয়। মানসিক বয়স নির্ণয় করার পদ্ধতিও সবিস্তারে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে দেওয়া হয়েছে।

ওয়েক্সলারের অভীক্ষা (Wechslers Scales)—

ওয়েক্সলারের দুটি স্কেল বহুল প্রচলিত। প্রথমটি ওয়েক্সলারের শিশুদের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা (Wechsler's Intelligence Scale for children–WISC) আর দ্বিতীয়টি ওয়েক্সলারর সাবালকদের

জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা (Wechsler's Adult Intelligence-WAIS)। প্রথমটি ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপ করতে পারে আর দ্বিতীয়টি তারপর সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি পরিমাপ করে। এই অভীক্ষাগুলিতে একটি অংশে ভাষা ভিত্তিক বাচনিক পদ ও দ্বিতীয় অংশটিতে অবাচনিক পদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, WAIS-এর ভাষাভিত্তিক বাচনিক অংশে ছয় প্রকার পদ বা উপ অভীক্ষা (Subtest) আছে যথা, তথ্য, ভাষাবোধ, গণিত, সাদৃশ্য, শব্দ ভান্ডার ও সংখ্যা সারির স্মৃতি। অবাচনিক অংশে আছে পাঁচটি উপঅভীক্ষা—চিত্র সমাবেশ, চিত্র সম্পূর্ণকরণ, বস্তু সমাবেশ, ব্লক ডিজাইন ও সংখ্যার প্রতীক। এই অভীক্ষার সাহয্যে তিনটি স্তরে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয়। প্রথমে বাচনিক অংশের উপ অভীক্ষায় সঠিক উত্তরদানের ভিত্তিতে প্রতিটি উপঅভীক্ষার একটি করে স্থূল স্কোর (Raw Score) পাওয়া যায়। এদের আদর্শ স্কোরে রূপান্তরিত করে যোগ করে পাওয়া যায় মোট আদর্শ স্কোর। এবার বয়স অনুযায়ী মোট আদর্শ স্কোর থেকে পাওয়া যায় বাচনিক বুদ্ধ্যঙ্ক (Verbal Intelligence Quotient)। একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় অংশ থেকে নির্ণয় করা হয় অবাচনিক বুদ্ধ্যঙ্ক (Nonverbal I.Q.)। যারা ভাষায় দুর্বল, তাদের দ্বিতীয়টি এবং যারা ভাষায় দক্ষ কিন্তু সম্পাদনী ক্রিয়ায় ততটা পটু নয় তাদের জন্য প্রথম প্রকার বুদ্ধ্যঙ্ক সূচক হিসাবে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। আবার পূর্ণ স্কেল বুদ্ধ্যঙ্ক (Full Scale I.Q.) নির্ণয় করতে হলে দুই প্রকার আদর্শ স্কোর একত্রিত করে যে স্কোর পাওয়া যায় তার সাহায্য নিতে হয়। তিন প্রকার বুদ্ধ্যঙ্কই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়েক্সালারে স্কেলগুলিও একক ব্যক্তি নির্ভর এবং এদের প্রয়োগ কিছুটা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এর কার্যকারিতা অসাধারণ।

র‍্যাভেনের অভীক্ষা (Raven's Test)—

র‍্যাভেনের তিনটি অভীক্ষার মধ্যে প্রথমটি শিশুদের জন্য রঙীন অভীক্ষা, না ব্যাভেনের রঙীন ক্রমিক ছক যুক্ত অভীক্ষা (Ravens Coloured Progressive Matrics Test)। এই অভীক্ষার সাহায্যে ১২ বছর পর্যন্ত বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। পরবর্তী দুটি অভীক্ষা হল র‍্যাভেনের আদর্শ ছকের অভীক্ষা এবং র‍্যাভেনের উন্নত ছক যুক্ত অভীক্ষা (Raven's Standard Progressive Matrics Test এবং Ravens Advanced Progressive Matrics Test)।

এই অভীক্ষাগুলির প্রতি পাতায় একটি করে সম্পূর্ণ ছবি বা নক্সা থাকে। ছবির নীচে ছয়টি বা আটটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে যার একটি উপরের অসম্পূর্ণ ছকটিকে সম্পূর্ণ করতে পারে। অভীক্ষার্থীর কাজ সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করা এবং সঠিক উত্তরের সংখ্যাই তার স্থূল স্কোর। ব্যাভেনের অভীক্ষাগুলির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথমত এগুলি অবাচনিক এবং সময়সীমাহীন। নির্দেশ দেওয়ার সময় অভীক্ষার্থীকে বলে দেওয়া হয় সে যতখুশি সময় নিতে পারে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই অভীক্ষায় আদর্শমান হিসাবে বুধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয় না। ব্যক্তির প্রাপ্ত স্কোর কোন শতাংশ বিন্দুতে অবস্থান করে তাই আদর্শমান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও ক্যাটেলের কালচার মুক্ত বুদ্ধি অভীক্ষা, ভার্ণনের দলগত বাচনিক বুদ্ধি অভীক্ষা ইত্যাদি অসংখ্য

স্কেল আছে। যেগুলি সমস্ত দেশেই ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় নিজস্ব অভীক্ষার সংখ্যাও অনেক। বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য অনেক সম্পাদনী অভীক্ষাও প্রচলিত আছে। কোহ্ ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা (Koh Block Design Test) ডিয়ারবর্ন নির্মিত ফর্মবোর্ড অভীক্ষা (Dearborn form Board Test), সেগুইনের ফর্মবোর্ড অভীক্ষা (Seguine form Board Test), পোর্টিয়েস ধাঁধাঁর অভীক্ষা (Porteus Maze Test) ইত্যাদি এই জাতীয় অভীক্ষার উদাহরণ।

৩.৬.১ মূল্যায়নে বুদ্ধি অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Intelligence Test in Evaluation)

প্রথম থেকেই একথা স্বীকৃত সত্য যে বুদ্ধি এমন একটি সর্বজনীন, সর্বব্যাপক সাধারণ মানসিক সক্ষমতা যে শিক্ষালাভ করা বা শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কাজে এর ভূমিকা প্রধান। অনেক সময়ই সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধি ও আয়ত্তজ্ঞান (Intelligence and Achievement) অভিন্ন বলে মনে হয়। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক কতটা প্রত্যাশা করতে পারেন সে সম্বন্ধে অগ্রিম ধারণা পাওয়ার উপায় তার বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধে জানা।

আবার বুদ্ধি পরিমাপ করা থাকলে একজন শিক্ষার্থীর শিখনে অক্ষমতার কারণ নির্ণয় করার সুবিধা হয়। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধি যে স্তরে আছে তার শিখন যদি তার থেকে অনেক কম হয় তবে তাকেও এক ধরনের শিখন অক্ষমতা বলা যায়। তার কারণ অনুধাবন করা, প্রতিকার করা, সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধি পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতে পারে।

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সক্ষমতা বিকাশ কতটা সহায়তা পায় তার উপর। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি এমন একটি সক্ষমতা যা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস সবচেয়ে ভালো দিতে পারে। এই কারণেই সমস্ত শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করা এবং সেই তথ্য সংরক্ষণ করা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য বুদ্ধি পরিমাপ করা একান্ত অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের প্রতিভাবান হিসাবে জানা থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ হয়। না হলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

বুদ্ধি পরিমাপের প্রথম যুগ থেকেই অতিউৎসাহী শিক্ষকরা মনে করছিলেন যে ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি অনুযায়ী ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে নিলে (Ability Grouping) পাঠদান এবং ছাত্রদের শেখার কাজ সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন একমাত্র অতিবুদ্ধিমান ও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কম বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কোন বিশেষ বিভাজন প্রয়োজন নেই। শুধু ঐ দুই প্রকার ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য তাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা দরকার।

প্রশাসনিক দিক থেকেও বুদ্ধির পরিমাপ করা আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করা, স্কুলে প্রয়োজনীয় সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কারণ অনুধাবন করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, এ সমস্ত কিছু'র জন্যই দরকার বুদ্ধি

পরিমাপ করা। সুতরাং বুদ্ধির পরিমাপ মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

৩.৭. বিশেষ প্রবনতার অভীক্ষা (Aptitude Tests)

স্পীয়ারম্যান তাঁর বুদ্ধির দ্বিউপাদান তত্ত্বে দুই প্রকার উপাদানের কথা বলেছিলেন, সাধারণ উপাদান বা G এবং বিশেষ উপাদান বা S। পরবর্তীকালে বুদ্ধির উপাদানগুলিকে অন্যান্য তত্ত্বে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বাতিল করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ উপাদানগুলি বিশেষ সক্ষমতা বা প্রবণতা (Aptitude) হিসাবে আমাদের আচরণে প্রকাশ পায়। বুদ্ধির যে সব অভীক্ষার কথা এর আগে বলা হল তার অধিকাংশই G পরিমাপ করে। G সর্বব্যাপকভাবে আমাদের সমস্ত বৌদ্ধিক আচরণের পিছনে ক্রিয়াশীল। কিন্তু S উপাদান ও G উপাদান একত্রে মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে গুণগত পার্থক্য আছে তার কারণ ও প্রকৃতি নির্দেশ করে।

বিশেষ প্রবণতার অনেক হাতিয়ার বুদ্ধি অভীক্ষার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে। এই অভীক্ষা অনেক সময় একটি মাত্র প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য আবার কখনও কখনও এক গুচ্ছ প্রবণতা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়। প্রকৃতির দিক থেকে এদের সঙ্গে বুদ্ধি অভীক্ষার পার্থক্য সামান্যই। বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষায় পদনির্বাচন (Item Selection) একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র বা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হয়। অর্থাৎ যদি কোন অভীক্ষা সংগীতে বিশেষ প্রবণতা (Musical Aptitude) পরিমাপ করার জন্য তৈরি হয় তবে সংগীত সংক্রান্ত বিষয় ও ক্রিয়াকলাপ থেকেই পদ নির্বাচন করা হবে।

মনোবিজ্ঞানীরা নানা প্রয়োজনে বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা তৈরি করেন। যেহেতু S উপাদানের সরিক সংখ্যা জানা নেই, সেহেতু যে কোন কাজে বিশেষ সক্ষমতা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন, তার জন্যই প্রবণতার অভীক্ষা তৈরী করতে পারেন। কয়েকটি বহুল প্রচলিত প্রবণতা অভীক্ষার নাম স্টেনকুইস্ট যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষা (Stenquist Mechanical Aptitude Test), করনিক বৃত্তির প্রবণতা অভীক্ষা (Clerical Aptitude Test), বহুমুখী প্রবণতা অভীক্ষাগুচ্ছ (Differential Aptitude Test Battery), সাধারণ প্রবণতা অভীক্ষা গুচ্ছ (General Aptitude Test Battery) ইত্যাদি।

বিশেষ প্রবণতা অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Aptitude Tests)—

শিক্ষা ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত অভিন্ন পাঠক্রমের ভিত্তিতে (core curriculum) লেখাপড়া চলে ততদিন পর্যন্ত প্রবণতা অভীক্ষার প্রয়োগ কমই করা হয়। বিশেষত প্রবণতা কতটা সহজাত এবং কতটা পরিবেশ থেকে আয়ত্তকরা তা স্থির করা কঠিন। সে দিক থেকে খুব কম বয়সে প্রবণতা অভীক্ষা প্রয়োগ করা অর্থহীন, যদিও বুদ্ধি অভীক্ষা ২ বছর বয়সের পর থেকেই বুদ্ধি পরিমাপ করতে পারে। যখন ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বিশেষ পাঠক্রমে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন, প্রবণতা অভীক্ষা অনেকটা সাহায্য করতে পারে। কার কোন বিষয়ে প্রবণতা আছে (যেমন, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি) তা জানা থাকলে এবং সেই অনুযায়ী পাঠক্রম নির্বাচন করলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটা বাড়ে।

বুদ্ধি অভীক্ষার মতই প্রবণতা অভীক্ষাও নির্দেশনার কাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমাদের দেশে প্রবণতা অপেক্ষাও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, সামাজিক মর্যাদা, ভবিষ্যৎ অর্থোপার্জনের সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা বিষয় পাঠক্রম নির্বাচনে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু এরকম উদাহরণও আছে যে মেধার দরুন ডাক্তারি পাশ করেও অন্য বৃত্তিতে যাওয়া, প্রযুক্তি বিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করেও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন বৃত্তিতে আনন্দ পাওয়া বা এই ধরনের বৃত্তি পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রবণতার প্রতি সুবিচার করা।

বিদ্যালয়ের দিক থেকে, প্রবণতা সম্বন্ধে জানা থাকলে তার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন করা সম্ভব। মূল্যায়নের নথিতে প্রবণতা সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখলে তাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, নিয়োগ কর্তা ইত্যাদি সকলেই উপকৃত হতে পারেন।

৩.৮ সৃজনশীলতার অভীক্ষা (Creativity Tests)

বুদ্ধি এবং বিশেষ প্রবণতা ছাড়াও সক্ষমতার দিক থেকে মানুষের আর একটি গুণ সৃজনশীলতা। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রতিটি মানুষই সৃজনশীল। কিন্তু সৃজনশীলতার শক্তি সকলের সমান নয় বা সমস্ত ক্ষেত্রেই সকলের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় না। ১৯৫০ সালের পর থেকে মনোবিজ্ঞানীরা ধারাবাহিকভাবে সৃজনশীলতার গবেষণা করে আসছেন। তাঁরা দেখেছেন সৃজনশীলতা আর বুদ্ধি এক নয়। সৃজনশীলতার প্রকাশের জন্য কিছুটা বুদ্ধির প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু সমস্ত স্বীকৃত সৃজনশীল মানুষই অসাধারণ বুদ্ধিমান নন বা সমস্ত অসাধারণ বুদ্ধিমান মানুষই সৃজনশীল নন।

সৃজনশীলতাই সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, চারুকলা, প্রযুক্তি যেখানেই হোক সৃজনশীল মানুষরা যা পূর্বে ছিল না, যা অভিনব, যা মৌলিক এই রকম নতুন তত্ত্ব, আঙ্গিক, যন্ত্র, পদ্ধতি ইত্যাদি সৃষ্টি করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সৃজনশীলতার প্রকাশ মানুষের মধ্যে ছোট বেলা থেকেই কিছু কিছু দেখা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে পারে, আবার প্রতিকূল শিক্ষায় সৃজনশীলতা নষ্টও হতে পারে। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চ সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা, পরিবেশ ও প্রকাশ মাধ্যম তৈরি করে দেওয়া দরকার। এই কারণেই মূল্যায়নের একটি অন্যতম লক্ষ্য সৃজনশীলতার পরিমাপও চিহ্নিত করা।

অনেক স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মধ্যে শিশুদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। এই সব আচরণ প্রাথমিকভাবে সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং তারা প্রকৃতই সৃজনশীল হলে শিক্ষা ও সহায়তা পেলে তাদের সৃজনশীলতার দ্রুত উন্নতি হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানসম্মত অভীক্ষা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানীরা অনেক অভীক্ষা করতে পারে। তাঁরা সৃজনশীলতার চারটি উপাদান চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি হল—

দ্রুততা (Fluency)— একজন কত দ্রুত এবং কত বেশি নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারেন।

নমনীয়তা (Flexibility)— এই সব ধারণার একটি অপেক্ষা অপরটিতে কত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে পারেন।

বিস্তার (Elaboration)— ঐ সব ধারণাগুলি কতটা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

মৌলিকত্ব (Originality)— ঐ সব ধারণা পূর্বে সৃষ্টি হওয়া ধারণা থেকে কতটা নতুন।

সৃজনশীলতার অভীক্ষা নির্মাণে পথিকৃত J.P. Guilford, E.P. Torrance প্রমুখ। টরেন্স সৃজনী চিন্তণ অভীক্ষা (Torrance test of creative thinking) এবং মেড্‌নিক ও মেড্‌নিক দূর সহগামিতার অভীক্ষা (Mednick and Mednick Remote Association Test) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সৃজনশীলতার অভীক্ষা। ভারতে বি. কে. পাসি (B.K. Passi) ও বাকের মেহেদী (Baqner Mehdi) টরেন্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৃজনশীলতার অভীক্ষা তৈরি করেছেন। প্রতিটি অভীক্ষাতেই বাচনিক এবং অবাচনিক অংশ আছে। এবং প্রত্যেক উপ অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর উত্তর উপরোক্ত চারটি উপাদান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়। সবশেষে মোট সৃজনশীলতার স্কোর (Total Creativity Score) ব্যক্তির সৃজনশীলতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

৩.৯ ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (Personal Tests)

শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পাঠে ব্যক্তিত্বের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে ব্যক্তিত্ব মানুষের কোন একক বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের সমস্ত শারীরিক-মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রবণতার একটি সংগঠন যা একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষ থেকে পৃথক করেছে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সুসংহত পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা। একজন পরিপূর্ণ মানুষ তার বুদ্ধি, চিন্তা, যুক্তি, প্রক্ষোভ, সামাজিক বোধ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের অধিকারী যে তার সমস্ত আচরণে সেই ঐক্যের প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কতটা সফল তা শুধুমাত্র আচরণ পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক রূপটি জেনে নেওয়া। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্ব পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকাই স্বাভাবিক। শিক্ষার লক্ষ্য যদি সঠিকভাবে পূরণ হয় তবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বও বাঞ্ছিতভাবে গঠিত হবে। আবার শিক্ষা সমস্ত ব্যক্তিগত বৈষম্যকে (Individual Difference) অগ্রাহ্য করে মানুষকে কোন কাল্পনিক ছাঁচে ঢালাই করার প্রক্রিয়াও নয়। কাজেই ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি সম্বন্ধে শিক্ষককে জানতে হলে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার দুটি তাত্ত্বিক ধারা আছে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণী মতবাদ অনুসরণ করে বা ফ্রয়েড পরবর্তী অনুরূপ চিন্তাধারা অনুসরণ করে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার যে পদ্ধতি আছে তার প্রচলিত নাম প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা (Projective Test) এই ধারা অনুযায়ী মনের নির্জ্ঞান স্তরে অহম্ অদম্ ও অধিশাস্তার (Ego, Id and Superego) যে সংহতি তাই ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক সংহতির উৎস বলে মনে করা হয়। নির্জ্ঞান স্তরের প্রতিক্ষেপণ ঘটে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ জনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। সেই জন্যই এই পরিমাপ পদ্ধতিকে প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা বলা হয়।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার অপর তাত্ত্বিক ধারাটি হল সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory)। সংলক্ষণ তত্ত্বে মনে করা হয় ব্যক্তিত্ব কতকগুলি সীমিত সংখ্যক সংলক্ষণের সমন্বয়। সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির এক একটি বিশেষ

পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া প্রবণতা (Response tendency)। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই এক কিন্তু যে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য একটি সংলক্ষণকে চিহ্নিত করে সেই দুই মেরু মধ্যবর্তী যে স্থানে ব্যক্তির অবস্থান তা ব্যক্তি ভেদে আলাদা। সমস্ত মানুষকেই অন্তর্মুখিতা-বহির্মুখিতা (Introversion-Extraversion) এই সংলক্ষণের সাহায্যে বিচার করা সম্ভব কিন্তু অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা পরিমাণ সকলের এক নয়। আবার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া (আচরণ) কেমন হবে, তা নির্ভর করে সে কতটা অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী তার উপর। সংলক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার অর্থ প্রত্যেকটি সংলক্ষণ স্কেলে ব্যক্তির অবস্থানটি চিহ্নিত করে দেওয়া।

প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল Word Association Test। এই অভীক্ষায় একটি তালিকা থেকে একটি একটি করে শব্দ অভীক্ষার্থীকে পড়ে শোনানো হয়। প্রত্যেক শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে কথাটি তার মনে আসে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাই জানাতে বলা হয়। সেই সংগে প্রতিক্রিয়ার সময়টিও (Reaction time) পরিমাপ করা হয়। যে সব শব্দ ব্যক্তির নির্জ্ঞাণ গুটেষা (Complex) বা দ্বন্দ্বের (Conflict) সংগে সংশ্লিষ্ট সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া দেরিতে হয়। পরে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে শব্দগুলি বলা হয় তার বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া হয়। পরে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে শব্দগুলি বলা হয় তার বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া হয়। প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষার মধ্যে বহুবিদিত Rorschach Ink Blot Test (Herman Rorschach) ও Thematic Apperception Test (Morgan and Murray)। প্রথমটি, বিমূর্ত কালির ছাপ (মোট নয়টি কার্ড) দেখে অভীক্ষার্থী যে প্রত্যুত্তর দেয় সেগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হয় আর দ্বিতীয়টিতে (মোট ৩০টি কার্ড ও একটি সাদা কার্ড) বাছাই করা দশটি ছবি দেখে অভীক্ষার্থী যে কাহিনী তৈরি করে তার বিশ্লেষণ করা হয়। এই অভীক্ষাগুলি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করে বলে এদের সাহায্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গুণগত তথ্য পাওয়া যায়।

সংলক্ষণ তত্ত্বভিত্তিক অভীক্ষাগুলি প্রধানত আত্ম প্রতিবেদনমূলক (Self Reporting)। কারণ এই সব অভীক্ষায় কোন একটি প্রশ্ন বা বক্তব্য দেওয়া থাকলে প্রশ্নটি ব্যক্তির পক্ষে কতটা সত্যি বা বক্তব্যটি তার ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা ব্যক্তি নিজেই জানিয়ে দেন। এই জাতীয় হাতিয়ারকে ব্যক্তিত্ব উন্মোচনী (Personality Inventory) বা ব্যক্তিত্ব প্রশ্নোওরিকা (Personality Questionnaire) বল হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার নাম Cattell’s 16 Personality Factor Test, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Eysenck Personality Questionnaire ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factor) তথা সংলক্ষণের (Trait) সংখ্যা এক একটি অভীক্ষায় ভিন্ন প্রকার। বর্তমানে Digman প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মাত্র পাঁচটি সংলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী অভীক্ষাও তৈরি করেছেন।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আর যে সমস্ত পদ্ধতি আছে তার মধ্যে রেটিং স্কেল (Rating Scale) প্রধান। এখানে সরাসরি সংলক্ষণ অনুযায়ী ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিত করেন যাঁরা তাকে ঘনিষ্ট ভাবে চেনেন তাঁরা (যেমন, সহপাঠী, সহকর্মী ইত্যাদি)। একাধিক ব্যক্তির রেটিং থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ সংলক্ষণে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব ব্যাপক ও সহজসাধ্য নয়।

মূল্যায়নে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের গুরুত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষাগুলি অনেক সময়ই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বা সমস্যার প্রতিকার করার জন্য নিদানমূলক অভীক্ষা হিসাবে (Diagnostic Test) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যদি কোন বাধা থাকে বা ব্যক্তিত্বে সংহতির অভাব থাকে তবে তার প্রকৃতি নির্ণয় করে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন কোন শিক্ষার্থী যদি অতিরিক্ত উদ্বেগপ্রবণ হয় তবে তার শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ সব কিছুই ব্যাহত হয়। যদি এর প্রতিকার প্রথমেই না করা হয় তবে তার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যক্তিত্বের হাতিয়ার একাজে অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি সহায়ক।

৩.১০ আগ্রহ উন্মোচনী (Interest Inventory)

আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সর্বজন স্বীকৃত। এমন কী মনোবিজ্ঞানের প্রথম যুগেই আগ্রহের সংগে মনোযোগের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যে বিষয়ে আগ্রহ কম, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীর মনোযোগ থাকে না। আবার কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দিলে আগ্রহ জন্মানো সম্ভব নয়। যেহেতু মনোযোগ শিক্ষার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত, সেহেতু শিক্ষার্থীর আগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য মূল্যায়নের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু দৈনন্দিন পঠনপাঠনের জন্য যে ধরনের আগ্রহের কথা বলা হয়েছে, তার পরিমাপ করার কথা অবান্তর। এখানে আগ্রহ (Interest) কথাটি মানুষের একধরনের অর্জিত প্রক্ষোভমূলক সম্পর্ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে সম্পর্ক স্থায়ী ভাবে কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে এবং এই আকর্ষণ তার কাছে আনন্দদায়ক। যার খেলাধূলায় আগ্রহ আছে, সে খেলাধূলার প্রতি শুধু যে অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে তাই নয়, খেলা সংক্রান্ত সব কিছুই তার কাছে তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক।

শিক্ষার অনুভব মূলক লক্ষ্যগুলি ধাপে ধাপে পূরণ হলে বিষয়বস্তুর প্রতি যে মূল্যবোধের সংগঠন গড়ে উঠে তা একদিক থেকে দেখতে গেলে আগ্রহেরই নামান্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, আগ্রহ শিক্ষার কারণ বা শর্ত নয়, আগ্রহ উপযুক্ত শিক্ষার ফল। সুতরাং আগ্রহ পরিমাপ করার অর্থ শিক্ষার অনুভবমূলক লক্ষ্য কতটা পূরণ হয়েছে তা নির্ণয় করা। কিন্তু আগ্রহ কোন একমুখী সম্পর্ক নয়। ব্যক্তির আগ্রহ-একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকাই স্বাভাবিক। আবার একাধিক বিষয়ে আগ্রহের পরিমাণে পার্থক্য থাকাটাও স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং আগ্রহ পরিমাপ করার অর্থ একটি বিষয়ে কতটা আগ্রহ আছে তা নির্ণয় করা নয়। বরং কোন বিষয়ে কতটা আগ্রহ আছে তা স্থির করা। একাধিক ক্ষেত্রে আগ্রহের তারতম্য অনুযায়ী আগ্রহের যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আগ্রহের ধরন (Interest Pattern)।

দীর্ঘকাল ধরেই আগ্রহের ধরন পরিমাপ করার জন্য কয়েকটি হতিয়ার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে স্ট্রং বৃত্তিমূলক আগ্রহ উন্মোচনী (Strong Vocational Interest Inventory), কুডার পছন্দ নথি (Kuder Preference Record) ও থার্সটোন আগ্রহ ক্রম (Thurstone Interest Schedule) প্রধান। শিক্ষার কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করে তার পরিমাপ করার জন্য থার্সটোন আগ্রহ ক্রম সবচেয়ে উপযোগী। এই অভীক্ষা ব্যবহার করা এবং প্রাপ্ত উত্তর থেকে আগ্রহের ধরন স্থির করা বেশ সহজ। যে পদ্ধতিতে এখানে আগ্রহের ধরন নির্ণয় করা হয় তার মনোপরিমাপ বিজ্ঞানসম্মত (Psychoinetirc) নামে

যুগ্মতুলনার পদ্ধতি (Paired comparison method)। একটি বর্গাকার কাগজে ১০×১০ মোট ১০০টি ছোট বর্গাকৃতি ঘর আছে। দশটি বিষয়ের (যেমন—পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, সাহিত্য, সমাজসেবা, আধ্যাত্মিক বিষয় ইত্যাদি) উপর অনেক বৃত্তি বা সাধারণ কাজ প্রত্যেকটি বর্গাকার ঘরে একজোড়া করে দেওয়া থাকে এমনভাবে যে প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের তুলনামূলক পছন্দ চিহ্নিত করার সুযোগ পায় অভীক্ষার্থী। অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়, প্রত্যেক ঘরে মুদ্রিত কাজ দুটির মধ্যে যেটি অধিক পছন্দের তার পাশে লেখা সংখ্যাটিতে একটি গোল দাগ দিয়ে পছন্দ চিহ্নিত করে দিতে। পরে দশটি সারি এবং দশটি স্তম্ভে যতগুলি উত্তর চিহ্নিত আছে তার সংখ্যা গণনা করে, আগ্রহরে তুলনামূলক ধরন নির্ণয় করা হয়। ব্যক্তিত্ব উন্মোচনীর সাহায্যে যেমন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল (Personality Profile) অঙ্কন করে বিভিন্ন সংলক্ষণের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি থার্সটোনের অভীক্ষায় আগ্রহের একটি প্রোফাইল (Interest Profile) অঙ্কন করে আগ্রহের ধরন বিচার করা হয়।

তবে মানুষের আগ্রহ যেহেতু সম্পূর্ণ অর্জিত বৈশিষ্ট্য সেহেতু তা পরিবর্তনশীল। প্রবৃত্তিবাদীরা বলেন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ জন্মাতে পারে। যেমন—যৌন প্রবৃত্তির জন্য বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ সমস্ত মানুষের মধ্যেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেই আগ্রহও এক সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং কোন বিষয়ে একবার আগ্রহ জন্মালে তা চিরস্থায়ী হবে এমন কথা বলা যায় না। আবার আগ্রহ সৃষ্টির কোন বয়ঃসীমা নেই। যে কোন বয়সেই নতুন কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ মানুষকে নতুন বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে পারে। বর্তমান কালে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়, তা কোন স্বাভাবিক আগ্রহ নয়। সামাজিক মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, প্রচারের প্রভাব ইত্যাদি অনেক বিষয় মিলে এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। হয়ত ভবিষ্যতে অনুরূপ কারণে নতুন কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ দেখা যাবে।

এই কারণে আগ্রহ পরিমাপ করে যে চিত্র পাওয়া যায় তা শুধুমাত্রই পরিমাপ করার সময়কালীন আগ্রহের চিত্র। ফলে বর্তমানে আগ্রহ পরিমাপ করার প্রসঙ্গটি অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি হচ্ছে, নতুন কর্মক্ষেত্র ও বৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময়ই শুধুমাত্র নতুনত্বের জন্যই মানুষ এই সব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে তার আগ্রহের ধরনও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তবুও শিক্ষায় মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে স্থূলভাবে আগ্রহের ধরন নির্ণয় করার প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা পাঠক্রম নির্বাচনের জন্য নির্দেশনায় তাৎক্ষণিক আগ্রহের ধরনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১১. প্রতিন্যাস স্কেল (Attitude Scales)

প্রতিন্যাস (Attitude) হল এমন একটি শক্তিশালী অনুভবমূলক সংগঠন, যা আমাদের চার পাশের ঘটনাবলিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে বাধ্য করে, সেই অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অনুপ্রাণিত করে। (Attitude is such an affective structure within man that compees him to judge the facts around him from a positive or negative point of view, inspires to collect facts accordingly and investigates him to take all efforts to convince others)।

যদি কোন ব্যক্তির নারীস্বাধীনতার প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive Attitude) থাকে তবে তিনি নারী। স্বাধীনতা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করবেন (অর্থাৎ ঘটনাগুলিকে তিনি সঠিক, উচিত, যথার্থ এই ভাবে বিচার করবেন), ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করবেন (অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার ফলে যা কিছু ভালো ফল পাওয়া গেছে সেগুলি সংগ্রহ করে, বিপরীত ঘটনাগুলি এড়িয়ে যাবেন) এবং নারীস্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে অন্যদের কাছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবেন। বিপরীত প্রতিন্যাস বিশিষ্ট মানুষ ঠিক এর বিপরীত কাজগুলি করবেন।

প্রতিন্যাস সব সময়ই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। সে জন্য মনোবিজ্ঞানের ভাষায় "কোন কিছুর প্রতি প্রতিন্যাস" এই ভাবে বলা হয়। বিদ্যালয়ের প্রতি কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি, কোন প্রথা, নিয়ম, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রতিন্যাস সংগঠিত হতে পারে। প্রতিন্যাস আমাদের আচরণের একটি শক্তিশালী নিয়ামক। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিন্যাস অর্জিত অনুভবমূলক সংগঠন (Acquired affective disposition) হওয়ার দরুন, তা পরিবর্তনশীল। শিক্ষা আমাদের প্রতিন্যাস গঠনের অন্যতম প্রধান শক্তি। আবার শিক্ষার্থীর যে সব প্রতিন্যাস শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে তা তার ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী ভূমিকা নেয়।

প্রতিন্যাস পরিমাপক অভীক্ষাগুলি সাধারণভাবে প্রতিন্যাস স্কেল (Attitude Scale) নামে পরিচিত। যেহেতু অসংখ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের প্রতিন্যাস গঠিত হয় এবং কিছু কিছু পরিবর্তিতও হয়, সেহেতু বিশেষ কোন প্রতিনিধিত্বমূলক অভীক্ষার নাম করা অবান্তর, কারণ অসংখ্য প্রতিন্যাস স্কেল নির্মিত হয় এবং ব্যবহৃত হয়। লাইকার্ট (Likert) এবং থার্সটোন (Thurstone) স্বতন্ত্র ভাবে দুটি প্রতিন্যাস পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এখনও প্রতিন্যাস পরিমাপের জন্য ঐ দুটির যে কোন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তুলনামূলক ভাবে থার্সটোনের পদ্ধতি বেশি প্রচলিত।

প্রতিন্যাস পরিমাপের স্কেলগুলিতে যে বিষয়ের প্রতি প্রতিন্যাস মাপা হবে সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়। অর্ধেক সংখ্যক বক্তব্য ইতিবাচক, অর্ধেক নেতিবাচক (যেমন—পরিবেশ দূষণের প্রতি প্রতিন্যাস পরিমাপ করার উদ্দেশ্য এই বক্তব্যগুলি দেওয়া হল। মানুষের জীবনে গতি দরকার, তাতে একটু আধটু দূষণ হলে কিছু করার নেই—(নেতিবাচক, অবিলম্বে সপ্তাহে অন্তত দুদিন সকলে যেন গাড়ী বন্ধ রাখে সেই নির্দেশ দেওয়া উচিত—ইতিবাচক)। প্রত্যেক বক্তব্য সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার জন্য পাঁচটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয় (যেমন—সম্পূর্ণ একমত, একমত, মাঝামাঝি, একমত নই, একেবারেই একমত নই)। সমস্ত বক্তব্যগুলির সঙ্গে উত্তরদাতা কতটা একমত বা দ্বিমত, তার ভিত্তিতে যে স্কোর দেওয়া হয় সেগুলির যোগফল থেকে তার প্রতিন্যাস স্থির করা হয়। এই অভীক্ষাগুলিকে স্কেল বলার কারণ স্কোরের ভিত্তিতে ব্যক্তির প্রতিন্যাস দুই মেরুর মধ্যবর্তী যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। মূল্যায়ন প্রতিন্যাস পরিমাপও গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১১ নিদানমূলক অভীক্ষা (Diagnostic Test)

কোন রোগের বা সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করাকে নিদান (Diagnosis) বলা হয়। সমস্যার

প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই সমস্যার স্বরূপ ও কারণ জানা জরুরি প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষার্থীই অনায়াসে বিনা বাধায় শিক্ষা লাভ করতে পারে না। যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও অনেকে অকৃতকার্য হয়। অনেক ছাত্র সমস্ত বিষয়ে ভালো হলেও একটি বিষয়ে দুর্বল। কারও গণিতে দুর্বলতা, কারও পড়া (Reading) ত্রুটিপূর্ণ, কারও হাতের লেখা শিশুসুলভ সুতরাং লেখার দুর্বলতার জন্য পরীক্ষায় কম নম্বর পায়। কোন ছাত্র শুধু মাত্র তাৎক্ষণিক প্রবল আবেগ প্রবণতার জন্য ঠিক সময়ে উত্তর ভুলে যায়। এই সমস্ত ত্রুটি ও সমস্যার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করার জন্য যে সব অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় নিদানমূলক অভীক্ষা (diagnostic Test)। যেমন—পাটিগণিতের নিদানমূলক অভীক্ষা (Diagnostic Test for Arthmatic). পাঠ অক্ষমতার অভীক্ষা (Reading Disability Test), ভাষার অক্ষমতার অভীক্ষা (Language Disability Test), দর্শন, শ্রবণ, সঞ্চালনমূলক ও ত্বক প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত অভীক্ষা (Test for Visual, Auditory, Kinesthetic and Tactual Perception) ইত্যাদি।

এই ধরনের অভীক্ষা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের সাফল্য সূচক অভীক্ষা। এতে কোন আদর্শমান থাকে না। এমনকি, অন্যান্য অভীক্ষার মত অভীক্ষার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বরেরও কোন গুরুত্ব নেই। বরং নিদান মূলক অভীক্ষায় ভুল উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করলে সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যায়। নিদান মূলক অভীক্ষা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর উপর প্রয়োগ করা অপ্রয়োজনীয়। শুধুমাত্র প্রাথমিক ভাবে যাদের কোন একপ্রকার শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) আছে তাদের জন্যই এই জাতীয় অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। সমস্যার কারণ নির্ণয় করা হলে প্রয়োজনীয় সংশোধন মূলক শিক্ষণ সম্বন্ধে (Remedial Teaching) পরিকল্পনা করা, ভিন্ন পদ্ধতিতে এদের মূল্যায়ন করা, প্রয়োজনে অন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এই সব কাজে নিদান মূলক অভীক্ষার প্রয়োগ অপরিহার্য।

মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি প্রাথমিক ভাবে ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হলেও সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ, ক্রমিক উন্নয়ন ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবেও কাজ করে। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির উন্নয়নের সমষ্টি শেষ পর্যন্ত সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে। আবার সমাজের চাহিদা ও গতি প্রকৃতিও মূল্যায়ন ব্যবস্থার দিক্ নির্দেশ করে। কোন ধরনের হাতিয়ার কিভাবে মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়েও সমাজের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। যেমন,—অভিভাবকরা যদি মনে করেন শতকরা ৭০ নম্বর যথেষ্ট কম, এবং এই কম নম্বরের কারণ রচনাধর্মী পরীক্ষার হাতিয়ার, তবে ধীরে ধীরে রচনাধর্মী পরীক্ষাতেও সংস্কার সাধন করে আরও বেশি নম্বর পাওয়ার পথ সুগম করতে উদ্যোগী হয় শিক্ষার নিয়ামকরা। যদি মনে হয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা বড়বেশি পীড়নমূলক (Stressful) তবে ধাপে ধাপে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করার উদ্যোগও লক্ষ করা যায়। সুতরাং মূল্যায়ন সঙ্গে শিক্ষার সমস্ত উপাদানগুলির সম্পর্ক ও সমাজের সঙ্গে শিক্ষার যে সম্পর্ক তাকে সঠিক ও সার্থকভাবে বজায় রাখার জন্য মূল্যায়ণের হাতিয়ারগুলির ভূমিকাও অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ (Summary)

যে সব যন্ত্র, কৌশল ও পদ্ধতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে

ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় মূল্যায়নের হাতিয়ার। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি প্রধানত ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগতভাবে সেই সব তথ্য সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। আবার মূল্যায়নের মধ্যে দিয়েই মূল্যায়ন পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলির সংস্কার সাধন করা হয়। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলি এক একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করার জন্য তৈরী করা হয়। এগুলি অধিকাংশই স্থায়ী ও সর্বজনীন ব্যবহারযোগ্য। মূল্যায়নের উপযুক্ত হাতিয়ার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতা দান করে কারণ হাতিয়ারগুলি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করে থাকে।

যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে হাতয়ারি তৈরি হয়েছে সে অনুযায়ী তাদের প্রকারভেদ হয়ে থাকে। আবার পদ্ধতিগত দিক থেকে হাতিয়ারগুলি অভীক্ষা, উন্মোচনী, স্কেল, প্রশ্নোত্তরিকা ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত হয়। আয়ত্তজ্ঞান পরিমাপ করার জন্য দুই প্রকার অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়—রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক। এদের মধ্যবর্তী এক প্রকার অভীক্ষার নাম সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষা। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রধানত স্মরণক্রিয়াভিত্তিক ও প্রত্যাভিজ্ঞাভিত্তিক এই দুই প্রকার হয়। প্রয়োগ বিধি অনুযায়ী একজনের উপর প্রয়োগ করার উপযোগী অভীক্ষাকে একক অভীক্ষা এবং একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করার উপযোগী হাতিয়ারকে দলগত অভীক্ষা বলে।

অভীক্ষায় করণীয় কাজের ভিত্তিতে ভাষা ভিত্তিক, অবাচনিক, সম্পাদনী ও ভাষা রহিত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অভীক্ষা নির্মিত হয়। যারা ভাষায় দুর্বল তাদের জন্য সম্পাদনী অভীক্ষা উপযোগী। সময় সীমার ভিত্তিতে যে সব অভীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয় তাদের বলা হয় দ্রুতি অভীক্ষা আর যেসব ক্ষেত্রে পদগুলির কাঠিন্যের মান অনুযায়ী সমাধান করতে হয়, কোন সময় সীমা থাকে না তাদের বলা হয় বলভিত্তিক অভীক্ষা।

গবেষণার হাতিয়ারের মত মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলিও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য যথার্থ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে তৈরি করা হয়। কোন পদ্ধতিতে উত্তম হাতিয়ারের এই সব বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের হাতিয়ার এবং কোন্ বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হবে তার উপর।

শুধুমাত্র একক শিক্ষার্থীর সাফল্য-অসাফল্য নির্ণয় করার জন্য যে ধরনের অভীক্ষা তৈরি করা হয় তাকে বলে সাফল্য সূচক অভীক্ষা। এতে ব্যক্তির সাফল্যকে দলগত সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করা হয় না। পাঠক্রমের একটি ছোট অংশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সাফল্য কতখানি সেটুকুই শুধু এই জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। ক্লাসের পঠন পাঠনের সময় বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময় এই জাতীয় অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় কারণ, কোন সামগ্রিক মূল্যায়ন করা এর উদ্দেশ্য নয়। সাফল্য সূচক অভীক্ষার রচনা পদ্ধতি সরল নয়। এর চারটি ধাপ হল, অভীক্ষার লক্ষ্যস্থির করা, অভীক্ষার প্রশ্ন বা পদ রচনা, নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ণয় এবং সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণ করা।

যখন অভীক্ষার উদ্দেশ্য একক ব্যক্তির সাফল্যকে দলগত মানের সঙ্গে তুলনা করা, তখন সেই অভীক্ষাকে বলা হয় আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা। মূল্যায়নে ব্যবহৃত অধিকাংশ অভীক্ষাই নীতিগতভাবে আদর্শমান ভিত্তিক। আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা দলের মধ্যে ব্যক্তির ক্রমিক অবস্থান নির্দেশ করে। শতাংশবিন্দু, আদর্শস্কোর, গ্রেড তুল্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আদর্শমানের ভিত্তিতে অভীক্ষায় প্রাপ্ত ব্যক্তির স্কোরকে বিচার করা

হয়। আদর্শমানভিত্তিক অভীক্ষায় নির্মাণ কৌশল অনেক জটিল কিন্তু এর নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশী। আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা দীর্ঘকাল একই জনগোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ করা যায়।

শিক্ষায় মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় রচনাধর্মী অভীক্ষা দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই জাতীয় অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে একটি ছোট নিবন্ধ আকারে উত্তর লিখতে বলা হয়। রচনাধর্মী অভীক্ষায় শিক্ষার্থী নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ, তথ্য সমাবেশ, ভাষার বিন্যাস, উপস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা পায়। শিক্ষার্থীর এই সব গুণ অন্যকোন অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু এই অভীক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিক, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য নয়। অনেক সময়ই উত্তর মুখস্থ করার দরুন প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। বিশেষ করে পাঠক্রমের কম অংশই মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে প্রশ্নপত্র রচনা করার সময় এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময় বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ নিলে রচনাধর্মী অভীক্ষার অনেকটা উন্নতি করা সম্ভব।

রচনাধর্মী অভীক্ষার যেগুলি ত্রুটি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় সেগুলি সংশোধন করা যায়। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় একটি মাত্র নির্ভুল উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন রচনা করা হয়। ফলে ব্যক্তিগত প্রভাব মূল্যায়নের উপর পরে না। অল্প সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর করা যায় এবং সেজন্য পাঠক্রমের অনেকটা অংশ মূল্যায়ন করা যায়। হ্যাঁ-না, ঠিক-ভুল, ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্ন, বহু উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন, যুগল বন্ধন ইত্যাদি নানা রকমের নৈর্ব্যক্তিক পদ অভীক্ষায় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই অভীক্ষাও ত্রুটিমুক্ত নয়। রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণগুলি এতে নেই। টুকরো টুকরো বিষয় মুখস্থ করার প্রবণতা বাড়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিকতা বোধ হয় না। তা ছাড়াও অনুমান নির্ভর উত্তর ও অসাধুতার সম্বনা সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না।

অন্যান্য হাতিয়ারের মধ্যে বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, সৃজনশীলতার অভীক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহ উন্মোচনী, নিদানমূলক অভীক্ষা ও প্রতিন্যাস স্কেল প্রভৃতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষেপে উত্তর লিখুন Short Answer Questions :

১। মূল্যায়নের জন্য তিনটি উত্তম হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২। সাফল্য-সূচক অভীক্ষা কী?

৩। সাফল্য-সূচক অভীক্ষা এবং আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৪। রচনাধর্মী অভীক্ষার দুটি ত্রুটি উল্লেখ করুন।

৫। বহু উত্তর বিশিষ্ট অভীক্ষা কী?

৬। সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষার কয়েকটি নাম করুন।

৭। বিশেষ প্রবণতা অভীক্ষা কী?

৮। আগ্রহ কী?

৯। নিদানমূলক অভীক্ষা কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

১০। পরিমাপ প্রতিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনাধর্মী প্রশ্ন Essay Questions :–

১। মূল্যায়নের হাতিয়ার কত প্রকারের? বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। সাফল্য-সূচক অভীক্ষার ব্যবহার এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। কি ভাবে সাফল্য-সূচক অভীক্ষা তৈরী করা হয়।

৩। আদর্শমান কী? আদর্শমান অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? আদর্শমান অভীক্ষার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৪। রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণ এবং দোষগুলি আলোচনা করুন। কিভাবে সাধারণ রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতি ঘটাবেন?

৫। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলতে কী বোঝেন? নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রকারভেদ করুন।

৬। রচনাধর্মী অভীক্ষা এবং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ ও দোষগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭। মূল্যায়ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন। কয়েকটি বুদ্ধি অভীক্ষার বিস্তৃত বর্ণনা দিন।

একক ৪ ❐ মূল্যায়নে নূতন ধারার উদ্ভব (Emerging New Trends in Evaluation)

গঠন (Structure)

সূচনা
উদ্দেশ্য
৪.১ গতানুগতিক পরীক্ষা
৪.১.১ গতানুগতিক পরীক্ষার প্রকারভেদ
৪.১.১.১ লিখিত পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা
৪.১.১.২ মৌখিক পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা
৪.১.১.৩ ব্যবহারিক পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা
৪.১.২ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি
৪.২ প্রশ্ন ভাণ্ডার
৪.২.১ প্রশ্ন ভাণ্ডারের ধারণা
৪.২.২ প্রশ্ন ভাণ্ডারের সুবিধা
৪.২.৩ প্রশ্ন ভাণ্ডারের অসুবিধা
৪.২.৪ প্রশ্ন ভাণ্ডার সৃষ্টি
৪.৩ গ্রেডিং প্রথা
৪.৩.১ গ্রেডিং প্রথার ধারণা
৪.৩.২ গ্রেডিং পদ্ধতি
৪.৩.৩ গ্রেডিং প্রথার সুবিধা
৪.৩.৪ গ্রেডিং প্রথার অসুবিধা
৪.৪ যান্মাসিক পদ্ধতি প্রথা
৪.৪.১ যান্মাসিক পদ্ধতি প্রথার ধারণা
৪.৪.২ যান্মাসিক পদ্ধতি প্রথার সুবিধা
৪.৪.৩ যান্মসিক পদ্ধতি প্রথার অসুবিধা
৪.৫ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন
৪.৫.১ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ধারণা
৪.৫.২ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সুবিধা
৪.৫.৩ ধারাবহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের অসুবিধা
৪.৬ মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার
৪.৭ সার সংক্ষেপ
৪.৮ অনুশীলনী

সূচনা (Introduction)

ছাত্রছাত্রীদের এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মুল্যায়নের একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে পরীক্ষা। পরীক্ষার আয়োজন, পরিচালনা, পরীক্ষার প্রস্তুতি, পরীক্ষাগ্রহণ, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ এই সব কর্মকাণ্ড ঘিরে নানা আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক বিবাদ, প্রতিবছরই ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গলদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর এই সব ত্রুটিবিচ্যুতির সংস্কার করতে গিয়ে পরীক্ষার সংগঠক ও পরিচালকরা ব্যতিব্যস্ত। রচনাধর্মী অভীক্ষার ত্রুটিগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার বীজ নিহিত আছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যেই।

বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরেই প্রচলিত পরীক্ষার সংস্কার করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু নতুন চিন্তাধারা, নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে শিক্ষাবিদরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। নতুন পদ্ধতিগুলি প্রচলিত ধারণার বাইরে থাকায় সাধারণভাবে এগুলি গ্রহণ করা ও তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করায় অনেক অনীহা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সব পদ্ধতি অনেকটা ব্যাপকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন সংক্রান্ত পাঠে এই নূতন পদ্ধতিগুলি না জানলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই নতুন পদ্ধতিগুলিকেই একযোগে মূল্যায়নে নূতন ধারা (New Trends in Evaluation) বলা হচ্ছে। এদের মধ্যে আছে গ্রেডিং প্রথা, প্রশ্নভাণ্ডার এবং ষান্মাসিক পাঠক্রম। এছাড়াও প্রথাগত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার অনেকটা সংস্কার করা সম্ভব হয় যদি মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। বর্তমান এককটিতে এই ধারাগুলি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- গতানুগতিক পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকার ও তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলি বলতে পারবেন।
- বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রশ্নভাণ্ডারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং এর সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন।
- গ্রেডিং প্রথার সংজ্ঞা ও গ্রেড দেওয়ার পদ্ধতি লিখতে পারবেন। এই প্রথার সুবিধা অসুবিধা বলতে পারবেন।
- ষান্মাসিক পাঠক্রম ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং তার সুবিধা অসুবিধাগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহারের যে সব সুযোগ আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

৪.১ গতানুগতিক পরীক্ষা (Conventional Examination or Tests)

বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা কার্যক্রমের শেষে যে ধরনের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, এবং যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্তজ্ঞান পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাকেই বলা হয়েছে গতানুগতিক পরীক্ষা (Conventional Examination)। একে গতানুগতিক বলার কারণ এই পরীক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো ও পদ্ধতি দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিবর্তিত এবং অনেক অসন্তোষ, বিতর্ক ও সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা যুক্ত আছেন, এমন কেউই এই ব্যবস্থা বর্জন করতে চান না। এমনকি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও চান না। তাঁরা চান এই ব্যবস্থা বজায় রেখে একে যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করতে।

গতানুগতিক পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, নির্দিষ্ট সময়ের পাঠক্রম শেষ করার পর সমস্ত ছাত্রছাত্রীর একযোগে পরীক্ষা গ্রহণ করা। কয়েকদিন সময় পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক্রম শেষ করার পর পরীক্ষার আগে মধ্যবর্তী সময়ে কিছুটা প্রস্তুতির সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়, তারপর উত্তরপত্র। গতানুগতিক পরীক্ষার কয়েকটি প্রকার ভেদ প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪.১.১ গতানুগতিক পরীক্ষার প্রকারভেদ (Types of Conventional Examination)

গতানুগতিক পরীক্ষার প্রধান তিনটি ধারা হল, লিখিত পরীক্ষা (Written Examination), মৌখিক পরীক্ষা (Oral Examination) এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Examination)।

লিখিত পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কোন মুদ্রিত বা অন্যভাবে লিখিত প্রশ্নপত্র থেকে সমস্ত প্রশ্নের বা নির্বাচিত কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। লিখিত উত্তর রচনাধর্মী, সংক্ষিপ্ত বা নৈর্ব্যক্তিক যে-কোন প্রকারের হতে পারে। এছাড়াও নিবন্ধ রচনার ভিত্তিতে কিছু কিছু লিখিত পরীক্ষা হতে পারে। কোন গবেষণা কার্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে জমা দিতে বলা হয় এবং নিবন্ধটি এক বা একাধিক পরীক্ষক পরীক্ষা করে নম্বর দেন। একে বলা হয় নিবন্ধপত্র (Dissertation Paper)। অনেক স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতে অন্যান্য পরীক্ষার অংশ হিসাবে নিবন্ধ পত্র জমা দেওয়ার প্রথা আছে। পাঠক্রমের অন্তর্বর্তীকালে এক একটি ছোট অংশের উপর আর এক ধরনের নিবন্ধ ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা আছে একে বলা হয় আংশিক সময়ের নিবন্ধ পত্র বা টার্ম পেপার (Term Paper)। টার্ম পেপার গবেষণা ভিত্তিক নয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের রচনাধর্মী অভীক্ষার গুণগুলি কাজে লাগানোর সুযোগ দেওয়া হয়। তারা নিজেদের পছন্দমত পাঠক্রম থেকে নির্বাচিত বিষয়ের উপর স্বাধীনভাবে প্রবন্ধরচনা করে জমা দিতে পারে-যা পরে পরীক্ষা-করা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নিবন্ধ পত্রের অন্তর্গত গবেষণা প্রশিক্ষণমূলক। অর্থাৎ গবেষণার রীতিপদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে এই নিবন্ধ রচনা করতে বলা হয়। এরচেয়ে অনেক বেশি উচ্চ পর্যায়ের নিবন্ধপত্র হল গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা থিসিস (Thesis)। যেমন, পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য যে গবেষণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে জমা দিতে হয় তার মান অন্যান্য নিবন্ধের চেয়ে অনেক উচ্চ হবে,

বলে আশা করা যায়। প্রচলিত বাৎসরিক পরীক্ষা, টার্মপেপার, নিবন্ধপত্র ও থিসিস সবই লিখিত পরীক্ষার রকমফের।

গতানুগতিক পরীক্ষার আর একটি রকমফের হল মৌখিক পরীক্ষা (Oral Examination)। এতে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী মুখোমুখি বসেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এই পরীক্ষার ধরন অনেকটা সংগঠিত সাক্ষাৎকারের (Structural Interview) মত হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাক্ষাৎকারের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। মৌখিক পরীক্ষাও খুব প্রাচীন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায়, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও পৃথিবীর বহু প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষাই ছিল প্রধান মূল্যায়ন পদ্ধতি। বর্তমান কালে মৌখিক পরীক্ষা অন্যান্য ধরনের পরীক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে প্রচলিত আছে।

তৃতীয় ধরনের পরীক্ষা হল ব্যবহারিক পরীক্ষা। পরীক্ষাগারে (Laboratory) কিংবা কর্মশালাতে (Workshop) পরীক্ষকের উপস্থিতিতে পাঠক্রমের অন্তর্গত কোনো বিশেষ পরীক্ষণ বা কৃত্য (Experiment or Task) সম্পন্ন করা এবং তার একটি বিবরণী তৈরী করা হলে পরীক্ষকরা তার দক্ষতা, জ্ঞান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিচারে মূল্যায়ন করেন। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়, সংগীত, চিত্রকলা, বৃত্তিমূলক পাঠক্রম, শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম বা অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা মূল্যায়নের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। ব্যবহারিক পরীক্ষার আর একটি রকমফের হল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষালাভ করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন তৈরি করা। একে বলা হয় ক্ষেত্রানুসন্ধান (Field Study) এবং প্রতিবেদনকে বলা হয় ক্ষেত্রভিত্তিক প্রতিবেদন (Field Report)। এরই আরও একটু উন্নত সংস্করণ হল প্রোজেক্ট ভিত্তিক প্রতিবেদন (Project Report)। প্রোজেক্ট ও ক্ষেত্রানুসন্ধানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ক্ষেত্রানুসন্ধান কোন বিষয় স্বাভাবিক যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরী করা আর প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই স্থির করে পরিকল্পিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রতিবেদন তৈরী করা। বিভিন্ন পাঠক্রমে এর সব কয়টিই কোন না কোন ভাবে প্রচলিত আছে যদিও সমগ্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এদের আনুপাতিক ব্যবহার খুবই কম।

৪.১.১.১ লিখিত পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Written Test)

লিখিত পরীক্ষা ও তার প্রশ্নপত্রে এত রকম বৈচিত্র্য আছে যে তাদের সব কয়টির সুবিধা ও অসুবিধা এক প্রকার নয়। মোটের ওপর যে সব সুবিধা ও অসুবিধা দেখা যায় তা উল্লেখ করা হল।

সুবিধা (Advantages)

- একসঙ্গে বহু পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একসঙ্গে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেওয়া হয়।
- পরীক্ষার আয়োজন খুব বেশি দরকার হয় না। প্রশ্নপত্র, উত্তর লেখার কাগজ এবং বসার ব্যবস্থা, প্রধান আয়োজন এইগুলিই।

- একই পরীক্ষক অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। ফলে সময় কম লাগে এবং ব্যয় কম হয়।
- প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক কারও সঙ্গেই উত্তরদাতার সাক্ষাৎ হয় না। উত্তরদাতা নিশ্চিন্ত হয়ে তার, উত্তর লিখতে পারেন। পরীক্ষকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে তার কোন ভয় নেই।
- পরীক্ষক ও উত্তরদাতা কারও ব্যক্তিগত প্রভাব থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ পরীক্ষকের পক্ষে সবসময় একক পরীক্ষার্থীর পরিচয় জানা সম্ভব হয় না।
- যারা মৌখিক ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষায় বেশি পারদর্শী তাদের পক্ষে লিখিত পরীক্ষা সুবিধাজনক।
- লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করানো যায়। এমনকি ভালো উত্তর 'নমুনা বা 'আদর্শ' হিসাবে প্রকাশ করা যায়।
- লিখিত পরীক্ষা জনপ্রিয়, ব্যাপক এবং প্রায় সর্বস্তরে ব্যবহার্য। সাধারণ মানুষের কাছে এই পরীক্ষার স্বচ্ছতা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

অসুবিধা (Disadvantages)

- যেসব ছাত্রছাত্রীর হাতের লেখা সংক্রান্ত দুর্বলতা আছে বা যারা লিখিত ভাষায় ততটা পটু নয় তারা বিষয়বস্তু জানা সত্ত্বেও পরীক্ষায় খারাপ করে।
- হাতের লেখার গুণ একটি অবান্তর বিষয় হিসাবে মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
- পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ায় উভয়েরই কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন আচরণ করার সম্ভাবনা কিছুটা থাকে।
- অসাধুতার সম্ভাবনা লিখিত পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি। মুখস্থ করে উত্তর লেখার প্রবণতাও বেশি দেখা যায় কারণ অল্প সময়ে বেশি লিখতে হলে নিজস্ব উত্তর লেখার চেষ্টা পরীক্ষার্থী নাও করতে পারে।
- দীর্ঘ সময় ধরে লেখার ক্লান্তির জন্য উত্তরগুলির মান সমান থাকে না।
- লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র সংরক্ষণ পরীক্ষার আগে এবং পরে এক বিরাট সমস্যা। প্রচুর স্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।
- শুধুমাত্র গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন দরকার হয়। প্রশ্নপত্র রচনা, ছাপা, এবং পরীক্ষা গ্রহণ এর মধ্যবর্তী সময়ে অনেক সময়ই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটে।
- পরীক্ষক অনেক উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন অথবা বড় লিখিত পরীক্ষায় অনেক পরীক্ষক ভাগ করে উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন এর ফলে মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিকতা বিঘ্নিত হয়। ফল প্রকাশেও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে।
- মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিতর্ক, অসন্তোষ, অভিযোগ লিখিত পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি।

এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও লিখিত পরীক্ষা প্রধান পরীক্ষা পদ্ধতি হিসাবে সকলের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

৪.১.১.২ মৌখিক পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Oral Test)

আগেই বলা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষা অত্যন্ত প্রাচীন। এই ধরনের পরীক্ষারও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।

সুবিধা (Advantages)

- এই পরীক্ষার আয়োজন সবচেয়ে সহজ। শুধু পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ থাকলেই মৌখিক পরীক্ষা সম্ভব। এমনকি অন্য পরীক্ষা চলাকালীনও (যেসব, ব্যবহারিক পরীক্ষা) মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব)
- সরাসরি প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর করায় অসাধুতা বা আনুমানিক উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই।
- শিক্ষার্থী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেয়ে যায়।
- শিক্ষার্থী প্রশ্ন বুঝতে না পারলে তা অন্যভাবে বলে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করেন পরীক্ষক। প্রশ্নের ভাষায় পরিবর্তন করা এবং বিকল্প প্রশ্ন করায় পরীক্ষার্থী প্রশ্নের ভাষা বুঝতে না পারার সমস্যা নেই এবং তার দরুণ বিফল হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।
- মৌখিক পরীক্ষা একটি সহৃদয় ব্যক্তিগত পরিবেশে সম্পন্ন হয়। পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক ভালো হয়।
- মৌখিক পরীক্ষা বারবার নেওয়া যায়। ফলে কোনো একটি পাঠ্যাংশ শেষ হলেই তার উপর মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সমগ্র পাঠ ক্রমেরই মূল্যায়ন করা যায়।
- সাধারণত লিখিত পরীক্ষার অনেক কম সময়ে পরীক্ষা হয় এবং ব্যয়ও অনেক কম।
- পরীক্ষার্থী তার দেওয়া উত্তরটি পরিবর্তন করে বা সংশোধন করে সঠিক উত্তর দেওয়ার দ্বিতীয়বার এমনকি তৃতীয়বার পর্যন্ত সুযোগ পেতে পারে।
- এই পরীক্ষায় সংক্ষিপ্ত ও অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর বিশিষ্ট এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়। ফলে পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কিছুটা বজায় থাকে।
- যাদের হাতের লেখা খারাপ বা মন্থর অথবা যারা লিখিত ভাষায় দক্ষ নয় তাদের পক্ষে মৌখিক পরীক্ষা খুবই ভালো।
- অবান্তর বিষয়, যেমন, বানান, খারাপ হাতের লেখা ইত্যাদি, মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেনা।

অসুবিধা (Disadvantages)

- একদিনে অনেক পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা করতে হলে পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় ক্লান্তিকর অপেক্ষা তাদের পক্ষে ক্ষতি করে।
- এরকম ক্ষেত্রে পরীক্ষক একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয় না। দুটি বা তিনটি প্রশ্ন করেই মূল্যায়ন সমাধা করতে হয়, প্রকৃত মূল্যায়ন হয়না।

- শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাব এড়ানো যায় না। শিক্ষক যদি পক্ষপাতদুষ্ট হন তবে ইচ্ছামত কাউকে সোজা বা কঠিন প্রশ্ন করতে পারেন। অবশ্য একাধিক শিক্ষক উপস্থিত থাকলে এটা নাও হতে পারে তবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত স্বভাব মৌখিক পরীক্ষার উপর যে প্রভাব ফেলে তা স্বীকৃত ঘটনা। কোন শিক্ষক স্বভাবত উদার, কেউ কঠোর আবার কারও বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষের প্রতি দুর্বলতা ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
- যাদের স্মরণ ক্রিয়া দেরীতে হয় বা উদ্বেগের জন্য যাদের স্মরণক্রিয়া ব্যহত হয় তাদের পক্ষে মৌখিক পরীক্ষা বিভীষিকা স্বরূপ। শিক্ষক যথেষ্ট সহৃদয় না হলে তাদের পক্ষে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন।
- প্রশ্নোত্তরের কোন লিখিত নথি না থাকায় কোন বিতর্ক বা বিবাদ উপস্থিত হলে তার নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কোন কারণে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার পুনরুদ্ধার করাও অসম্ভব। কারণ একই পরীক্ষার্থীকে একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা যায় না বা করলেও উভয় পরীক্ষা প্রায়ই তুলনীয় হয় না।
- যাদের বাচনিক দক্ষতার অভাব অথবা যারা স্বভাবতই অন্তর্মুখী তাদের পক্ষে লিখিত পরীক্ষা ভালো। মৌখিক পরীক্ষায় তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না।
- সমস্ত বিষয়ের সমস্ত অংশের উপর মৌখিক পরীক্ষা করা যায় না। এর ফলে মৌখিক পরীক্ষা সব সময়ই আংশিক।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে মৌখিক পরীক্ষা একক ভাবে মুল্যায়নের প্রধান পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়না। অন্য পরীক্ষার সঙ্গে আংশিকভাবে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমস্ত ব্যবহারিক পরীক্ষাতেই কিছু নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র রাখার হয়। কোন কোন পরীক্ষায় শতকরা দশ বা অনুরূপ কিছু নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকে। আবার উচ্চতর ডিগ্রির জন্য লিখিত অংশের সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে এককভাবে পরীক্ষা করা হয়, সে জন্য বিশেষ কোনো সমস্যা হয় না।

৪.১.১.৩ ব্যবহারিক পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Practical Examination)

বিজ্ঞান শিক্ষকদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার যত পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল পরীক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা। শিক্ষার্থীরা নিজের হাতে পরীক্ষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যত সহজে এবং ভালোভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রগুলি শিখতে পারে শত বক্তৃতাতেও তা সম্ভব নয়। সেজন্য সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে ব্যবহারিক পরীক্ষা পদ্ধতি একটি আবশ্যিক পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানে চিরদিন স্বীকৃত। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রচলন ছিল। ভারতীয়

চিকিৎসাবিদ্যা আয়ুর্বেদ শিক্ষাতেও ব্যবহারিক পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত ছিল, যদিও তার প্রকরণ আধুনিক ব্যবহারিক পরীক্ষার মত নয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরীক্ষকরা পরীক্ষার্থীর পরীক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষণের লিখিত বিবরণ ও মৌখিক পরীক্ষাসহ শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরীক্ষা করেন।

এই পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলিও জানা প্রয়োজন।

<u>সুবিধা</u> (Advantages)

- ব্যবহারিক পরীক্ষাকে একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা বলা চলে কারণ লিখিত, মৌখিক এবং পরীক্ষা সম্পাদন সব পদ্ধতি এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।
- এই ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার তিনটি প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক এবং ঞ্চালনমূলক লক্ষ্য পরীক্ষিত হয়।
- পরীক্ষাকর সামনে পরীক্ষা দিতে হয়। ফলে অসাধুতা ও আনুমানিক কোন কাজের সুযোগ একেবারেই নেই।
- এই পদ্ধতি যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিক ও যথার্থ। একই পরীক্ষণ সমস্ত পরীক্ষার্থীকে একইভাবে সম্পাদন করতে হয়। কাজেই এখানে ব্যক্তিগত বিচারের কোন স্থান নেই। পরীক্ষক দেখেন সঠিক পদ্ধতিতে কতটা দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন। অবশ্য ভুল পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে তার ফলাফলও ভুল হবে। তাছাড়াও ব্যবহারিক পরীক্ষায় সাধারণত একাধিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়।
- কে কোন্ পরীক্ষা করবে তা স্থির হয় লটারির মাধ্যমে। ফলে প্রশ্ন বাছাই করার কোন সুযোগ থাকে না। পরীক্ষার্থীকে সমস্ত পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।
- পরীক্ষার্থীকে মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয় না। সঠিক কাঠামো অনুযায়ী পরীক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দিলেই হয়।

<u>অসুবিধা</u> (Disadvantages)

- পরীক্ষণ শেষ করা তারপর মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত উত্তর পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় দীর্ঘ সময় লাগে না।
- পরীক্ষণাগারের সীমিত পরিসরে একসঙ্গে অল্প কয়েকজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা একবারে নেওয়া সম্ভব হয়। অনেক পরীক্ষার্থী থাকলে দীর্ঘদিন সময় লাগে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করতে।
- অনেক সময়ই ব্যবহারিক পরীক্ষায় মূল্যায়নে নম্বর দেওয়ার কোন সঠিক মানদণ্ড থাকে না। পরীক্ষকদের ধারণা ও সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে কত নম্বর দেওয়া হবে। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক হলেও ব্যবহারিক পরীক্ষা পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক নয়।
- একই পরীক্ষার জন্য একাধিক কেন্দ্র দরকার হলে আলাদা পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। এর ফলে নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকে না।
- ব্যবহারিক পরীক্ষায় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরা যে সব পরীক্ষণ শিখেছে সরাসরি তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন

করা হয়। পরীক্ষণের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে তাদের প্রকৃত জ্ঞান পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এর ফলে সঞ্চালনমূলক ক্রিয়ার পরীক্ষা যতটা হয় প্রকৃত তাত্বিক জ্ঞানের পরীক্ষণ ততটা হয় না।

এই সব কারণে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও, মূল্যায়নের শুধুমাত্র একটি অংশ ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

৪.১.২ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি (Demerits of Existing Examination system)

লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার অসুবিধাগুলি একত্রিত করে বিচার করলে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এই সব বিষয়গুলির পাশাপাশি মোটের উপর পরীক্ষা ব্যবস্থার আরও কয়েকটি ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় রচনাধর্মী লিখিত পরীক্ষার ত্রুটি, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সমস্যা এগুলিও জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে। মূল সমস্যাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

● বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় সর্বস্তরে নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) অভাব। প্রশ্ন রচনা, পরীক্ষা কাঠামো ও পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পদ্ধতি, প্রাপ্ত নম্বরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি পরীক্ষার কোন স্তরেই নৈর্ব্যক্তিকতা নেই। নৈর্ব্যক্তিকতা না থাকার আরও কারণ সর্বস্তরে সকলের দায়িত্ববোধ সমান নয়।

● বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য (Reliable) নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা না থাকার দরুন পরীক্ষার মূল্যায়নে অসামঞ্জস্য খুবই বেশি। কোন ধারাবাহিকতা না থাকায় অথবা খুব বেশি গতানুগতিক হওয়ায় বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা একটুও নির্ভরযোগ্য নয়। এ কথা ঠিক যে একই ছাত্রদলের উপর একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা সম্ব নয়। কিন্তু খুব বাঁধাধরা প্রশ্ন প্রতিবছর বা একবছর অন্তর ব্যবহার করা হলে, হাতিয়ার হিসাবে, প্রশ্নপত্রের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় কার অসম্ভব।

● বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় যথার্থতার অভাব। মুখস্থ শক্তি, স্মৃতিশক্তি, হস্তাক্ষর, লেখার দ্রুততা, বানান, ইত্যাদি অসংখ্য গৌণ বিষয় পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত বিষয়বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধে একটা পরোক্ষ ধারণা পাওয়া যায় মাত্র, প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না।

● অনেক সময়ই পঠন-পাঠন, শিক্ষার অনুভবমূলক চরম পরিণতি কোন কিছুই প্রাধান্য পায় না। পরীক্ষাই প্রধান বিষয়, পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই যা কিছু শিক্ষা বা কার্যক্রম সবই আবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে পীড়নমূলক (Stressful)।

● শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শিখন কৌশল (Learning Style) এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যে তারা যেন শিখনের প্রকৃত কৌশলগুলি আয়ত্ত করে—যা সারাজীবন স্থায়ী হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে আরও নম্বর পাওয়া যায় তাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নম্বর বাড়ানোর কৌশল শিক্ষায় ও মূল্যায়নে মুখ্য স্থান অধিকার করে।

● নম্বরের শতকরা হার নিয়ে প্রতিযোগিতা, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় ফলাফল বিচারের শেষ কথা। নম্বরের সামান্য হেরফেরকে বড় করে দেখে ছাত্রছাত্রীদের তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে অনেক অহেতুক

বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়ে। বহু ছাত্রছাত্রী হীনমন্যতায় ভোগে এবং এর ফলে তার ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী প্রভাব পড়ে।

● প্রত্যাশামত বাছাই করা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় ভালো ফল করে। সমগ্র পাঠক্রম পড়ার প্রবণতা খুব কমে যায় এবং এর ফলে নানা প্রকার দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে পরীক্ষা ব্যবস্থায়।

● অল্প সময়ে বহু উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব কিছুনয়। এর সবটাই ইচ্ছাকৃত নয়। অর্থাৎ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শুধু যে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পীড়নমূলক তা নয়, শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষেও অনেক সময় পীড়নমূলক। এর ফলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-পরিচালকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

● বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে মূল শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা এমন ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে এবং এই ব্যবস্থার উপর ছাত্রছাত্রীরা এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে এই সমান্তরাল ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র বৈধতা পেয়ে গেছে তাই নয় কখনও কখনও মূল ব্যবস্থাকেও ছাপিয়ে গেছে। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যগুলিও এখন অবান্তর হয়ে পড়েছে।

● পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু নতুন চিন্তাধারা কার্যকর করা হয়েছে। সেগুলিই এখনকার আলোচ্য বিষয়।

৪.২ প্রশ্নভাণ্ডার (Question Bank)

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা অর্থ যেমন সময়মত কাজে লাগানো যায়, তেমনি এমন একটি ভাণ্ডার যদি থাকে যেখানে সঞ্চিত থাকবে প্রশ্ন, যা প্রয়োজনে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যাবে, তবে তাকেই বলা হয় প্রশ্নভাণ্ডার (Test Paper)। প্রশ্নভাণ্ডারের উপযোগিতার কথা বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা বলেছেন, তার ব্যবহার বিধিও ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়না। অথচ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের বিপনন দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত। যেমন, টেস্ট পেপার (Test Paper) সহায়ক পুস্তিকা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি। এর মধ্যে টেস্ট পেপার শুধু প্রশ্নপত্র, যা বিভিন্ন সময়ে বা বিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তার একত্র মুদ্রিত রূপ।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাধারণত যে শিক্ষক বিষয়টি নিয়মিত পড়ান, তার উপরই প্রশ্ন রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশ্নের ভালো মন্দ, ছাত্রছাত্রীদের উত্তর, সব কিছুই তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু কোন বোর্ড বা অন্য পরীক্ষা পরিচালকের হাতে বহু প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার দায়িত্ব থাকলে, তখন প্রশ্নপত্র রচনার জন্য নির্ধারিত কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রথমে বিষয় ভিত্তিক এক বা একাধিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা প্রশ্ন জমা দিলে, একটি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে তৈরি মডারেশন বোর্ড প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে একটি চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। এইটিই মুদ্রিত আকারে সময় মত পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য।

এই ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিহীন বলে মনে হলেও নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রশ্ন রচয়িতা, বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদল ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ করা, সকলকে সময়মত একত্রিত করা, গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি বেশ কঠিন। সমস্ত রকম চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই প্রশ্ন বিভ্রাটের কথা শোনা যায়। এই সব কারণেই প্রশ্ন ব্যাঙ্কের চিন্তাধারা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

৪.২.১ প্রশ্নভাণ্ডারের ধারণা (Concept of Question Bank)

নামের মধ্যেই প্রশ্নভাণ্ডারের ধারণাটি নিহিত আছে। কোন একটি বিষয়বস্তুর উপর যত প্রকার প্রশ্ন হওয়া সম্ভব তার একত্রিত রূপই হল প্রশ্নভাণ্ডার (Question Bank is the collection of all possible varieties of questions on a subject)। এখানে প্রশ্নের প্রকার ভেদ প্রসঙ্গাটির আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এখানে প্রশ্নের প্রকার ভেদ প্রসঙ্গাটির আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে রচনাধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরবিশিষ্ট এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে। তারও আগে শিক্ষার লক্ষ্যগুলির কথা বলা হয়েছে। প্রশ্নভাণ্ডারের সমস্ত প্রকারের প্রশ্নের কাঠামো (Format), সমস্ত লক্ষ্য পরিমাপ করার উপযোগী প্রশ্ন এবং সমস্ত স্তরের সক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত প্রশ্নের সমাহার ঘটানো হয়।

প্রশ্নভাণ্ডার স্বাভাবিকভাবেই আলাদা আলাদা পাঠক্রমকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। প্রতিটি পাঠক্রম যে স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাদের বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন এবং পাঠক্রমটির মৌলিক উদ্দেশ্য বিচার করে প্রশ্নভাণ্ডারের জন্য প্রশ্ন রচনা করা হয়। কোন একটি পাঠ্যপুস্তক, যদি সেই পাঠ্যপুস্তকটিই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু না হয় (যেমন, কোন একটি সাহিত্য সংকলন বা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির রচিত পুস্তক ইত্যাদি), অবলম্বন করে প্রশ্নভাণ্ডার গড়ে ওঠেনা। সুতরাং প্রশ্নভাণ্ডার সমস্ত রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন (A comprehensive collection of all possible questions)।

প্রশ্নভাণ্ডার কোন তাৎক্ষণিক বা সাময়িক কাজ নয়। কোন এক সময়ে একবার একটি বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন রচনা করলেই কাজ শেষ হয়না। প্রশ্নভাণ্ডার একটি ধারাবাহিক স্থায়ী প্রক্রিয়া। কারণ প্রথম প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি হওয়ার পর তা ক্রমাগত সংশোধন ও পরিমার্জন হতে থাকে। প্রয়োজনমত পুরানো প্রশ্ন বাদ যায় নতুন প্রশ্নের সংযোজন ঘটে আবার প্রশ্নের ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে।

প্রশ্নভাণ্ডার কোন এক বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাজ নয়। অল্প কিছু ব্যক্তি বা একটি বোর্ড অথবা প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হলেও ভালো প্রশ্নভাণ্ডার তৈরির জন্য বহু শিক্ষকের সহযোগিতা, অবদানও আন্তরিক প্রচেষ্টার দরকার হয়। অর্থাৎ প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করা একটি যৌথ প্রয়াস।

সবশেষে প্রশ্নভাণ্ডার একটি স্বীকৃত তথ্যভাণ্ডার হিসাবে পরিগণিত হলে, এর গুরুত্ব বজায় থাকে। যেমন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বোর্ড অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রশ্নভাণ্ডারটিকে স্বীকৃতি দিলে, যে উদ্দেশ্যে প্রশ্নভাণ্ডারটি তৈরি হয়েছে তা সিদ্ধ হয়।

প্রশ্নভাণ্ডারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করলে, এর উদ্দেশ্যগুলিও পরিষ্কার বোঝা যায়।

৪.২.২ প্রশ্নভাণ্ডারের সুবিধা (Advantages of Question Bank)

● প্রশ্নের মান অত্যন্ত ভালো হওয়ায় মূল্যায়ন অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা সম্ভব। কারণ প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলি অনেক শিক্ষকের দীর্ঘকাল ধরে পরিশ্রমের ফসল।

● পরীক্ষার্থীরা সারাবছর ধরে প্রশ্ন নিয়ে আগাম চর্চা করতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন বাছাই করতে পারেন না কারণ, প্রশ্নের সংখ্যা ও ধরন অনেক। প্রস্তুতির জন্য প্রশ্ন চর্চা করলে পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতি খুব সংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট হতে পারে।

● শিক্ষকদের পক্ষেও প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে চর্চা করার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করা এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনামাফিক শিক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

● প্রশ্নের ভাষা ও কাঠামোগত কোন গোপনীয়তা বা অস্বচ্ছতা থাকে না। শিক্ষার্থীরা অনেক সময়ই প্রশ্ন বুঝতে না পেরে ঠিকমত উত্তর লিখতে পারেনা। কিন্তু প্রশ্নগুলি হাতের কাছে থাকলে, কোথাও কোন অস্পষ্টতা আছে মনে করলে তারা শিক্ষকের কাছে তা বুঝে নিতে পারবেন।

● আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে প্রশ্ন করার অভ্যাস কম। প্রশ্নব্যাংক তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

● যেহেতু প্রশ্নভাণ্ডার একটি সম্পূর্ণ প্রশ্নের সমাহার সেহেতু এর বাইরে আর নতুন প্রশ্ন তৈরি করার সুযোগ প্রায় থাকে না। প্রশ্নকর্তা শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রশ্ন বেছে নিয়ে প্রশ্নপত্রে সন্নিবিষ্ট করলেই প্রশ্ন রচনার কাজ শেষ। সে জন্য প্রায় বিনা পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন রচনার সুযোগ পাওয়া যায় প্রশ্নভাণ্ডারের সাহায্যে।

● উত্তপত্র মূল্যায়নের সময়ে যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে দক্ষতার সঙ্গে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব কারণ প্রশ্নগুলি যেহেতু প্রশ্নভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত সেহেতু পরীক্ষকও সেগুলি নিয়ে চর্চা করার যথেষ্ট সুযোগ পান।

● প্রশ্নভাণ্ডারের জন্য একটি স্থায়ী বোর্ড বা কমিটি গঠিত হয়। সেজন্য প্রশ্ন সংক্রান্ত বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা ঐ বোর্ড বা কমিটির গোচরে আনা যায়।

৪.২.৩ প্রশ্নভাণ্ডারের অসুবিধা (Disadvantages of Question Bank)

এই সব সুবিধা সত্ত্বেও প্রশ্নভাণ্ডারের কয়েকটি অসুবিধা লক্ষ করা যায়।

● বিষয়বস্তুর বিচারে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের জন্য প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করা যায়না। বিশেষভাবে যে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ে প্রয়োগের (Application) লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়, সেখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি অসীম। যেমন, গণিত, ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রশ্নভাণ্ডারের সার্থকতা খুব একটা নেই। গণিতের কোন সূত্রের প্রয়োগের ভিত্তিতে অসংখ্য গাণিতিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্নভাণ্ডারের সীমিত সংখ্যক সমস্যা দিলেও তা কখনোই নিঃশেষ বলে গণ্য করা যাবে না। ব্যাকরণের নিয়মগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

● পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা একটি আকস্মিক অপরিচিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। তার উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতা তাকে আকস্মিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। কিন্তু প্রশ্নভাণ্ডারের মাধ্যমে সমস্ত রকম প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত থাকার দরুন পরীক্ষার্থীদের এই ধরনের সক্ষমতার কোন পরিমাপ হয় না। অথচ এই জাতীয় দক্ষতা পরবর্তী জীবনে নানা ভাবে কাজে লাগে।

● প্রশ্নভাণ্ডারের ব্যবহার সব সময় প্রকৃত উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রশ্নভণ্ডারের প্রশ্নোত্তর কোন্‌টি কোন্ বছর পরীক্ষাতে দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্বলিত পুস্তক, নকল প্রশ্নভাণ্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করায় কোন আইনগত বাধা নেই। ফলে বাজারে ঐ জাতীয় পুস্তক সহজলভ্য হলে প্রশ্নভাণ্ডারের উদ্দেশ্য প্রচণ্ডভাবে পণ্ড হতে বাধ্য।

● শুধুমাত্র প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করে মূল্যায়নের সমস্ত ত্রুটিগুলি দূর করা যায় না। অন্তর্বতীকালীন পরীক্ষা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সেগুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা এবং সর্বোপরি সমস্ত রকম সমান্তরাল ব্যবস্থার প্রভাব দূর করতে না পারলে প্রশ্নভাণ্ডার ব্যর্থ হবে।

● প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের জন্য স্থায়ী বোর্ড গঠন, কর্মশালার আয়োজন, নতুন প্রশ্নের সংযোজন, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা এক বিরাট কর্মকাণ্ড। এই কাজ একটি কঠিন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এতে সাংগঠনিক, আর্থিক এবং প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয়। একই ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল বোর্ডে থাকলে কিছুটা গতানুগতিকতা এসে যায় আবার ঘন ঘন বোর্ড পরিবর্তিত হলেও সমস্যার সৃষ্টি হয়।

● প্রশ্নভাণ্ডারের স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটিও একটি জটিল সমস্যা সেদিক থেকে শব্দভাণ্ডার সবসময়ই আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রশ্নভাণ্ডারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সর্বজনীন স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন।

৪.২.৪ প্রশ্নভাণ্ডারের সৃষ্টি (Creating Question Bank)

প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করার পদ্ধতি নির্ভর করে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর। বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে আবার একত্র বলা হল।

- প্রশ্নভাণ্ডার একটি স্থায়ী সকলের ব্যবহার্য প্রশ্নের সমাহার।
- প্রশ্নভাণ্ডার অনেক শিক্ষকের দীর্ঘকালের প্রয়াসে তৈরি হয়।
- প্রশ্নভাণ্ডার ক্রমাগত পরিমার্জিত হয়।
- প্রশ্নভাণ্ডারের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নিতে পারে।
- প্রশ্নভাণ্ডারের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষণের পরিকল্পনা নিতে পারেন।
- প্রশ্নভাণ্ডারের সাহায্যে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করা যায় অতি সহজে।
- প্রশ্নভাণ্ডার এক বা একাধিক পাঠক্রমের ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে।
- প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলি আদর্শ ও ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন।
- প্রশ্নভাণ্ডার একটি স্বীকৃতি পদ্ধতি যদিও স্বীকৃতি সর্বজনীন নাও হতে পারে।

এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে প্রশ্নভাণ্ডার সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা নিয়োগ — যে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রশ্নভাণ্ডার তৈরির উদ্যোক্তা তাঁরা প্রথমে কোন একটি পরীক্ষার জন্য একজন সাময়িক প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে কয়েকজন দক্ষ প্রশ্নকর্তাকে নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি বা বোর্ড গঠন করেন। এঁরা সারা বছর ধরে প্রশ্নের মানোন্নয়ন, সংস্কার, নতুন প্রশ্ন রচনার কাজে লিপ্ত থাকেন।

পাঠক্রম বিশ্লেষণ — তাঁরা প্রথমে পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। প্রয়োজন হলে একাধিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী তুলনামূলকভাবে বিচার করেন। এর উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট এককে ভাগ করা এবং প্রতিটি এককের সারকথা চিহ্নিত করা। এই বিশ্লেষণ যেমন পঠনপাঠনের সহায়ক তেমনি প্রশ্ন রচনার সময় কোন অংশ যেন বাদ না পড়ে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যও প্রয়োজন।

শিক্ষকদের কর্মশালা — এরপর নির্দিষ্ট বিষয় যাঁরা পড়ান তাঁদের মধ্যে থেকে যত বেশি সম্ভব শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয় এক বা একাধিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য। তাঁদের কাছে একক বিভাজনের উদ্দেশ্য, শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁরা প্রতিটি এককের জন্য যতরকম সম্ভব প্রশ্ন রচনা করেন। প্রয়োজন হলে এদের ছোট ছোট উপদলে ভাগ করে এক একটি দলের উপর পাঠ্যসূচীর এক একটি অংশের প্রশ্ন রচনার ভার দেওয়া হয়।

প্রশ্নের পরিমার্জন — এই প্রশ্নগুলি পাওয়ার পর বোর্ড প্রতিটি প্রশ্ন খুঁটিয়ে বিচার করেন। গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেন এবং এই ভাবে প্রশ্নগুলির চূড়ান্ত রূপ দেন।

প্রশ্নের সংকলন ও প্রকাশনা — চূড়ান্ত প্রশ্নগুলি শ্রেণিবিভাগ করে বিভিন্ন গুচ্ছে সংকলন করে মুদ্রিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে প্রশ্নভাণ্ডারের প্রাথমিক কাজ শেষ হল। আধুনিক যুগে প্রশ্নভাণ্ডার ওয়েবসাইটে দেওয়া যেতে পারে বা স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য কম্প্যাক্ট ডিস্ক (C.D.) আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে মুদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য এবং সকলের ব্যবহার করার উপযোগী।

প্রশ্নের পরবর্তী সংস্কার — একবার প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করে প্রকাশ করলেই প্রশ্নভাণ্ডারের কাজ শেষ হয় না। প্রতিনিয়ত নতুন প্রশ্ন সংযোজন করা বা পরীক্ষায় ব্যবহার করার পর শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশ্নের ভাষা ও ধরনের সংস্কার করা, কোন কোন প্রশ্ন বর্জন করা এই কাজগুলি ক্রমাগত চলতেই থাকে যাতে পরবর্তী সংস্করণটি আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশ্নভাণ্ডার হলে পরিবর্তন ও পরিমার্জন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

প্রকৃত পরীক্ষায় ব্যবহার — প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি হয়ে গেলে যখন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনা করাতে কোন শিক্ষককে ভার দেওয়া হয়, তিনি প্রশ্নভাণ্ডার থেকে এমনভাবে প্রশ্ন বেছে নিতে পারেন যাতে, (১) শিক্ষার লক্ষ্যগুলির যথাযথ মূল্যায়ন হয়, (২) পাঠক্রমের সমস্ত অংশ থেকে যথাসম্ভব প্রশ্ন দেওয়া হয়, (৩) ভালো, মাঝারি, দুর্বল সমস্ত রকম ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ সুযোগ পায় এবং উত্তরের দৈর্ঘ্য, প্রশ্নের কাঠামো ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়োগকর্তার নির্দেশ ঠিকমত পালিত হয়। বলা বাহুল্য প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্নের ভাষা বা মান নিয়ে কোন চিন্তা করতে হয় না এবং ভাণ্ডারে প্রশ্নের সংখ্যা অনেক হওয়ার দরুন পুনরাবৃত্তিও করতে হয় না।

৪.৩ গ্রেডিং প্রথা (Grading System)

পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার বর্তমান পদ্ধতি যে অবৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই পদ্ধতির সংস্কারসাধন করতে গিয়ে গত শতাব্দীর ৭০ দশকে গ্রেডিং প্রথার উদ্ভব। গ্রেডিং প্রথার মূল নীতি, নম্বর দেওয়ার যে নীতি তার বিপরীত। নম্বর দেওয়ার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্বজ্ঞান পরিমাপ করার জন্য কৃত্রিমভাবে অনুপাত স্কেলের ব্যবহার (প্রথম একক দ্রষ্টব্য)। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি মোট বরাদ্দ নম্বর ১০০ হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিমাণ ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ১০১ ভাগে ভাগ করা যাবে। অথবা বিপরীতক্রমে ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্ব জ্ঞান অনুযায়ী ১০১ ভাগে ভাগ করা যাবে। পরীক্ষক অনেক সময় অর্ধ নম্বর দিতেও ইতঃস্তত করেন না। তার অর্থ ১০১ এর পরেও আরও সূক্ষ্ম বিভাজন সম্ভব, যা একমাত্র অনুপাত স্কেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে কোন মানসিক পরিমাপের বেলাতেই এত সূক্ষ্ম বিভাজন করা যায় না। মানসিক পরিমাপের ক্ষেত্রে শূন্য মান যেমন অর্থহীন তেমনি প্রতিটি এককের মধ্যবর্তী মান সমান হওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ ৫০ ও ৫৫ নম্বরের মধ্যে জ্ঞানের যে পার্থক্য ৯০ ও ৯৫ এর মধ্যে এই পার্থক্য সমান হতে পারে না। এই জন্যই সম্যক বিচ্যুতিকে একক হিসাবে মানসিক পরিমাপে ব্যবহার করা গণিতের নিয়মসম্মত বলে মনে করা হয়।

এইভাবে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির পিছনে সত্যিকারের যুক্তি কিছু নেই। সবটাই শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিমত ও বিচারের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক উত্তরটি পড়ে নির্ধারিত পূর্ণমান থেকে কিছু নম্বর কেটে নিয়ে নম্বর দেন। কত নম্বর কাটা হবে বা ঠিক কি লিখলে পূর্ণমানের কাছাকাছি নম্বর দেওয়া হবে তার কোন পূর্ব নির্ধারিত শর্ত নেই। এমন কি একই শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরের মূল্যায়ন করে ভিন্ন নম্বর দিতে পারেন, এরকম নজির অনেক আছে। অথচ এই নম্বরকে ঘিরেই যাবতীয় তুলনা, প্রতিযোগিতা, বিবাদ, বিতর্ক।

গাণিতিক শর্ত অনুযায়ী, যখন আলাদা আলাদা প্রশ্নের নম্বর যোগ করে মোট প্রাপ্ত নম্বরের হিসাব করা হয় তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কার প্রতিটি প্রশ্ন এক একটি স্বতন্ত্র স্কেল, তার একক সর্বনিম্ন বিন্দু ও সর্বোচ্চ বিন্দু সবই আলাদা। এরকম ক্ষেত্রে বলা হয় এদের সংকলন গুণ (Additive property) নেই। এ যেন দুটি বস্তুকে ব্রিটিশ স্কেল ও মেট্রিক স্কেলে মেপে পরিমাপ দুটি যোগ করে ফল প্রকাশ করা।

যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত পরিমাপকে আদর্শ স্কোরে (Standard Score) পরিণত করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর অর্থহীন। কিন্তু স্থূল স্কোরকে (Raw Score) কোন অবস্থাতেই আদর্শ স্কোরে রূপান্তরিত করে পরীক্ষার ফলাফল বিচার করা যাবে না, কেননা, তা বাস্তবসম্মত নয় অথচ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই সব দুর্বলতা ও ত্রুটি অনেকটাই দূর করা সম্ভব গ্রেডিং প্রথার মাধ্যমে।

৪.৩.১ গ্রেডিং প্রথার ধারণা (Concept of Grading System)

গ্রেডিং কথার অর্থ কোন কিছুর মান অনুযায়ী স্তর বিভাজন। কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ

্কিছুকে বিভাজন করা তখনই সম্ভব যখন যে গুণের ভিত্তিতে তাদের ভাগ করা হবে তার স্পষ্ট সংজ্ঞা আছে। যেমন, বিদ্যালয়গুলিকে যদি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করতে হয় তবে বিদ্যালয়ের সাফল্য, সুযোগ সুবিধা, শিক্ষকদের দক্ষতা বা অনুরূপ আরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করা যেতে পারে। স্তর বিভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি স্তরকে একটি গ্রেড চিহ্নিত করাই গ্রেডিং।

গ্রেডিং এর মূল কথা হল গুণগত বিভাজন। ফলে প্রত্যেকটি গ্রেডের একটি গুণগত বর্ণনা আছে, যেমন, অসাধারণ ভালো, খুব ভালো, দুর্বল, খারাপ, খুব খারাপ ইত্যাদি। এই গুণগত বর্ণনাগুলিকে (Quantative Description) যখন পর্যায়ক্রমে ইংরাজী বর্ণমালার এক একটি অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয় তাকেই বলা হয় গ্রেডিং। এই জন্য, A, B, C, D, E, এই অক্ষরগুলি প্রায় সর্বজনীনভাবে ভালো মন্দ বিচারের অর্থাৎ গ্রেডের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষও A গ্রেড বললে উৎকৃষ্ট বা B গ্রেড বললে তার চেয়ে কম উৎকৃষ্ট কোন কিছু বোঝেন। সেদিক থেকে নম্বরের পরেই গ্রেডিং এর গ্রহণযোগ্য তা সবচেয়ে বেশি।

সুতরাং উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রেডিং প্রথা ব্যবহার করার অর্থ হল উত্তরগুলির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার না করে, তাদের মান অনুযায়ী কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া। সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর A গ্রেড, তার চেয়ে খারাপ B গ্রেড এবং এই ভাবে পর্যায়ক্রমে C, D, E প্রভৃতি গ্রেডে ভাগ করে নেওয়াই হল গ্রেডিং। গ্রেডিং এর প্রধান উদ্দেশ্য হল উত্তরপত্র মূল্যায়নে অযৌক্তিক ব্যক্তিগত বৈষম্যকে (Individual Difference) গুরুত্ব না দিয়ে মূল্যায়নের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য আনা।

গ্রেডিং প্রথায় অবশ্য গুণগত মানের মাপকাঠি কি হবে সে প্রসঙ্গটি অগ্রাহ্য করা যায় না। A গ্রেড পাওয়ার শর্ত কি বা A গ্রেড ও B গ্রেডের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি কি তা স্থির করা না থাকলে গ্রেড দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং গ্রেডিং একটি স্বতঃসার্থক পদ্ধতি নয়। কিন্তু উপযুক্তভাবে লিখিত উত্তরের স্তর বিভাজন করলে গ্রেডিং প্রথায় অনেকটা নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন হতে পারে।

৪.৩.২ গ্রেডিং পদ্ধতি (Procedure of Grading)

সরাসরি গ্রেডিং (Direct Grading)

গ্রেডিং পদ্ধতি খুব বেশি জটিল নয় কিন্তু নম্বর দেওয়ার মত তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াও নয়। গ্রেডিং এর অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি সরাসরি গ্রেডিং (Direct Grading) এই পদ্ধতিতে পরীক্ষক একই প্রশ্নের সমস্ত পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর এক সঙ্গে পড়ে সেগুলিকে পাঁচটি বা সাতটি ভাগে ভাগ করে রাখেন। কোন উত্তর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে তা দ্বিতীয়বার পড়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। এবার সবচেয়ে ভালো উত্তরকে A তারপর B, C, D এইভাবে চিহ্নিত করা হলেই ঐ প্রশ্নের দরুন গ্রেডিং করা হল। যদি কখনও ঐগুলির মধ্যেও স্পষ্ট স্তর বিভাগ থাকে তবে এক একটি গ্রেডের উত্তরকে আবার দুইভাগে ভাগ করবে A^+, A, B^+, B, C^+, C এইভাবে গ্রেডিং করা যায়। বলাবাহুল্য A^+, A অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এই পদ্ধতিই হল সরাসরি গ্রেডিং (Direct Grading)। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র উত্তর পত্রটির

জন্য চূড়ান্ত গ্রেড স্থির করা হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার কোন গ্রেড পাওয়ার ভিত্তিতে। যে ছাত্র অধিকাংশ প্রশ্নের A গ্রেড পেয়েছে তার চূড়ান্ত গ্রেডিং A। কিন্তু এই পদ্ধতি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর এক যোগে পড়া, বার বার আলাদা শ্রেণিতে ভাগ করা খুব সহজ কাজ নয়। সেজন্য সরাসরি গ্রেডিং এর প্রচলন কম।

গ্রেড পয়েন্ট (Grade Point)

এই পদ্ধতিতে সরাসরি গ্রেডিং এর মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু প্রশ্নের পূর্ণমান (Full Marks) যাই হোক না কেন প্রথমে শূন্য থেকে শুরু করে, 6 পর্যন্ত সংখ্যার সাহায্যে এক একটি বিভাগকে চিহ্নিত করা হয়, যেমন, অসাধারণ ভালো - 6 খুব ভালো - 5, ভালো - 4 এবং এই ভাবে নিকৃষ্ট উত্তর - 0। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রেডের জন্য একটি সংখ্যা মান স্থির করে নেওয়া হয়। একেই বলে গ্রেড অর্জন করবে তার যোগফলকে মোট প্রশ্ন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে (গড় গ্রেড পয়েন্ট) ঐ গড়কে গ্রেডে রূপান্তরিত করে চূড়ান্ত গ্রেড স্থির করা হয়। এই পদ্ধতিতে সারা বছরের সমস্ত পরীক্ষার ফলাফলকে একটি গ্রেডে প্রকাশ করা যায়। কোন শিক্ষার্থী আটটি প্রশ্নের উত্তর করে যদি 5, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 6 এই গ্রেড পয়েন্টগুলি অর্জন করে থাকে তবে এদের গড় 4.5 বা 5 হল তার চূড়ান্ত গ্রেড পয়েন্ট। এখন যদি গ্রেড পয়েন্টগুলিকে গ্রেডে পরিণত করা হয়, তবে 5 পয়েন্ট হল A গ্রেডের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ঐ শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত গ্রেড A।

গ্রেড পয়েন্ট পদ্ধতিতে চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবুও গড় গ্রেড পয়েন্ট অখণ্ড না হলে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, উপরের উদাহরণে চূড়ান্ত গ্রেড পয়েন্ট ৫, প্রকৃতপক্ষে প্রায় পাঁচ। গ্রেড পয়েন্টগুলির যোগফল ৩৬ কিন্তু ৫ গড় হিসাবে ধরলে যোগফল হয় ৪০ অর্থাৎ ৪ বাড়ানো হয়েছে। কখনও কখনও চূড়ান্ত গ্রেড পয়েন্টকে অখণ্ড সংখ্যায় পরিণত করার জন্য যোগফল থেকে কিছু বাদ যেতেও পারে। এই সব কারণে বাস্তবে সরাসরি গ্রেডিং বা গ্রেড পয়েন্ট ভিত্তিক গ্রেডিং দুইয়েরই ব্যবহার কম।

নম্বরকে গ্রেডে রূপান্তকরণ (Conversion of Numbers into Grade)

গ্রেডিং এর এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে জনপ্রিয় কারণ নম্বর দেওয়ার প্রথা সকলের কাছেই বাঞ্ছিত বিষয় এবং সকলেরই বোধগম্য। এই পদ্ধতিতে সহজেই গ্রেডকে নম্বরে এবং নম্বরকে গ্রেডে পরিণত করা যায়। এই পদ্ধতিতে সরাসরি গ্রেড বা গ্রেড পয়েন্ট স্থির করা হয় না। প্রথমে গতানুগতিকভাবে পরীক্ষার খাতায় প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নম্বর দেওয়া হয়। তারপর মোট নম্বরের মান অনুযায়ী গ্রেড দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রী বা সমস্ত বিষয়ের জন্য একই ধরনের গ্রেডিং করা হয় না, কারণ তা যুক্তিসংগত নয়। কিছু কিছু বিষয়ে শতকরা একশত বা তার কাছাকাছি নম্বর পাওয়া অসম্ভব নয়, যেমন অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি। আবার অনেক বিষয়ে শতকরা আশি নম্বর পেলে তাকে অসাধারণ ভালো মনে করা হয় কারণ এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, যেমন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি।

আবার নীচু ক্লাসে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেখানে নম্বরদানের নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব কারণে, একাধিক মান অনুযায়ী নম্বরকে গ্রেডে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু যে মান নির্ভর

করেই গ্রেডিং করা হোক না কেন তা পূর্ব থেকেই স্থির করা থাকে এবং সকলের কাছেই প্রকাশ করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। নীচের সারণটি কাল্পনিক কিন্তু নীতিগতভাবে ঠিক।

বিজ্ঞান		সাহিত্য	
নম্বর (শতকরা)	গ্রেড	(নম্বর শতকরা)	গ্রেড
৯০ বা তার বেশি	O	৭০ বা তার বেশি	O
৮০-৮৯	A	৬০-৬৯	A
৭০—৭৯	B	৫০-৫৯	B
৬০—৬৯	C	৪০-৪৯	C
৫০—৫৯	D	৩০-৩৯	D
৪০-৪৯	E	২০-২৯	E
৩৯ বা তার কম	F	১৯ বা তার কম	E

(Grade point average)

গ্রেড পয়েন্টের গড় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে এখানে সেই সমস্যা নেই। কারণ মোট নম্বরকে শতকরা হিসাবে পরিণত করে তারপর পূর্বনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী চূড়ান্ত গ্রেড স্থির করে নিলে কোন হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্ন থাকে না।

ভারতবর্ষে সর্বস্তরে গ্রেডিং প্রথা প্রচলিত হয়নি। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রেডিং প্রথা ইতিপূর্বে প্রচলিত হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও এই প্রথার সূচনা হয়েছে। ব্যাপকভাবে প্রচলন না হওয়ার কারণ কিছু কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রেডিং প্রথার কিছু কিছু অসুবিধাও আছে।

৪.৩.৩ গ্রেডিং প্রথার সুবিধা (Advantages of Grading System)

গ্রেডিং প্রথার সুবিধার কথা কিছু কিছু প্রথমেই বলা হয়েছে। নম্বর ভিত্তিক মূল্যায়নের তুলনায় এই প্রথার সুবিধা অনেক। নির্দিষ্টভাবে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

● গ্রেডিং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করতে সাহায্য করে। অনেকে একই গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এককভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

● গ্রেড দেওয়ায় অভ্যস্ত হলে শিক্ষকদের পক্ষে মূল্যায়নের কাজ সহজ হয়। গ্রেডের জন্য নম্বর দেওয়া হলেও একই গ্রেডভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের নম্বরের সামান্য হেরফের হওয়া নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা থাকে না।

আদর্শমান সম্বন্ধে এককে আরও আলোচনা করা হবে। এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল শুধু এটুকু বোজানোর জন্য যে আদর্শমান ভিত্তিক যে কোন অভীক্ষায় উপরোক্ত এক বা একাধিক আদর্শমান নির্ণয় করা আবশ্যিক।

● গ্রেড বিভিন্ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের নম্বরের সামান্য হেরফের হওয়া নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা থাকে না।

● গ্রেড ভিত্তিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা অনেক সহজ। অনেক পরীক্ষাতেই পরীক্ষার গ্রেড ভিত্তিক ফলাফল ও শংসাপত্র একসঙ্গো একটি পত্রে মুদ্রিত থাকে।

● গ্রেড মূল্যায়ন পদ্ধতির যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, ও নৈর্ব্যক্তিকতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। দুইজন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তাদের গ্রেড একই হতে পারে। সাধারণত গ্রেড দেওয়ার সময় গুণগত মানই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে। অবান্তর বিষয়ের জন্য নম্বরের কিছু কম বেশি হলেও, গ্রেডের কোন পরিবর্তন হয় না।

● ছাত্রছাত্রীরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দ প্রবণতা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়ার সুযোগ পায়। শুধুমাত্র বেশি নম্বর পাওয়া যাবে এই জন্যই বিষয় নির্বাচন করা থেকে তারা বিরত থাকে।

● ছাত্রছাত্রীদের উপর নম্বর বাড়ানোর জন্য যে পীড়ন (Strees) তার অনেকটা নিরসন হয়। শিক্ষকরাও অপেক্ষাকৃত কম চাপ অনুভব করেন।

● যে সব পরীক্ষায় পাশ ফেল প্রথা আছে, সেখানে পাশ বা ফেল স্থির হয় একটি নম্বরের ভিত্তিতে। দুই একটি বিষয়ে কম নম্বর পেলেও একজন অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হয়। তখন অন্য বিষয়গুলিতে পাওয়া ভালো নম্বর কোন কাজেই আসে না। সেজন্য গ্রেডিং প্রথার অন্তিম উদ্দেশ্য পাশ বা ফেল বলে কোন বিভাজন না করা। পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেডগুলিসহ তার পাঠ সমাপ্তির শংসাপত্র দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গো কোন শিক্ষার্থী চাইলে আবার পরীক্ষা দিয়ে বিশেষ বিষয়ে যাতে গ্রেড উন্নয়ন (Grade Improvement) ঘটাতে পারে সেই সুযোগ দেওয়া হয়। এই সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলকে প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করার কোন মূল্য থাকে না।

৪.৩.৪ গ্রেডিং প্রথার অসুবিধা (Disadvantages of Grading System)

এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রেডিং প্রথার কয়েকটি সমস্যার দিকও আছে, যথা,

● যখন বহু ব্যক্তির মধ্যে থেকে মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে বেছে নিতে হয় তখন নম্বরের সামান্য পার্থক্য কাজে লাগিয়ে বাছাই করার সুবিধা হয়। এক হাজার A গ্রেড প্রাপ্ত আবেদনকারীর মধ্যে থেকে দশজনকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য বেছে নিতে হলে নম্বরের বিচার করা ছাড়া উপায় থাকে না।

● প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে প্রেষণার উৎস। সুতরাং গ্রেড নিশ্চিত শিক্ষার্থীরা আরও উন্নতি করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ না পেতে পারে।

● কয়েক শতাব্দী যাবৎ নম্বর দেওয়ার প্রথা মানুষের মানসিক গঠনের মধ্যে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে তারা গ্রেডকে নম্বরে রপান্তরিত না করে ফলাফলের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। সেজন্য অনেক পরীক্ষাতেই গ্রেডের পাশাপাশি নম্বরের মানও দেওয়ার রীতি আছে।

● শিক্ষকরা মূল্যায়নের কাজে যথেষ্ট দায়িত্বশীল না হলে গ্রেডিং প্রথার সার্থকতা থাকে না।।

ছাত্রছাত্রীরাও তাদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না। যদি A গ্রেড অর্থ ৮০ থেকে ৮৯ নম্বর পর্যন্ত হয় তবে শিক্ষার্থী বুঝতে পারেনা তার অবস্থান কোথায়। ফলে কোনো একটি বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে তার সন্দেহ থাকলে সে বুঝতে পারেনা সেঠি ভুল না শুদ্ধ হয়েছে। কারণ ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক তার গ্রেডের পরিবর্তন হচ্ছে না।

● গ্রেডের মান সর্বত্র এক প্রকার নয়। ফলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া গ্রেড অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডের সঙ্গে তুলনীয় না হতে পারে। কারণ উত্তরের মান কোনো একটি গ্রেডের উপযোগী বলে বিবেচিত হলেও অন্য শিক্ষকের কাছে তা ভিন্ন গ্রেডের উপযুক্ত মনে হতে পারে।

● গ্রেড দানের ক্ষেত্রে অসাধুতার প্রশ্ন এড়ানো যায় না। অন্তত পক্ষে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। বিশেষভাবে যে সব বিষয় ব্যক্তিগত বিচার, পছন্দ, মনন নির্ভর (যেমন, সাহিত্য, রাজনৈতিক বিষয়, সমাজনীতির প্রসঙ্গে ইত্যাদি), সে সব, ক্ষেত্রে নম্বর দানের মতই গ্রেডিং সম্পূর্ণ বা ব্যক্তিনির্ভর (Subjective) হতে পারে।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রেডিং প্রথা ক্রমশঃ আরও বেশি করে মূল্যায়ন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে।

৪.৪ ষাণ্মাসিক পদ্ধতি (Semester System)

সমস্ত বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হয়। কিন্তু ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা। প্রচলিত প্রথা, অনুযায়ী সারা বছরের জন্য নির্ধারিত পাঠ ক্রমের যতটা অংশ ছয়মাসে শেষ হয় তার ভিত্তিতে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা (Half-yearly Examination) নেওয়া হয় কিন্তু এই পরীক্ষার গুরুত্ব বাৎসরিক পরীক্ষার (Annual Examination) মত নয়। এই জন্য বছরের শেষে সমগ্র পাঠক্রমের ভিত্তিতে যে পরীক্ষা হয় তার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য অসাফল্যের বিচার করা হয়। এই প্রচলিত ব্যবস্থার অনেক সমস্যা।

প্রথম সমস্যা হল ছাত্রছাত্রীরা সারাবছর প্রস্তুতি নিলেও বৎসরান্তে পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনেকটা পাঠক্রম পড়ায় দরুন বেশ চাপের মুখে পড়ে যায়। বহু বিদ্যালয়েই বছরের শেষের দিকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুব কমে যায়।

দ্বিতীয় সমস্যা, বাৎসরিক পরীক্ষায় পাঠক্রমের সমস্ত অংশের মূল্যায়ন করা যায় না। কারণ বড় পাঠ্যসূচীর কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের উপর প্রশ্ন রচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়, ছাত্রছাত্রীরাও বাছাই করা প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ পায়।

তৃতীয় সমস্যা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করতে অনেকটা সময় লাগে।

চতুর্থ সমস্যা, অনেক সময়ই বছরের প্রথম দিকে কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে চলার পর শেষের দিকে আকস্মিকভাবে পাঠসূচী শেষ করার চেষ্টা করার দরুন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই প্রচন্ড চাপের মুখে পড়ে যান। পঠন পাঠন ভালো হয় না।

এসব ছাড়াও, যে সব পাঠক্রম দুই, তিন, বা চার বছরে শেষ হয় তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে ষান্মাসিক পাঠক্রম প্রথার সৃষ্টি হয়েছে, যা নানাদিক থেকে সুবিধাজনক।

৪.৪.১ ষাণ্মাসিক পদ্ধতির ধারণা (Concept of Semester System)

যখন প্রতি ছয় মাসের জন্য এমনভাবে একটি করে পাঠক্রম রচনা করা হয় যে ঐ পাঠক্রমগুলির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ডিগ্রি লাভ এবং পাঠক্রমগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পঠন পাঠন ও মূল্যায়ন হয় তবে তাকে বলা হয় ষাণ্মাসিক পাঠ-ক্রম [When curriculum is prepared for each of a six month period in such a way that the ultimate aim of the curricula is to get a particular degree and teaching-learning and evaluation of each curriculum is done in a a self-sufficient manner, it is called a Semester Curriculum)।

ষাণ্মাসিক পাঠক্রমের উদাহরণ দিলে সহজেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

ডিগ্রি*	পাঠক্রম শেষ করার মোট সময়	ষান্মাসিক এককের সংখ্যা
বি.এড /এম.এড	এক বৎসর	দুই
বি.এ বা বি.এস.সি	তিন বৎসর	ছয়
এম. এ.	দুই বৎসর	চার
বি.ই.	তিন বৎসর	ছয়
এম.বি.বি.এস	চার বৎসর	আট

*সারণিতে ব্যবহৃত ডিগ্রিগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই ষান্মাসিক পাঠক্রম অনুযায়ী পড়ানো হয়। বেশির ভাগই বাৎসরিক পাঠক্রম অনুসরণ করা হত। বর্তমানে ষাণ্মাসিক পদ্ধতিতে করা হয়।

এই সারণিতে এবং প্রথমে উল্লিখিত সংজ্ঞায় ষাণ্মাসিক পাঠক্রমের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাচ্ছে তা হল,

- সমগ্র পাঠক্রমকে দুই বা তার বেশি ষাণ্মাসিক এককে ভাগ করা হয়। এককের সংখ্যা পাঠক্রমের স্থায়ীত্বের উপর নির্ভরশীল।
- প্রতিটি এককের সময়সীমা ছয় মাস।
- প্রতিটি ষাণ্মাসিক এককের পাঠসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ একটি ষাণ্মাসিক এককে যা পড়ানো হবে তা আর পড়ানো হবে না এবং ছয়মাসের শেষে নির্দিষ্ট সময়ে তার মূল্যায়ন কার্যও শেষ করতে হবে।

• প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে প্রতিটি ষাণ্মাসিক পাঠসূচী শেষ করা ও পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কেউ ব্যর্থ হলে তাকে আবার ঐ পাঠ্যসূচী পড়তে হবে এবং ছয়মাস পরে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।

• ষাণ্মাসিক পদ্ধতি ব্যবস্থায় চূড়ান্ত পরীক্ষা বলে কিছু থাকে না। প্রতিটি ষাণ্মাসিক এককের ফলাফল একত্রিত করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয় এবং ডিগ্রি দেওয়া হয়।

• দ্রুত মূল্যায়নের সুবিধার্থে অধিকাংশ ষাণ্মাসিক মূল্যায়নে গ্রেডিং প্রথা ব্যবহার করা হয়।

৪.৪.২ ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথার সুবিধা (Advantages of Semester System)

ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথার অনেকগুলি সুবিধা আছে। যথা,

• শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে পাঠক্রমের সমগ্র অংশের উপর মনোযোগ দিতে হয় না। ফলে অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে অল্প কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে চর্চা করার সুযোগ পায়। তার জ্ঞানের স্থায়ীত্ব ও কার্যকারিতা এর ফলে বাড়ে।

• এই প্রথায় শিক্ষার্থীকে সারা বছর অত্যন্ত তৎপর ও উদ্যোগী থাকতে হয়। পাঠ্যসূচী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা এবং তারপরই পরবর্তী যান্মাসিক পাঠক্রমের পঠন পাঠন শুরু হওয়ায় শিক্ষার্থীর পক্ষে ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে চলা অসম্ভব। বিপরীত ক্রমে বাৎসরিক পরীক্ষা প্রথায় ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই একেবারে শেষের দিকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

• অনেক ব্যাপক বিষয় বিস্তারিতভাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, পড়ানোও যায়। কারণ পাঠক্রমের ঐ অংশের আর পুনরাবৃত্তি হবে না।

• এই ব্যবস্থায় অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হল পড়া ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেক স্বনির্ভর হবে। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করে পরীক্ষা দিতে হলে পরনির্ভর হলে চলবে না। নিজের পাঠ সংক্রান্ত মালমশলা সংগ্রহ করা, নোট তৈরি করা সবই স্বাধীনভাবে করা প্রয়োজন।

• ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করা ও শেখার প্রবণতা বাড়ে। এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় যা পরবর্তী জীবনেও যথেষ্ট কাজে লাগে।

• শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার আবহাওয়া তৈরি হয়। কারণ সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া ষাণ্মাসিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হতে পারে না।

• ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন হওয়ার দরুন, ছাত্রছাত্রীরা ক্রমাগতই তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ পায়। একটি পরীক্ষার ফল খারাপ হলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে পরবর্তী ষাণ্মাসিক কার্যায়ক্রমের প্রতিসংকেত (Feedback) হিসাবে কাজ করে।

• ছাত্রছাত্রীরা শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে ওঠে যার ফল তাদের পরবর্তী জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

৪.৪.৩ ষাণ্মাষিক পদ্ধতি প্রথার অসুবিধা (Disadvantages of Semester System)

আমাদের দেশে আই. আই. টি (Indian Institute of Technology), আই. আই. এম (Indian Institute of Management) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রথা চালু করার কতগুলি অসুবিধা আছে। অসুবিধার তালিকা নিম্নরূপ।

● প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিকাঠামো যথেষ্ট ভালো না হলে ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথা সাফল্যের সঙ্গে চালানো কঠিন। আর্থিক কারণ, দক্ষ ব্যক্তির অভাব ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ষাণ্মাসিক কার্যক্রম চালানোর উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই।

● শিক্ষক অনুপাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলে ষাণ্মাসিক কার্যক্রম চালানো যায় না। আমাদের দেশে ছাত্র সংখ্যার চাপ বেশি কারণ সংখ্যার তুলনায় প্রতিষ্ঠান কম। সেজন্য ষাণ্মাসিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা প্রায় অসম্ভব।

● বর্তমানে যে ধরণের পরীক্ষা ব্যবস্থা আছে এবং পরীক্ষার পরিচালনা ব্যবস্থা যে ধরণের পুরানো তাতে ষাণ্মাসিক কার্যক্রম চালানো সমস্যার। এই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন একটি তৎপর পরিশ্রমী, দক্ষ এবং আধুনিক পরিচালনা ব্যবস্থা।

● সর্বস্তরে নিষ্ঠা শ্রম ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার অভাব। ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগার ও তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ যথাযথ সদ্ব্যবহার করে না আবার ঐ সব পরিষেবার ব্যবস্থাও অপ্রতুল, যোগাযোগের অভাব এই সব কারণে ষাণ্মাসিক কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

● আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সারাদিন একই রুটিন অনুযায়ী কাটায়। ক্লাস করা, পাঠাগারে পড়াশোনা করা, খেলাধূলা, বিনোদন, শিক্ষকের নির্দেশনা সবই রুটিন অনুযায়ী চলে। সেজন্য ষাণ্মাসিক পদ্ধতি প্রথা এই সব প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে সফল। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা থাকে কয়েক ঘন্টা। বাকি সময় অনিয়ন্ত্রিত এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে আলাদা রকম। শিক্ষকরাও যথেষ্ট কম সময়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য সান্নিধ্য দেন। এই রকম পরিমন্ডলে পাঠক্রম প্রথা সফল হতে পারে না।

● বর্তমানে প্রচলিত বক্তৃতাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতিও ষাণ্মাসিক কার্যক্রমের বেলায় অচল। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই অনীহা।

● কোনো প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কারণে একবার ষাণ্মাসিক কার্যক্রম বিপর্যস্ত হলে তাকে আবার যথা নিয়মে ফিরিয়ে আনা ততোধিক কঠিন কাজ। এই জাতীয় বিপর্যয় আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রায় নিয়মিতভাবেই ঘটে।

এই সবই ষাণ্মাসিক কার্যক্রম চালু করার পরিপন্থী।

৪.৫ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন (Continuous Internal Assessment)

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যাঁরা ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন অথচ শিক্ষার অন্য সমতুল ব্যবস্থা সঙ্গে যুক্ত তাঁদের দিয়ে মূল্যায়ন করানোর প্রথা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থার নাম বহির্মূল্যায়ন (External Evaluation)। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা সচল রাখতে হলে শুধুমাত্রবাইরের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্যে মূল্যায়ন করানো সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন সেই শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে মূল্যায়ন করা। এইটিই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দুই প্রকার মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছিল— অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) এবং ক্রমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)। সেখানে ক্রমিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা মূল্যায়ন সংক্রান্ত একটি নীতির ব্যাখ্যা মাত্র। কোন শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়ন করা কতখানি যুক্তিযুক্ত এবং কেন, সেই প্রসঙ্গটিই ছিল আলোচনার বিষয়। অন্তিম বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হলে একবারে সমগ্র কার্যক্রমটির সাফল্য বা অসাফল্যকে নির্দেশ করে। এখানে ধারাবাহিক মূল্যায়নকে একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম হিসাবে উপস্থিত করা হবে এবং এই কার্যক্রম পূর্বোক্ত নীতিরই বাস্তবিক প্রয়োগ। সেজন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Evaluation) একটি বিকল্প মূল্যায়ন ব্যবস্থা হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। আবার যেহেতু ধারাবাহিক মূল্যায়ন সবসময়ই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর ন্যস্ত থাকে সেজন্য তা আভ্যন্তরীন বলে গণ্য হয়। এইটিই ধারাবাহিক আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন (Continuous Assesment)।

৪.৫.১ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীন মূল্যায়ণের ধারণা (Concept of Continuous Internal Assessment)

শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা কেন্দ্রিকতা দূর করার জন্য কোঠারি কমিশনের (Kothari Commission, 1964-66) গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন। যে মূল্যায়ন স্বল্প সময়ান্তরে পাঠক্রমের ক্ষুদ্রতর অংশের ভিত্তিতে পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় এবং যে মূল্যায়নের ফলাফল অন্তিম পরীক্ষার সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, তাই ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (Evaluation that is instituted regularly at smaller time interval and on a smaller part of the curriculum by the teachers involved in teaching learning and that is considered to have equal weightage with the annual examination is called Continuous Internal Evaluation')।

এমনকি শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন অন্তত প্রাথমিক স্তরে বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন শিক্ষার প্রকৃত মান বিচারে পুরোপুরি সক্ষম। তার কারণ এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত।

যে কোন বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। কোথাও অনিয়মিত, কোথাও সাপ্তাহিক বা মাসিক। সেই সঙ্গে ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষাও থাকে। এই পরীক্ষাগুলির সবটাই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন। যাঁরা পড়ান তাঁরাই পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। কিন্তু এই সব পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় প্রায়ই অগ্রাহ্য করা হয়। আভ্যন্তরীণ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আবশ্যিক শর্ত হল চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় সারাবছরের ছোট ছোট পরীক্ষাগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার সুবিধা-অসুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা খেয়াল-খুশিমত চলতে পারেনা। এই কাজ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার বিষয়। কোন পাঠক্রমের অংশ বিশেষের বিভাজন, পঠন পাঠনের এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ সেই অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ক বাৎসরিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়, কিন্তু তা প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ক ছুটি, বড় পরীক্ষা গ্রহণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের সূচী মাত্র। প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ক ক্যালেন্ডার হল উপরোক্ত পরিকল্পনা। ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিকল্পনাহীন হলে কার্যকর হয় না।

ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পঠন-পাঠন পরিচালনা। ছাত্রছাত্রীদের শিখন যতদূর সম্ভব ক্লাসের পড়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হওয়া দরকার। এর ফলে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য তাদের আর অতিরিক্ত প্রস্তুতির দরকার হবে না।

ধারবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সাফল্য সূচক অভীক্ষা (Criteria Referenced Test) ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই ধরণের অভীক্ষা ক্লাসের পঠন পাঠন নির্ভর, পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয়। পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পরীক্ষা অন্তিম মূল্যায়নের পক্ষে উপযুক্ত।

ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পরিচালক সকলেরই মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। পারস্পরিক আস্থা, তৎপর পরিচালনা, কার্যকরী পরিকল্পনা এবং সহায়ক পরিকাঠামো না থাকলে এই ব্যবস্থা সফল হওয়া কঠিন।

৪.৫.২ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of Continuous Internal Assessment)

সঠিক ভাবে কার্যকর হলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনেক সুবিধাজনক—

- সমগ্র পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচী ছোট ছোট অংশ বা এককে ভাগ করে সেই সঙ্গে সময় বিভাজন (Time Budgeting) করে নিয়ে পঠন পাঠন পরিচালিত হয়। এর ফলে সারাবছরের কার্যক্রমের মধ্যে সমতা থাকে। কখনও বেশি চাপ কখনও কম এরকম না হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক।
- ছোট ছোট অংশের উপর মূল্যায়ন হওয়ায় বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াও দ্রুত মূল্যায়ন হতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাঁদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রতিসংকেত পেয়ে পরবর্তী অংশের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

● শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক বা সহায়ক পুস্তক মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা কমে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছে ক্লাসের পড়া, উপস্থিতি, মনোযোগ দিয়ে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এতে ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও সুবিধা হয়।

● প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর শিখনের গতিপ্রকৃতি, সমস্যা বা দুর্বলতা সম্বন্ধে শিক্ষক সচেতন হতে পারেন এবং দরকার মত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

● কোন ছাত্র বা ছাত্রী অসুস্থতা বা অন্য কারণে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে না পারলেও তার সারা বছরের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল দেখে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

● ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময়ই বাৎসরিক পরীক্ষাকে একটি প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের দ্বার হিসাবে দেখা হয়। একটি স্তর শেষ করে কোনক্রমে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করাটাই পরীক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কিন্তু পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে।

● ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ও তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

● ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীরা দেখার সুযোগ পায়, কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় এই সুযোগ নেই।

৪.৫.২ ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের অসুবিধা (Disadvantages of Continuous Internal Assessment)

কোনো পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ ত্রুটি বা অসুবিধাহীন নয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নও এর ব্যতিক্রম নয়।

● উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দিয়ে বা পরিকাঠামো তৈরি না করে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন সফল হওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই।

● মানসিকভাবে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য কোনো স্তরেই প্রস্তুতি নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন চালু করেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

● পারস্পরিক আস্থা, সততা, পরিশ্রম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি সর্বস্তরেই আছে। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উত্তরপত্র ছাত্রছাত্রীরা দেখতে পারে সেহেতু সততা বা অনাস্থার প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

● ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নথি (Record) সংরক্ষণ করা সমস্যাজনক। এই সব কারণে শিক্ষককে অতিরিক্ত সময় দিতে হলে, তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উচ্চতর চর্চা ব্যাহত হতে পারে। মূল্যায়নের পিছনে অনেকটা সময় ও শ্রম ব্যয় হয়ে যায়।

● সাধারণ ও দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন তখনই ফলপ্রসু হয় যখন মূল্যায়নের পাশাপাশি সহায়ক অথবা প্রতিবিধানমূলক শিক্ষণ (Remedial Teaching) এর ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থা অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নেই।

● ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল কি অনুপাতে চূড়ান্ত মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত হবে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যদি খুব কম অংশ যুক্ত হয় তবে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আবার অনেক বেশি অংশ যুক্ত হলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খন্ড খন্ড জ্ঞানের পরীক্ষা হয় কিন্তু সমগ্রতার বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

● সমস্ত বিষয়ের প্রকৃতি এক রকম নয়, এরফলে সারাবছরে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পরিকল্পনা এক একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আলাদা। এর ফলে পরস্পর সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে এবং মূল্যায়নে বিঘ্ন হতে পারে।

৪.৬ মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computers in Evaluation)

বর্তমান পৃথিবীতে সহায়ক যন্ত্র হিসাবে কম্পিউটারের প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ও কম্পিউটার এখন অবিচ্ছেদ্য। কারণ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে, প্রত্যেক কার্যক্রমে কম্পিউটার কোনও না কোনও ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল্যায়নের মত একটি জটিল ধারাবাহিক ও বিপুল কর্মকান্ডে কম্পিউটার এখন প্রায় আশীর্বাদ স্বরূপ। মূল্যায়নের যে যে কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্ভব সেগুলি নীচে দেওয়া হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই তালিকা সম্পূর্ণ নয় কারণ প্রতিনিয়ত কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে চলেছে।

<u>মূল্যায়নের পরিকল্পনা</u> (Planning of Evaluation)

মূল্যায়ন পরিকল্পিত কার্যক্রম। কিন্তু এই কার্যক্রম সরলরেখার মত একমুখী নয়। বহুমুখী, বহুস্তর বিশিষ্ট জটিল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কোন একটিমাত্র মডেল অনুসরণ করে করা হয় না। কম্পিউটারের সাহায্যে মূল্যায়নের মডেল অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা করে এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। শুধু তাই নয়, মডেলগুলির ত্রুটি বিচ্যুতির অগ্রিম বিচার এসব ক্ষেত্রে কম্পিউটার যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। প্রয়োজনমত সফটওয়্যার (Software) তৈরিতেও কম্পিউটারের সাহায্য দরকার।

<u>মূল্যায়নের হাতিয়ার</u> (Tools of Evaluation)

মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলির মধ্যে বিভিন্ন অভীক্ষা, অন্তিম মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র, ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র ইত্যাদি রচনা করা, ছাপানো, কপি করা ইত্যাদি প্রতিটি কাজেই কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু অভীক্ষার সংরক্ষণে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার (Hardware) অপরিহার্য। যেমন, সাইমন অভীক্ষার পদগুলি সরাসরি কম্পিউটার মনিটরে দেখা, কম্পিউটার কী বোর্ডের (Key Board) সাহায্যে উত্তর করা এবং উত্তরের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বিচার করা সবই সম্ভব। এইভাবে অন্যান্য অনেক অভীক্ষাও ব্যবহার করা সম্ভব। যদি প্রশ্নভান্ডার থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হয় তবে প্রশ্নভান্ডার থেকে যথেচ্ছভাবে (Randomly) প্রশ্ন বাছাই করার জন্যও কম্পিউটার সাহায্য করতে পারে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Evaluation Process)

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়। কম্পিউটার থেকে দ্রুত যে কোন তথ্য পাওয়া সহজ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যও কম্পিউটার ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে শিক্ষণের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার কাজে লাগানো হয়, মূল্যায়নের সময়ও তা একইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষভাবে বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অসদ্ বাস্তব (Virtual Reality) সংক্রান্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যেমন, পরীক্ষাগারে যে পরীক্ষা হাতে কলমে করা যায় অসদ্ পরীক্ষণাগারে (Virtual Laboratory) অর্থাৎ কম্পিউটারে সিমিউলেশনের (Computer Simulation) সাহায্যে সেই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা ও তার পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

মুল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণ (Recording of the results of Evaluation)

মূল্যায়নের ফলে এবং তার ধারাবাহিকতার দরুন বিপুল পরিমাণ তথ্য সৃষ্টি হয়। এই তথ্য সংরক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি একক শিক্ষার্থী সম্বন্ধে তথ্য ও শ্রেণিবিভক্ত তথ্য যখনই দরকার তখনই যাতে সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এরজন্য দরকার প্রচুর স্থান, খাতাপত্র ও কিছু সংখ্যক কর্মী। কিন্তু একটিমাত্র কম্পিউটারের সাহায্যে সমস্ত তথ্য একজন মাত্র কর্মীকে দিয়ে বা শিক্ষকরা নিজেরাই সংরক্ষণ করতে পারেন। এই বিষয়টি পরবর্তী এককে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৪.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

মূল্যায়নের গতানুগতিক সমস্যাগুলি কিছুটা দূর করার জন্য কিছু নতুন ধারার কর্মপন্থা সৃষ্টি হয়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রধান পদ্ধতি হল লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। লিখিত পরীক্ষার অন্যান্য রকমফের হল নিবন্ধমূলক রচনা, গবেষণামুলক নিবন্ধ ও টার্ম পেপার হল নিবন্ধমূলক পরীক্ষার উদাহরণ। ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা অপর দুটি প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম পরীক্ষার প্রচলন থাকলেও নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার পর যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তা সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজ ব্যবস্থা। সমস্ত প্রকার পরীক্ষারই কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।

সাধারণভাবে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি আছে। এই পরীক্ষায় নৈব্যক্তিকতা, যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব। এতে শিক্ষার সবকয়টি লক্ষ্যের মূল্যায়ন হয় না এবং এক সঙ্গে সমগ্র পাঠক্রমের পরীক্ষা হওয়ায় বাছাই করা মুখস্থ উত্তর লেখার প্রবণতা বেশি। এই সব ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যেসব নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে প্রশ্নভান্ডার তার অন্যতম। প্রশ্নভাণ্ডার কোন একটি বিষয়ে যতরকম প্রশ্ন হতে পারে তার সমাহার। অনেক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের মিলিত প্রয়াসে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি হয় এবং ক্রমাগত তার সংশোধন ও সংস্কারের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে। প্রশ্নভাণ্ডার ব্যবহারের ফলে শিক্ষক ছাত্র সকলেই উপকৃত হতে পারেন।

পরীক্ষার প্রস্তুতি, পঠন পাঠন , পরীক্ষা গ্রহণ এই সবের ক্ষেত্রে প্রশ্নভাণ্ডার যেমন সহায়ক, তেমনি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য গ্রেডিং প্রথা একটি আধুনিক চিন্তাধারা। গ্রেডিং অর্থ শ্রেণি বিভাগ। পরীক্ষার উত্তরগুলিকে গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাঁচটি বা সাতটি ভাগে ভাগ করে ক্রমানুসারে ইংরাজী বর্ণমালার সাহায্যে চিহ্নিত

করার নাম গ্রেডিং। গ্রেডিং করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যার মধ্যে সরাসরি গ্রেডিং, গ্রেড পয়েন্ট ও নম্বর থেকে গ্রেডে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি প্রচলিত আছে। গ্রেডিং পদ্ধতি অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব কমায়। মনোপরিমাপ বিদ্যার নীতির সংগে গ্রেডিং নীতির সামঞ্জস্য আছে। সেদিক থেকে গ্রেডিং বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। কিন্তু গ্রেডকে নম্বরে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত গ্রেডিং এর তাৎপর্য অনেকের কাছে স্পষ্ট হয় না।

ষান্মাসিক পাঠক্রম বিভাজন প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার নয়। পাঠক্রমকে ছয় মাসের উপযোগী এক একটি এককে ভাগ করে পঠন পাঠন ও মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা যথেষ্ট সুবিধাজনক হলেও সমস্ত রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলন করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে আই. আই. টি., আই. আই. এম. ইত্যাদি আবাসিক ও উত্তম পরিকাঠামো বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মুল্যায়নও তেমনি নতুন একটি চিন্তাধারা। এখানে বৎসরান্তে বাৎসরিক পরীক্ষার পাশাপাশি সারাবছর পাঠ্যসূচীর ছোট ছোট অংশের উপর নিজস্ব শিক্ষক দ্বারা অনুষ্ঠিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য দরকার বিশেষ পরিকল্পনা এবং মানসিক প্রস্তুতি। তাই ধারাবাহিক মুল্যায়ন কখনই বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্ত হিসাবে প্রচলিত হতে পারেনি। ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মুল্যায়নেরও অনেক সুবিধা ও অসুবিধা আছে।

আধুনিক যুগে কম্পিউটার মূল্যায়নের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজ করে। মূল্যায়ণের পরিকল্পনা করায়, মুল্যায়নের হাতিয়ার ব্যবহার করার সময়, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সময় এবং মুল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধ করার প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

৪.৮ অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। গতানুগতিক পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। তিন প্রকারের গতানুগতিক পরীক্ষাগুলি কী কী?

৩। প্রশ্নভাণ্ডারের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৪। গ্রেডিং বলতে কী বোঝায় লিখুন।

৫। ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় লিখুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। গতানুগতিক পরীক্ষা কত প্রকারের এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আলোচনা করুন।

২। প্রশ্নভাণ্ডার কী? আপনি কিভাবে একটি প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করবেন? প্রশ্নভাণ্ডারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। গ্রেডিং পদ্ধতি কাকে বলে? গ্রেডিং প্রথার পদ্ধতিগুলি কী কী? গতানুগতিক নম্বর দেওয়া প্রথায় গ্রেডিং এর সুবিধা আলোচনা করুন।

৪। ষান্মাসিক পাঠক্রম প্রথা কী? এই পাঠক্রমের জন্য কী কী শর্তের প্রয়োজন? ষান্মাসিক পদ্ধতির আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আপনার মতামতসহ তুলনা করুন।

৫। ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? এই মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন। এটাকে বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্ত হিসাবে ধরা যায় কি?

৬। কম্পিউটার মূল্যায়ন নিয়ে একটি রচনা তৈরি করুন।

একক ৫ ❑ মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণ, প্রতিবেদন ও ব্যবহার (Recording, Reporting and using Evaluation Outcomes)

গঠন (Structure)

সূচনা

উদ্দেশ্য

৫.১ নথিবদ্ধকরণ ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা

৫.১.১ নথিবদ্ধকরণ ও প্রতিবেদনের পদ্ধতি।

৫.১.২ গতানুগতিক নথিবদ্ধকরণ

৫.১.৩ ধারাবাহিক নথিপত্র

৫.১.৪ ধারাবাহিক নথিপত্রের নমুনা

৫.২ নথিবদ্ধকরণের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার

৫.২.১ কম্পিউটারের ব্যবহারের সুবিধা

৫.২.২ কম্পিউটার ব্যবহারের অসুবিধা

৫.৩ নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র

৫.৪ সারসংক্ষেপ

৫.৫ অনুশীলনী

সূচনা (Introduction)

মূল্যায়নের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য তখনই যথাযথভাবে সিদ্ধ হতে পারে যখন মূল্যায়ন লব্ধ সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করে প্রয়োজনমত তা কাজে লাগানো হয়। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার স্থায়ীত্ব সর্বত্র সমান নয় এবং তার ব্যবহারও সর্বত্র এক প্রকার নয়।

মূল্যায়ন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এককগুলিতে যে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে সেখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তাদের কেন্দ্র করেই শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ ও মূল্যায়ন আবর্তিত হয়। ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ও অন্যান্য দক্ষতা পরিমাপ করা মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষকের সাফল্য-অসাফল্য ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের ভিত্তিতে বিচার হয়। বিদ্যালয়ের ভালোমন্দ বিচার হয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মধ্যে দিয়ে। পাঠক্রমের ভালোমন্দও একই ভাবে বিচার হয়। সুতরাং মূল্যায়ন লব্ধ তথ্যের সিংহভাগই ছাত্রছাত্রী সম্পর্কিত তথ্য।

এই বিরাট তথ্য ভাণ্ডার যদি বিশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত থাকে অথবা আদৌ সংরক্ষিত না থাকে, তবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বৃথা। বর্তমান এককটিতে মূল্যায়নের এই অন্তিম ধাপটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—
- মূল্যায়ন লব্ধ তথ্য নথিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- নথিবদ্ধকরণের পদ্ধতিগুলি বলতে পারবেন।
- ধারাবাহিক নথিপত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পারবেন ও ধারাবাহিক নথিপত্র তৈরি করতে পারবেন।
- তথ্য সংরক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন।

৫.১ নথিবদ্ধকরণ ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা (Need for Recording and Reporting)

মূল্যায়নের সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত প্রয়োজন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রসঙ্গে আসার আগে দেখে নেওয়া দরকার মূল্যায়নের ফলাফল কাদের জন্য প্রয়োজন। শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত নন এমন মানুষের সংখ্যা বিরল। সরাসরি শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারক, শিক্ষার ইতিহাস রচয়িতা, সমালোচক, গণমাধ্যম ইত্যাদি অসংখ্য শ্রেণির মানুষ মূল্যায়নের ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচার করে থাকেন। অর্থাৎ মূল্যায়ন লব্ধ তথ্যের উপভোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে ভালো অনুভব করা যায়।

মূল্যায়নের ফলাফল দেখে শিক্ষকরা তাঁদের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে দুর্বলতার প্রতিকার করতে পারেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক বা সামগ্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই হোক, শিক্ষকরা অধিকাংশ সময়ই আত্মবিশ্লেষণে পিছিয়ে যান না।

দুর্বলতা চিহ্নিত করা ছাড়াও শিক্ষকরা মূল্যায়নের ফলাফল থেকে উৎসাহ, প্রেরণা ও প্রেষণা লাভ করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করলে, তাঁরা আরও পরিশ্রম করতে উৎসাহিত হন।

ছাত্রছাত্রীরা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের সমস্যা ও দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়। উপায় থাকলে তারা দুর্বলতাগুলি সংশোধন করে নিতে পারে। শিক্ষকদের মত তারাও আরও পরিশ্রম করার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে।

মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা অথবা বৃত্তিমূলক পাঠক্রম নির্বাচন, তার জন্য প্রস্তুতি ও চেষ্টা সবকিছুই নির্ভর করে মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে। এই সব পরিকল্পনার অন্যতম অংশীদার হলেন অভিভাবকরা। তাঁরা মূল্যায়নের ফলাফল দেখেই

স্থির করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের চাহিদা, প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে এবং কি ধরনের সহায়তা ও মানসিক সমর্থন দরকার তা স্থির করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্র বাছাই করার জন্য প্রায়ই মূল্যায়ন লব্ধ তথ্যকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। কারা কোন পাঠক্রম পড়তে পারবে, কারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুমতি পাবে এ সবই স্থির হয় কোনও না কোন মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বিচার করার জন্যও তার ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল এবং কখনও কখনও ভর্ত্তির যোগ্যতামানের ওপরে নির্ভর করে। কোন বিদ্যলয়ে কতজন স্টার পেয়েছে অথবা কোথায় ভর্তি আবেদন করতে হলে কমপক্ষে শতকরা আশি নম্বর পাওয়া চাই এ সব আলোচনা সাধারণ মানুষের মধ্যেই প্রায়ই শোনা যায়।

বিদ্যালয় পরিচালকরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল দেখে বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ স্থির করেন, তাঁদের আয়োজনের পরিবর্তন ঘটান এবং অন্যান্য রদবদল করেন।

শিক্ষা প্রশাসক, যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সরকারি দপ্তর ইত্যাদি, মূল্যায়নের ফলাফল দেখে বিদ্যালয়গুলির মান অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ করেন। প্রয়োজন হলে কৈ ফিয়ৎ তলব করা বা অনুসন্ধান করা, দরকার মত সাহায্য করা তাঁদের দায়িত্ব। আবার সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠক্রমের সংস্কার, নিয়মকানুনের রদবদল, পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

শিক্ষার পরিদর্শক (Inspector) ও তত্ত্বাবধায়করা (Supervisor) বিদ্যালয়গুলির ফলাফলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। চাকুরির নিয়োগকর্তারা মূল্যায়নের ফলাফলকে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় বলে মনে করেন। দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মন্ত্রীসভা শিক্ষার প্রসার, অর্থ বরাদ্দ, অথবা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়, মোটামুটি মূল্যায়ন প্রসঙ্গটিও তাঁদের চিন্তা ভাবনার অন্তর্ভুক্ত করেন।

সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষা, তার ফলাফল ও শংসাপত্রের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। এই সব দুর্নীতি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের যথার্থতা যাচাই করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মূল্যায়নের নথিপত্র দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা থাকার জন্য, এই সব দুর্নীতি সহজেই ধরা পড়ে এবং তার বিচার হয়।

এই সব প্রয়োজনের প্ররিপ্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শুধুমাত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করাই নয়, তার ফলাফল নথিবদ্ধ করে দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষিত করে রাখা একান্ত জরুরি।

৫.১.১ নথিবদ্ধকরণ ও প্রতিবেদনের পদ্ধতি Methods of Recording and Reporting)

মূল্যায়নের ফলাফল কোন্ পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করা হবে তার উপর নির্ভর করে ঐগুলি (ক) প্রয়োজনের সময় কত দ্রুত ব্যবহার করা যাবে, (খ) কতদিন যাবৎ সংরক্ষিত করা যাবে, (গ) সহজেই শ্রেণিবদ্ধ তথ্য পাওয়া যাবে কিনা এবং (ঘ) কোন একক ব্যক্তি সম্বন্ধে পুর্ণাংঙ্গ তথ্য পাওয়া যাবে কিনা।

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য জানার প্রয়োজন হয় তবে অনেক সময় দেখা যায় সেই তথ্য কোথায় কার কাছে রক্ষিত আছে তা নিশ্চিত নয়। অথচ এটা নিশ্চিত যে কোথাও সেটি রক্ষিত আছে। যেমন, কোন ক্ষেত্রে যদি জানতে চাওয়া হয় কোন বিষয়ে দশবছর আগে যে প্রশ্নপত্র (মূল্যায়নের হাতিয়ার) ব্যবহৃত হয়েছিল তার কপি পাওয়া যাবে কিনা তবে তা পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ছাত্র ধারাবাহিকভাবে কেমন ছাত্র ছিল, সে সম্বন্ধে খুব ভালো বা খারাপ ছাত্র হলে শিক্ষকরা স্মৃতি থেকে একটা ধারণা দিতে পারবেন হয়ত, কিন্তু কোন তথ্য দিতে পারবেন না।

(খ) উপরের কাল্পনিক প্রয়োজনগুলি যদি খুব কাছাকাছি সময়ের জন্য হয় তা হলে হয়ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে কিন্তু একটু পুরানো হলে আর কোন নথি পাওয়া যাবে না। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কোন ছাত্র যদি ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বেকার মার্কশিটের দ্বিতীয় কপি চেয়ে পাঠায়, তবে বিশ্ববিদ্যালয় তা অনায়াসে দিতে পারবে।

(গ) শ্রেণিবদ্ধ তথ্য অনেক সময়ই সংরক্ষিত থাকে না। প্রায়ই নীতি নির্ধারণের জন্য জানতে চাওয়া হয়, কোন এক বৎসরে কোন শ্রেণির ছাত্রের (ছেলে ওমেয়ে, সাধারণ ও সংরক্ষিত শ্রেণিগুলি ইত্যাদি) পাশের হার কত ছিল, অনেক সময় তার নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।

(ঘ) বিদ্যালয়ে কোন একটি ছাত্রের ছাত্রজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে চাইলে, বিশেষতঃ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সহ জানতে চাওয়া হয়, তবে তার বিবরণ পাওয়া যায় না।

এই সব কারণে মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা দরকার। প্রথম আলোচ্য বিষয়-গতানুগতিক নথিবদ্ধকরণ।

৫.১.২ গতানুগতিক নথিবদ্ধকরণ (Conventional Methods of Recording)

এই পদ্ধতিতে এখনও দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়নের নথি রাখা হয়। সাধারণত বড়খাতায় ষান্মাসিক (Half yearly) ও বাৎসরিক (Annual) পরীক্ষার ফলাফল প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর নাম ও ক্রমিক সংখ্যার পাশে লিখে রাখা হয়। ঐ নম্বর মুদ্রিত প্রগতি পত্রে। Progress Report) লিখে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়, ষান্মসিক বা ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হলে ফেরৎযোগ্য এবং বাৎসরিক রিপোর্ট হলে অফেরৎযোগ্য হবে। এই রিপোর্ট সংরক্ষণ করা বা না করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর।

প্রগতিপত্র মূল্যায়নের একটি অসম্পূর্ণ নথি। কারণ এতে পরীক্ষার নম্বর বা ক্ষেত্র বিশেষে গ্রেড ছাড়া আর যে সব তথ্য থাকে তার মধ্যে আছে উপস্থিতির হার অথবা উপস্থিতি সম্বন্ধে মন্তব্য, সাধারণভাবে আচরণ (Conduct) সম্বন্ধে মন্তব্য অথবা অনুরূপ আরও দুই একটি মন্তব্য, যে গুলিকে নির্দিষ্ট তথ্য বলা যায় না। পরীক্ষার নম্বরের পাশাপাশি ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর এবং প্রথম কয়েকটি ক্রমিক অবস্থান (যেমন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়, মূল্যায়নের দিক থেকে যার খুব গুরুত্ব নেই।

মূল্যায়নের গতানুগতিক নথি দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষণ করা কঠিন। যদিও সংরক্ষণ করা হয় তবে প্রয়োজন

মত দ্রুত নথি থেকে তথ্য উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নথিতে শুধুমাত্র পরীক্ষার নম্বর সংরক্ষিত থাকে অন্য কিছু নয়। ফলে এই নথি থেকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না।

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার শেষে যে পদ্ধতিতে ফলাফল জানানো হয় তা আরও সংকীর্ণ। সেখানে শুধু একটি মাত্র মার্কসিট দেওয়া হয় তাতে শুধু প্রাপ্ত নম্বর ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করে দেওয়া হয় (যেমন, প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণি ইত্যাদি)। আর কোন তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ পরীক্ষা গ্রহণকারী বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে আর বিশেষ কোন তথ্য থাকে না। শুধুমাত্র উপস্থিতির হার একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত না হলে, পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় না। সে জন্য উপস্থিতির তথ্য সাময়িকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো হয়।

পরীক্ষার নম্বর ভিত্তিক নথি চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষে দেওয়া হয় সে জন্য এই সব ছাত্রছাত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন করা হলেও তার কোন বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। পরবর্তী পর্যায়ে নম্বর ছাড়া ব্যক্তিগত অন্যকোন তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই অগ্রাহ্য করা হয়। একান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে যদি অন্য তথ্য দরকার হয় তবে তাঁরা নিজেরাই তার জন্য উপযুক্ত অভীক্ষাপ্রয়োগ করে ফলাফল জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন, অনেক বৃত্তিমূলক পাঠক্রমেই ভর্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। এই সব পরীক্ষার বিষয় নির্বাচন, পরীক্ষার ধরন ও পদ্ধতি সবই পাঠক্রমের প্রয়োজন অনুসারে পরীক্ষা কর্তারা স্থির করেন।

সুতরাং গতানুগতিক নথি মূল্যায়নের প্রকৃত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না।

৫.১.৩ ধারাবাহিক নথিপত্র (Cumulative Record Card)

দীর্ঘকাল যাবৎ ধারাবাহিক নথি পত্রকে (Cumulative Record Card) মূল্যায়নের আদর্শ নথি হিসাবে গণ্য করা হয়ে আসছে। এই নথি পত্রটি ধারাবাহিক (Cumulative) কারণ শিক্ষার্থী যতদিন বিদ্যালয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার সম্বন্ধে যত তথ্য সংগৃহীত হয় তার সমস্ত কিছু ক্রমাগত ঐ নথিতে লিখে রাখা হয়। এর ফলে ধারাবাহিক নথিপত্র থেকে একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য যে-কোনো সময়ে পাওয়া যেতে পারে। এই নথিপত্র কয়েকটি কারণে মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণগুলি নিম্নরূপ।

● মূল্যায়ন যেহেতু একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সেহেতু ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এর ফলে কোন ব্যক্তির শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

● বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র যে শিখন জনিত পরিবর্তন হয় তা নয়, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধির দরুনও পরিবর্তন ঘটে। এইসব পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কিত এবং শিক্ষা অনেকাংশে বিকাশজনিত পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। ধারাবাহিক নথিপত্র থেকে এই পরস্পর সম্পর্কিত পরিবর্তন ধারার একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

● শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও বিকাশজনিত পরিবর্তন বয়সোচিত স্বাভাবিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, শিক্ষকদেরই তা লক্ষ্য করতে হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু যদি তা যথাযথ ভাবে এক নজরে পরীক্ষা করার মত অবস্থায় সংরক্ষিত না থাকে তবে শিক্ষকদের পক্ষে কাজটি দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ধারাবাহিক নথিপত্র সে দিক থেকে উৎকৃষ্ট একটি পদ্ধতি।

● নির্দেশনা ও পরামর্শদানের জন্য ধারাবাহিক নথিপত্র একান্ত আবশ্যক। শিক্ষা সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে, অথবা আচরণ সংক্রান্ত কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলে তার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য। ধারাবাহিক নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার দুই ক্ষেত্রেই অনেকটা সাহায্য করে। এমন কি যদি এই উদ্দেশ্যে কোন বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য দরকার হয় তবে তাঁর কাছে ধারাবাহিক নথিপত্রটি নিয়ে গেলে তিনি সহজেই একসঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন।

● ছাত্রছাত্রীরা এক বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য বিদ্যালয়ে পড়তে গেলে, ধারাবাহিক নথিপত্রটি সঙ্গে নিয়ে গেলে নতুন বিদ্যালয়ে পরবর্তী কালের তথ্য সংযোজন করে মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে। এমন কি নতুন বিদ্যালয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে গ্রহণ করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও ধারাবাহিক নথিপত্রের সাহায্য প্রয়োজন।

● বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ হলেও, এই নথিপত্র সারাজীবন সংরক্ষণ করে রাখলে নানা ভাবে কাজে লাগতে পারে।

● এই নথি পাঠাগারে কার্ড আকারে পুস্তক তালিকা (Catalogue) যে ভাবে সংরক্ষিত হয় সেই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে সহজেই খুঁজে বের করা যায় এবং এর জন্য প্রচুর স্থান দরকার হয় না।

● এই নথি সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত লোকজন বিশেষ দরকার হয়না, শিক্ষকরাই প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন।

৫.১.৪ ধারাবাহিক নথিপত্রের নমুনা (Sample of Cumulative Record Card)

ধারাবাহিক নথিপত্রের অনেক রকম আদর্শ নমুনা বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন। এখানে তার একটি নমুনা দেওয়া হল। বিদ্যালয়গুলি তাদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নথির কিছু অদল বদল করতে পারেন।

পি. কিউ. আর. বিদ্যালয়
ধারাবাহিক নথিপত্র
(Cumulative Record Card)

শিক্ষার্থীর ফটোগ্রাফ

প্রাথমিক তথ্য (Preliminary Information) :

শিক্ষার্থীর নাম ঃ

শ্রেণি ঃ বিভাগ ঃ লিঙ্গ ঃ ছেলে / মেয়ে

পিতার/মাতার নাম ঃ ক্রমিক সংখ্যা ঃ

বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন ঃ

জন্মের তারিখ ঃ

বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তির তারিখ ঃ

বর্তমান বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তির তারিখ। শ্রেণি ঃ

পারিবারিক তথ্য (Family Information) ঃ

পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পেশা ঃ

মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পেশা ঃ

পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য ঃ

শারীরিক তথ্য (Plysical Information)

বৎসর	২০০৫		২০০৬		২০০৭		২০০৮	
উচ্চতা								
ওজন								
দৃষ্টিশক্তি	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম	ডান	বাম
দাঁত								

হস্তব্যবহার প্রবণতা ঃ ডান হাত / বাম হাত

রক্তের গ্রুপ ঃ

রক্ত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য ঃ (যেমন, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি)

প্রতিবন্ধিতা সম্বন্ধে তথ্য ঃ

অন্য কোন বিশেষ শারীরিক তথ্য ঃ

রোগের ইতিহাস (History of Diseases) ঃ উল্লেখযোগ্য রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সংক্ষিপ্ত পূর্ববর্তী বিবরণ। কোন বংশগত রোগ থাকলে তার বিবরণ।

মানসিক তথ্য (Psychological Information) ঃ

বৈশিষ্ট্য	অভীক্ষার নাম	বৎসর	স্কোর	দলগত অবস্থান
বুদ্ধি				
বিশেষ প্রবণতা				
ব্যক্তিত্ব				
আগ্রহের ধরন				
সৃজনশীলতা				
অন্য কোন				

বিদ্যালয়ে আচরণ সংক্রান্ত তথ্য (Information about conduct in Sehoob)

বৎসর	২০০৬	২০০৬	২০০৭	২০০৮
উপস্থিতি				
সহপাঠীদের সঙ্গে আচরণ				
শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণ				

সমস্যামূলক আচরণ যদি কিছু থাকে ঃ

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক তথ্য (Games and Cultural Information)

খেলাধুলা ঃ

সংগীত ঃ

নাটক ঃ

সাহিত্য ঃ

চিত্রাঙ্কন ঃ

অন্যকিছু ঃ

বিশেষ পারদর্শিতার বিষয় (Subject of Special Proficiency)

বিষয়	প্রতিযোগিতা বা সাফল্যের অন্য নিদর্শন			
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮
বিষয়-১				
বিষয়-২				
বিষয়-৩				

<u>পরীক্ষার ফলাফল</u> **(Examination Results) :**

	V	VI	VII	VIII	IX	X
বাংলা						
ইংরাজী						
গণিত						
ইতিহাস						
ভূগোল						
ভৌতবিজ্ঞান						
জীব বিজ্ঞান						
কর্মশিক্ষা						
মোট						

	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮
শ্রেণি শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ প্রধান শিক্ষকের মতামত				

ধারাবাহিক নথিপত্র তৈরি করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এককভাবে একটি মাত্র বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা থাকলে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সফল হবে না। সমস্ত বিদ্যালয়ে একই পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হলে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিবর্তন করলেও বিশেষ সমস্যা হবে না। তবে বিদ্যালয়ে যদি একজন পূর্ণ সময়ের মনোবিজ্ঞানী বা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন তবেই সমস্ত ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে এতরকম তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, অভিভাবকদের সহযোগিতা এবং প্রশাসনিক দিক থেকে নীতিগত সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক অর্থ বরাদ্দ থাকলে ধারাবাহিক নথিপত্র তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

৫.২ নথিবদ্ধকরণের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computers for Recording)

এখনকার সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের সবকয়টিতেই কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার ব্যবহারের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পাওয়াতে প্রায় সকলেই কম্পিউটার স্বাক্ষর (Computer Literate) হয়ে উঠেছে। সেজন্য কম্পিউটারগুলিকে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার না করে অনায়াসে মূল্যায়নের নথি তৈরি ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক (Hard Disc) এ ধারাবাহিক নথি পত্রের উপরোক্ত ছকটি অথবা আরও উন্নত মানের কোন ছক সংরক্ষণ করে রাখলে কম্পিউটারের সাহায্যে সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করে রাখা সহজ। এক একটি কমপ্যাক্ট ডিস্কে (Compact Disc) বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তারজন্য কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্ত শিক্ষক বা কর্মীরাই যথেষ্ট উপযুক্ত, কোন স্বতন্ত্র লোক বল দরকার নেই।

কোন দক্ষ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে প্রোগ্রাম (Programme) তৈরি করে নিলে, কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্য থেকে প্রয়োজনমত শ্রেণি বিভক্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ গতিশীল ও ত্রুটিহীন করে তোলা যাবে। বিষয় ভিত্তিক নম্বর বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি ও তার মান, দুর্বলতার স্থান, দক্ষতার প্রকৃতি ইত্যাদি অনেক কঠিন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যায়। এই কাজ আলাদাভাবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নম্বর বিচার করে পাওয়া যাবে না। এই কারণে বর্তমান কালে মূল্যায়নের নথি তৈরি করার জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়।

৫.২.১ কম্পিউটারের ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of using Computers)

মূল্যায়নে বিশেষত নথি সংরক্ষণের কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধাগুলি সংক্ষেপে একত্রিত করলে দেখা যাবে এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি আর কিছু হতে পারে না।

- কম্পিউটারের স্মৃতিতে অসংখ্য তথ্য দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষণ করা যায়।
- যে-কোনো সময় যে-কোনো তথ্য সহজেই খুঁজে বের করা যায় এবং প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গেই তার মুদ্রিত কপি পাওয়া যায়।
- যদি উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে তবে আন্তর্জাল (Internet) ব্যবহার করে সহজেই তথ্য পাঠানো যায়। যেমন, এক বিদ্যালয় থেকে অন্যবিদ্যালয়ে অথবা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে বিশেষ কোনো ছাত্র সম্বন্ধে তথ্যের প্রয়োজন হলে, সরাসরি পাঠানো যায়।
- কোনো নতুন সংযোজন করতে হলে বা পুরানো তথ্যের বদলে নতুন তথ্য যোগ করতে হলে, খুব সহজেই অন্য সমস্ত নথি অবিকৃত রেখে এই কাজ অল্প সময়ে করা সম্ভব।
- নথি সংরক্ষণের জন্য বেশি স্থানের বা আসবাবের দরকার হয় না।

- সাধারণভাবে কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ যে-কোনো ব্যক্তিই নথি সংরক্ষণের কাজ করতে পারে, কোনো বিশেষজ্ঞের দরকার হয়না। এর ফলে নথি সংরক্ষণের ব্যয় খুবই কম।
- নথির অন্তর্ভুক্ত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ভয় কম।
- শ্রেণিবদ্ধ তথ্যের সংকলন করা সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ।
- মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি তথ্যনির্ভর নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার সুযোগ থাকে।
- যে-কোনো বিষয়, বিতর্ক, যাচাই (Verification) করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই সব সুবিধা সত্ত্বেও, কয়েকটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৫.২.২ কম্পিউটারের ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of uning Computers)

কম্পিউটার সংরক্ষণের কয়েকটি অসুবিধা নীচে দেওয়া হল।

- কম্পিউটার ব্যবহারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাতে হলে, উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা দরকার, যা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ার এখনও গড়ে ওঠেনি। কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের যোগাযোগ গড়ে ওঠা দুঃসাধ্য।
- কম্পিউটার ভাইরাস বা অন্যকোন কারণে সংরক্ষিত তথ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হতে পারে।
- অসাধু প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের বিকৃতি ঘটানো সম্ভব এবং সেটা বাইরে থেকেই করা যাবে। ফলে অন্তত একটি মুদ্রিত স্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখতেই হবে।
- একই কারণে তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।
- প্রয়োজনের তুলনায় এখনও দক্ষ কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম।
- এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা এই ধরনের বড়ো প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

৫.৩ নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র (Exit Portfolio)

ব্যবস্থাপনা বিদ্যার পরিভাষায় সামগ্রিক গুণগত ব্যবস্থাপনা (Total Quality Management) কথাটির উদ্দেশ্য হল, কোনো কার্যক্রমের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অন্তিম ধাপ পর্যন্ত গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যেসুসংহত পদক্ষেপ নেওয়া। শিক্ষায় মূল্যায়ন উদ্দেশ্য তাই। সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের সামাগ্রিক মূল্যায়ন (Comprehensive evaluation) যেমন জরুরি আবার মূল্যায়নের সমস্ত তথ্যও তাদের জানানো প্রয়োজন। এই জন্য ব্যবস্থাপনা বিদ্যায় গতানুগতিক মার্কশিট ও শংসাপত্রদানের পরিবর্তে নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র (Exit Portfolio) দান করার কথা বলা হয়েছে।

নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ যা একজন শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ছাড়াও অন্যান্য তথ্য, বৈশিষ্ট্য, আচরণ, পাঠক্রম চলাকালীন পঠন পদ্ধতি, উদ্যম, নেতৃত্ব, অধ্যবসায় ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্র। পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে এই নথিপত্র পেশ করলে একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।

যেখানে ধারাবাহিক আভ্যন্তরীণ-মূল্যায়ন ব্যবস্থা আছে এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সমস্ত আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় সেখানে এই নথিপত্র তৈরি করা সম্ভব। বিশেষভাবে আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র তৈরি করা সুবিধাজনক। অবশ্যই ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকদের অনুপাত খুব বেশি হলেও এই ধরনের বিস্তারিত নথি তৈরি করা সম্ভব নয়।

নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্রতে প্রধানত যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হল রেটিং স্কেল। অর্থাৎ কোন একটি বৈশিষ্ট্যের দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে শিক্ষার্থীর অবস্থান বোঝানোর জন্য একটি সংখ্যামান অথবা সরাসরি ঐ বৈশিষ্ট্যের মান হিসাবে একটি গ্রেড প্রদান করে তার অবস্থান বোঝানো হয়।

আমাদের দেশে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাবিদরা সচেতন হলেও এখনও এসম্বন্ধে কোন সর্বজনীন সুষ্ঠু নীতি বা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। অথচ শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এই কাজটিই সকলের আগে করা দরকার।

সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা যেমন অবশ্য প্রয়োজন তেমনি মূল্যায়নে ফলাফল সংরক্ষিত নথি এবং তার ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদন শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালক, শিক্ষা প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, এবং সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সকলেরই প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটি মুক্ত করা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত, পদ্ধতিগত বা পাঠক্রম পরিবর্তন, এসব ছাড়াও কখনও কখনও দুর্নীতি বোধ করার জন্যও মূল্যায়নের নথি সংরক্ষণ করা হয়।

যে পদ্ধতিতে মূল্যায়নের নথিপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয় তার মধ্যে প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতি সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এই পদ্ধতি অসম্পূর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা দীর্ঘকাল সংরক্ষিত থাকে না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড ইত্যাদি বড়ো প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার নম্বরটুকু মাত্র দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে।

ধারাবাহিক নথিপত্র একটি আদর্শ নথি কারণ এই নথিতে শিক্ষার্থীর সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। এই নথিতে প্রতিবৎসরের তথ্য লিখে রাখা হয় এবং যখনই দরকার তা থেকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ধারাবাহিক নথিপত্রের মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও বৃদ্ধিজনিত যে সব পরিবর্তন ঘটে সেগুলি লিপিবদ্ধ থাকে এবং সেজন্য যেকোনো সময়ই শিক্ষার্থীর একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

মূল্যায়নের নথি সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে অথবা কম্প্যাক্ট ডিস্কে সমস্ত তথ্যের সংরক্ষণ করা। এর ফলে অল্পায়াসে, কম জায়গায়, সহজে প্রচুর তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এবং যে কোনো সময়ই তা থেকে তথ্য সরবরাহ করা যায়। মুদ্রিত কপি যেমন দ্রুত পাওয়া যায় তেমনি অন্তর্জালের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য স্থানান্তরিতও করা যায়। তবে তথ্য নষ্ট হওয়ার বা অসৎ প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয়।

সংরক্ষণের ও ব্যবহারকারীকে তথ্য সরবরাহের আর একটি আধুনিক ব্যবস্থা হল নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র। এই নথিতে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে পাঠক্রম চলাকালীন সমস্ত পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ লব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ থাকায় শিক্ষার্থী সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

১। মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণ করার প্রয়োজনীয়তা কী?

২। গতানুগতিক নথিবদ্ধকরণ কী?

৩। ধারাবাহিক নথিপত্র বলতে কী বোঝেন?

৪। ধারাবাহিক নথিপত্রের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের দুটি প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৫। নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র কী?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। এই নথিবদ্ধকরণের দ্বারা কারা উপকৃত হল তা আলোচনা করুন।

২। প্রচলিত নথিবদ্ধকরণ প্রথার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করুন।

৩। ধারাবাহিক নথিপত্র কি? ধারাবাহিক নথিপত্রের বিভিন্ন সুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৪। মূল্যায়নের নথিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন। কিভাবে এই নথিবদ্ধকরণে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?

৫। নিষ্ক্রমণকালীন নথিপত্র সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন।

PG Education : 07 : 2

একক ৬ ❒ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারণা (Concept of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায়?

৬.৩.১ গাইডেন্সের ধারণা

৬.৩.২ কাউন্সেলিং এর ধারণা

৬.৪ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য

৬.৫ কাউন্সেলিং এর মৌলিক নীতিসমূহ

৬.৬ কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী

৬.৭ সারসংক্ষেপ

৬.৮ প্রশ্নাবলী

৬.১ সূচনা (Introduction)

আধুনিক সমস্যাবহুল জটিল জীবনে অধিকাংশ মানুষই কখনও না কখনও দিশাহীনতা বা সিদ্ধান্তহীনতার সমস্যায় পড়েন। নিজের জীবনকে কোন পথে পরিচালিত করলে সাফল্য ও সার্থকতা আসবে এই দ্বিধায় পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। কোন ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত, কোথায় বসবাসের বাড়ি করা উচিত, কোথায় বেড়াতে গেলে নিশ্চিন্ত আনন্দলাভ করা যাবে, এই রকম সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের এক ধরনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করে দেয়। এছাড়াও আছে অসংখ্য ব্যক্তিগত সমস্যা। চাকুরি বা পরিবারে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা জনিত সমস্যা, শারীরিক সমস্যা এই জাতীয় সমস্যার অন্ত নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সমাজে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং নামক দুটি প্রক্রিয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অন্য কারও স্যাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নিজের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা এখন আর বিরল ঘটনা নয়। শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষভাবে শিক্ষকদের এই জ্ঞান আবশ্যিক, কারণ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দরকার হয় ছাত্রছাত্রীদেরই সবচেয়ে বেশি। আর এই ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়িত্বই প্রধান। বর্তমান এককটিতে সেইজন্যই গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর প্রাথমিক পরিচিতি দেওয়া হল।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং এর মূল নীতিগুলি বলতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর তুলনা করতে পারবেন।

৬.৩ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায় (What is meant by Guidance & Counselling)

প্রথমে গাইডেন্সের ধারণাটি ও পরে কাউন্সেলিং-এর ধারণাটি সুস্পষ্ট করা হবে।

৬.৩.১ গাইডেন্সের ধারণা (Concept of Guidance)

'গাইডেন্স' শব্দটি 'কাউন্সেলিং' প্রসঙ্গে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই দু'টি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে এবং এদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে আলোচনা করা প্রয়োজন।

গাইডেন্স শব্দটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া এই দুটি অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গাইডেন্স শব্দটির উৎস ইংরেজী 'গাইড' শব্দ। গাইড হলেন পথ প্রদর্শক। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল তিনি কোন ব্যক্তিকে নতুন স্থান, নতুন বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে সক্ষম। তাই যিনি 'গাইড' হবেন তাঁকে নতুন স্থান, নতুন বিষয়, নতুন পরিস্থিতি, বিভিন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। গাইড করা বা পরিচালনা করা মানেই গাইডেন্স প্রদান। গাইড বা পরিচালনা করতে গেলে যে সব কার্য সম্পাদন করতে হয় তা মানব জীবনে নতুন কিছু নয়। বস্তুত গাইডেন্সের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহ মানব

জাতির ইতিহাস বা এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণীর ইতিহাসের মতই পুরাতন। এটা একটা বাস্তব ও সাধারণ সত্য যে পশু ও পক্ষীশাবক তাদের মা-বাবার গাইডেন্সের ফলেই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। পাখিরা এদের শাবককে উড়তে সাহায্য করে, নেকড়ে ওদের শাবককে শিকার করতে সাহায্য করে। যদিও গাইডেন্সকে বর্তমান সভ্যতার বিজ্ঞানের অবদান হিসাবে পরিগণিত করা হয়, বাস্তব সত্য হল এই গাইডেন্সের সত্তা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। তাই আদিম মানবও বাঁচার তাগিদে গাইডেন্সের ব্যবহারে সক্রিয় ছিল বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

মানব সভ্যতার ঊষাকালে গাইডেন্স বা পরিচালনা একটা স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন কার্যাবলীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। বড়রা ছোটদেরকে তাদের জীবন বিকাশের পক্ষে বাধা-বিপত্তি সরিয়ে দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের সাহায্য করতেন। তখন সমাজ ব্যবস্থা ও জীবিকা নির্বাচন অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ছিল বলেই পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা খুব সহজেই ছোটদেরকে পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে শিল্পকেন্দ্রিক নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়লো অনেক জটিল। শিক্ষায় নতুন দিগন্ত খুলে গেল—বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হল। কর্মজগতে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হল। কৃষকের ছেলে ভবিষ্যতে কৃষক হবে, কুমোরের ছেলে কুমোর হবে, ছুতোরের ছেলে ছুতোর হবে এই ধারাবাহিক ছাঁচে গড়া জীবন ও জীবিকার পট পরিবর্তন ঘটলো খুব দ্রুত তালে। তাই এই প্রাচীন শ্রমবিভাগের মূলে পড়লো কুঠারাঘাত। আজকের এই পৃথিবীতে কোন ছেলে ভবিষ্যতে কি হবে তা' আগে থেকেই হলফ করে কেউ বলতে পারে না। কেননা তা' নির্ভর করছে ছেলেটির সুপ্ত সম্ভাবনা যেমন বুদ্ধি, বিশেষ মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে পাঠক্রম বেছে নেওয়া ও শিক্ষান্তে তার সফলতার ভিত্তিতে উপযুক্ত জীবিকার অনুসন্ধান ও কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ ইত্যাদির উপর। এই পড়াশোনা থেকে শুরু করে অবশেষে কর্মজীবনে প্রবেশ এখন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক জটিল প্রক্রিয়া। মা, বাবা, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, প্রতিবেশী প্রভৃতির আদেশ উপদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক বিষয় নির্বাচন কিংবা পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক পেশা নির্বাচন এ দু'ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ল নিষ্ফল প্রচেষ্টারই নামান্তর। শুধু তাই নয় শহুরে জীবনের দ্রুত গতি, দৈনন্দিন কর্মকোলাহল, পরিযায়ী জনসংস্কৃতি, জনবসতির অতি চাপে স্থানসংকুলানের অভাব ইত্যাদির ফলে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় আজকের শহুরে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। শুধু নিজের চেষ্টায় কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর চেষ্টায় এ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যার শিকার আজকের আমরা সবাই অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এই সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পেই গড়ে উঠলো ফলিত মনোবিজ্ঞানের এক শাখা যার নাম গাইডেন্স বা পরিচালনা।

আজকের সমস্যাবহুল জীবনে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদিও মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদেরকে যথাযথভাবে বোঝার জন্য নিয়োজিত হল মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই সমবেত

প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবন বিকাশে ও তার জীবনের বিভিন্ন দিকের সমস্যা সমাধানে তাকে যথাযথ সহায়তা করা। এই প্রচেষ্টাকেই ব্যাপক অর্থে বলা হয় গাইডেন্স বা পরিচালনা।

জোন্‌স্-এর মতে গাইডেন্স বা পরিচালনা বলতে বোঝায় এমন এক সাহায্য যা কোন বিশেষজ্ঞ (গাইড) অন্য কোন ব্যক্তির (সাহায্য প্রার্থীর) জীবনের লক্ষ্য গঠনে, লক্ষ্যের সঙ্গে যথাযথ অভিযোজনে এবং সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তির লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা অপসারণে প্রদান করে থাকেন। খুব সহজ করে বলা যায় গাইডেন্স হল এমন একটি কাজ যার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি বিচারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট পথে চালিত করা হয়। যিনি এই নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন তিনি হলেন গাইড বা পরিচালক। মনোবিজ্ঞান সম্মত উপদেশ ও নির্দেশ প্রদানই হল গাইডেন্স। অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে (সাহায্য প্রার্থীকে) খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যে মনোবিজ্ঞান সম্মত নির্দেশ তাই গাইডেন্স।

ছোটবেলা থেকে শুরু করে সারাজীবন ধরেই মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটা সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আরেকটা সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। এটা এক বাস্তব সত্য। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোন মানুষকেই গাইডেন্সের দ্বারস্থ হতে হয়। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয় চাকুরীজীবী, মাঝবয়সী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকেই মাঝে মধ্যে এর দ্বারস্থ হতে হয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত গাইডেন্সের আসল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করা যাতে ব্যক্তি সমস্যার সমাধান নিজে নিজেই করতে সক্ষম হয়।

আমরা সাধারণত গাইডেন্সকে দু'টি প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করে থাকি।

এক॥ কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একটি সমস্যার সমাধানকল্পে বা কোন পাঠক্রম বা বোঝার প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি গাইডেন্সের সাহায্য নিয়ে কতটা সফল।

দুই॥ কোন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশকল্পে কাউন্সেলার, শিক্ষক, অভিভাবক প্রভৃতির সহায়তায় তাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে দীর্ঘমেয়াদী গাইডেন্স কতটা সফল।

সুখের কথা, এই বিচার বা মূল্যায়ন আমাদের কাছে এই ইঙ্গিত বহন করছে যে বিজ্ঞানভিত্তিক বা মনোবৈজ্ঞানিক গাইডেন্স যথেষ্ট সফল। আর এই গাইডেন্সের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, আগ্রহ, মনোভাব, ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি পরিমাপের জন্য উদ্ভাবিত আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological tests) এবং মনোবিদ্যায় পারদর্শী বিশেষ গাইড বা বিশেষজ্ঞ মনোবিদ।

৬.৩.২ কাউন্সেলিং-এর ধারণা (Concept of Counselling)

কাউন্সেলিং-এর কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

১। এক ব্যক্তির অন্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহায্য প্রদানকে বলা হয় কাউন্সেলিং। যিনি সাহায্য প্রদান করেন তিনি কাউন্সেলার এবং যে সাহায্যপ্রার্থী সে কাউন্সেলী (Counselle) বা ক্লাইয়েন্ট (Client)।

২। ক্লাইয়েন্টের সমস্যা নিরসনকল্পে কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মধ্যে কয়েকটি সাক্ষাৎকার হল কাউন্সেলিং।

৩। কাউন্সেলিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে দুই ব্যক্তি সমস্যার সনাক্তকরণ ও সমস্যার নিরসনে তৎপর হন। এই দুই ব্যক্তির একজন ক্লাইয়েন্ট (যার সমস্যা বর্তমান) এবং অপরজন হলেন কাউন্সেলার।

আমরা এখানে কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং মনোবিদের বিভিন্ন কার্যাবলীর আলোকে কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায় তা নির্ধারণের চেষ্টা করবো।

কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। এটির ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি (principle) ও পদ্ধতি (methods)। মানুষের জীবনের যাত্রাপথে উদ্ভুত বিভিন্ন চাহিদা (needs) এবং এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত বিভিন্ন সমস্যার নিরসন করাই কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌দের প্রধান কাজ। এই সব সমস্যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—পারিবারিক, বৈবাহিক, ক্ষোভ-দুঃখ, অহেতুক ভয়, যৌন-ব্যভিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যা।

কোন কোন কাউন্সেলিং মনোবিদ ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, কিংবা আপামর জনসাধারণের শুধু স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা আবার কেউ কেউ শিক্ষান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলিং মনোবিদ হিসেবে তাদের কর্মময় জীবন ব্যয় করেন। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ ক্লাইয়েন্টদের উপর কোন ঔষধ প্রয়োগ করেন না, এবং তাদের পরিষেবা সাধারণত মানসিকভাবে অল্প বিপর্যস্ত ক্লাইয়েন্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কাউন্সেলিং মনোবিদগণ সাহায্যপ্রার্থীকে কখনও 'রোগী' বলেন না, বলেন ক্লাইয়েন্ট। এটার উদ্দেশ্য হল—চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা 'রোগ' এবং 'রোগারোগ্য' এ দুটোকে দূষণমুক্ত করা। দূষণ এই অর্থে যে 'মানসিক রোগ' এবং 'মানসিক রোগারোগ্য' এই শব্দগুলি আজও আমাদের সমাজে কলঙ্কের কালিমা বহন করে চলেছে। কাউন্সেলারগণ ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে এমন একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে ক্লাইয়েন্ট নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবতে পারেন এবং স্বচ্ছন্দে তার সমস্যাটা কাউন্সেলারের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

কাউন্সেলিং মনোবিদগণ ক্লাইয়েন্টকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। তাঁদের মতে প্রতিটি ক্লাইয়েন্ট যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন; কোন ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব কোনভাবে তার এই বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তাই সে বর্তমান সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কাউন্সেলিং মনোবিদের মত হল ক্লাইয়েন্টের মন থেকে এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাবটি কোনভাবে সরিয়ে দিতে পারলেই সে আবার বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠবে এবং নিজের বর্তমান সমস্যাটির সমাধান নিজেই করতে পারবে। কাউন্সেলিং মনোবিদগণের মানুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল মানুষের প্রকৃতি স্বভাবতই নির্মল এবং মানুষ

স্বভাবতই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন। অর্থাৎ কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ মানুষের স্বরূপের ইতিবাচক দিকটাকেই মুখ্য বলে মনে করেন। ফলে তাঁদের নিকট নেতিবাচক দিকটা একেবারেই গৌণ।

কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ ক্লাইয়েন্টের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেই শুধু সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, ক্লাইয়েন্টের যুক্তিপূর্ণ বিচার-বুদ্ধির যাতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে সে দিকেও তাকে প্রণোদিত করেন এবং এই সমৃদ্ধির প্রণোদনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 'ক্লাইয়েন্ট-কাউন্সেলার সম্পর্কের যথাযথ ভিত্তি স্থাপনের উপর।

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া উন্নতমানের পারস্পরিক মানবিক সুসম্পর্করূপ। 'কাউন্সেলিং পরিবেশ' প্রতিষ্ঠার উপর যেহেতু নির্ভরশীল তাই কাউন্সেলার হবেন কাউন্সেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই পরিবেশ উদ্ভাবনে ও প্রতিস্থাপনে একজন সক্ষম শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। এই 'পরিবেশ' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য চাই কাউন্সেলীর সঙ্গে কাউন্সেলারের সমানুভূতি (Empathy)। সমানুভূতির অর্থ হল কাউন্সেলীর ব্যক্তিগত জগতের সঙ্গে কাউন্সেলারের একাত্মতা। অর্থাৎ কাউন্সেলীর সমস্যাটা যদি কাউন্সেলারের হতো তা'হলে কাউন্সেলারের প্রত্যক্ষণ (perception), অনুভূতি ও আবেগ (feeling and emotion) এবং এই আবেগের বহিঃপ্রকাশই বা কিরকম হবে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা। একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। ধরা যাক কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়ালো এবং ব্যক্তিটি বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো এবং একদল লোক এসে তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। এক্ষেত্রে যদি এই একদল লোকের মধ্যে অতীতে বিষধর সাপের কামড় খাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে কোন ব্যক্তির তাহলে বর্তমানে সাপের কামড়ে যন্ত্রণারত ব্যক্তিটির সঙ্গে তার হবে সমানুভূতি। কেননা সাপের বিষের কী যন্ত্রণা তা সে অতীতে উপলব্ধি করেছে। আর বাকী যত লোক এই একদল লোকের মধ্যে আছে তাদের হবে বর্তমানে সাপেকাটা ব্যক্তিটির জন্য সহানুভূতি (Sympathy)। কাউন্সেলারের কাউন্সেলীর সঙ্গে এই সমানুভূতি বা একাত্মতাই কাউন্সেলিং-এ সফলতার চাবিকাঠি।

৬.৪ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য (Relationship and Differences between Guidance and Counselling)

কাউন্সেলিংকে গাইডেন্সের হৃদয় (Heart) বলা হয়ে থাকে। গাইডেন্সেরই একটা বিশেষ কৌশল বা টেক্‌নিক্ হল কাউন্সেলিং। গাইডেন্স হল সাধারণ এবং কাউন্সেলিং হল এই গাইডেন্সের সাধারণরূপের একটা বিশেষ রূপ। গাইডেন্স হল একটা জেনেরিক টার্ম (Generic term) এবং কাউন্সেলিং হল একটা স্পেসিফিক টার্ম (Specific term)। এই জেনেরিক টার্ম ও স্পেসিফিক টার্ম একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। যেমন 'রং' হল একটা জেনেরিক টার্ম এবং রং-এর মধ্যে 'লাল রং' হল একটা স্পেসিফিক টার্ম। অর্থাৎ 'রং' বললে সব রংকেই বোঝায়। কিন্তু 'লাল রং' বললে একটা বিশেষ রংকে বোঝায়, লাল ব্যতীত অন্য কোন রং-কে বোঝায় না। এই 'সব' ও 'বিশেষ' এই দুটো শব্দের মধ্যেই গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর

পার্থক্যের মূলসূত্র বিদ্যমান। অর্থাৎ সব কাউন্সেলিং-ই গাইডেন্স কিন্তু সব গাইডেন্স কাউন্সেলিং নয়। কাউন্সেলিং হল একটা 'বিশেষ' গাইডেন্স।

গাইডেন্স কোন রকম পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ছাড়াই হতে পারে কিন্তু কাউন্সেলিং অন্ততঃ দু'জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ব্যতীরেকে হতে পারে না। যেমন একজন কাউন্সেলার ও একজন ক্লাইয়েন্ট। গাইডেন্স পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ছাড়া হতে পারে এই কারণে বললাম যে একটা বই পড়েও আমরা নিজেদের গাইড করতে পারি। যেমন ট্যুরিস্ট গাইডবুক দেখে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজেরাই অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া পরিচালিত বা গাইডেড্ (Guided) হতে পারি। এখানে বইটি গাইড হিসেবে কাজ করলো। বইতো কোন ব্যক্তি নয়। তাই পারস্পরিক সাক্ষাৎকার হল না।

শিক্ষা সংক্রান্ত, চাকুরী সংক্রান্ত, বিবাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার 'গাইডেন্স' বই বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক চিকিৎসারূপ গাইডেন্স কাউন্সেলারের সঙ্গে অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে 'গাইডেন্স' হয়ে যাবে 'কাউন্সেলিং'।

মোদ্দা কথা হল যেখানে মুখো-মুখি সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন সেখানেই গাইডেন্স হয়ে পড়বে কাউন্সেলিং। মানসিক সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত সব গাইডেন্সই কাউন্সেলিং যেহেতু এক্ষেত্রে কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দরকার। মানসিক সমস্যা বলতে আমাদেরকে বুঝতে হবে এমন যে কোন সমস্যা যা নিজে নিজে সমাধান করা ক্লাইয়েন্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই জন্যই গাইডেন্সের সত্যিকারের স্বরূপ হল কাউন্সেলিং। এবং এই জন্যই সব মনোবিদ্ই একবাক্যে স্বীকার করেন কাউন্সেলিং-ই গাইডেন্সের হৃদয় বা হার্ট।

৬.৫ কাউন্সেলিং-এর মৌলিক নীতিসমূহ (Basic Principles of Counselling)

নীচে কাউন্সেলিং-এর মৌলিক নীতিসমূহের উল্লেখ করা হল :

১। **গ্রহণ (aceptance)**—কাউন্সেলিং-এর সমস্ত প্রবক্তারাই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ক্লাইয়েন্টকে রোগী হিসেবে নয় একজন মানুষ হিসেবে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে গ্রহণ করে নিতে হবে। অন্যথায় কাউন্সেলিং ফলপ্রসূ হবে না।

২। **পারস্পরিক সম্পর্কের অনুমোদন (permissiveness)**—কাউন্সেলিং-এর সমস্ত প্রবক্তারাই ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলারের সম্পর্ককে সফল কাউন্সেলিং-এর ভিত্তি হিসেবে অনুমোদন করেন। ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলারের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত না হলে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়, কাউন্সেলিং-এ সফলতা তো দূরের কথা।

৩। **শিখন (learning)**—শিখন ব্যতীত কাউন্সেলিং সম্ভব নয়। ক্লাইয়েন্টকে সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেতে নিজের সম্পর্কে ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব শিখতে হবে। কাউন্সেলার প্রদত্ত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত নির্দেশ শেখার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার নতুন

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ক্লাইয়েন্ট নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারে। কাউন্সেলার-ক্লাইয়েন্টকে শুধু তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সমস্যার মূল কারণটি উদঘাটনে সহায়তা করেন। সমস্যার মূল কারণ জানা হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যায়।

৪। **ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহচিন্তন (thinking with client)—**ক্লাইয়েন্টের জন্য নয় ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সমানুভূতির মাধ্যমে সহচিন্তন কাউন্সেলিং-এর চতুর্থ মৌলিক নীতি। সমানুভূতির (empathy) মাধ্যমে সহচিন্তন ক্লাইয়েন্টের সমস্যার মূল কারণ বার করার বিশেষ সহায়ক। সহচিন্তনই সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ এবং এটিই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

৬.৬ কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপী (Counselling and Psychotherapy)

কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপীকে প্রায়শই সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুত এই দুটো সমার্থক নয়, এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। নীচে কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপীর মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্যের উল্লেখ করা হল :

কাউন্সেলিং	সাইকোথেরাপী
১। এটা হল সংক্ষিপ্ত সাইকোথেরাপী এবং এটা রজার্স, এলিস্ ও আরও অনেক মনোবিদ প্রবর্তিত ক্লাইয়েন্টের কোন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি।	১। সাইকোথেরাপী হল ক্লাইয়েন্ট ও সাইকোথেরাপীষ্টের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লাইয়েন্টের দৈহিক ও মানসিক উপসর্গগুলি দূর করার কিংবা ক্লাইয়েন্টের বিপর্যস্ত অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক সুবিন্যাস্ত অবস্থায় ফিরিয়ে এনে ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির পদ্ধতি বিশেষ।
২। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন চাকুরীতে বা পরিবারে ক্লাইয়েন্ট নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অসমর্থ হলে কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন। ধরা যাক কোন ক্লাইয়েন্টের আবেগ সংক্রান্ত সমস্যা আছে। কিন্তু সে এল শুধুমাত্র চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। এক্ষেত্রে আবেগ সংক্রান্ত সমস্যা দূর না করেও শুধুমাত্র চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার জন্য কাউন্সেলিং প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ ক্লাইয়েন্টের সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা না করে কাউন্সেলিং ক্লাইয়েন্টের বিশেষ কোন সমস্যাকে (যা ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলারের নিকট সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়) সমাধানে নিয়োজিত হতে পারে।	২। সাইকোথেরাপীষ্ট ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক কাঠামোটির পরিমার্জিত রূপরেখা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এবং ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের কোন প্রলক্ষণ বা দিকের সমস্যার কথা ভাবেন না বা এই বিশেষ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন না; চেষ্টা করেন ক্লাইয়েন্টের যত সমস্যা আছে সবকটা দূরীকরণের অর্থাৎ তিনি ভাবেন ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স শব্দটির অর্থ কোন নির্দিষ্ট পথে অন্য একজন দিশাহীন মানুষকে পরিচালিত করা। যাঁর গাইডেন্স দরকার এবং যিনি গাইডেন্স দিতে সক্ষম এই দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক তথ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে একটি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার নাম গাইডেন্স। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এই সাহায্য অধিকাংশ মানুষের জীবনে অপরিহার্য। গাইডেন্সের বিচার করা হয় দুটি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী—দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের প্রেক্ষাপট এবং আর একটি উপস্থিত বা তাৎক্ষণিক কোন লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল তার ভিত্তিতে।

কাউন্সেলিং ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমস্যা ভিত্তিক এবং সমাধানমূলক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের সাহায্যকারী ব্যক্তি কাউন্সেলর এবং যিনি সমস্যার নিরসনের জন্য সাহায্য গ্রহণ করেন তিনি হলেন ক্লাইয়েন্ট বা কাউন্সেলী। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে গৃহীতা ও দাতা এইভাবে দেখা হয় না। ক্লাইয়েন্টের সক্ষমতাকে কখনও ছোট করে দেখা হয় না। এক্ষেত্রেও বিচার বুদ্ধি, পারস্পরিক আলোচনা, তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে তার নিজের সমস্যা নিজেই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। বাইরে থেকে অন্যের সমস্যা সমাধান করা যায় না, এর জন্য দরকার সহমর্মিতা ও বোঝাপড়া। কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া হলেও পরস্পর সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত নয়।

কাউন্সেলিং এর মূলনীতিগুলি হল গ্রহণ, পারস্পরিক সম্পর্কের অনুমোদন, শিখন এবং ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহচিন্তন। কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি প্রক্রিয়া এক নয়। কাউন্সেলিং-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি রজার্স, এলিস্ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেন। সাইকোথেরাপীর উদ্ভব প্রধানত ফ্রয়েডের তত্ত্ব থেকে। কাউন্সেলিং হল সাইকোথেরাপীর সংক্ষিপ্ত রূপ কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের তথ্য ও একই ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে।

৬.৮ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের সংজ্ঞা দিন।

(খ) কাউন্সেলিং কাকে বলে?

(গ) ক্লাইয়েন্ট কাকে বলে?

(ঘ) গাইডেন্সের সার্থকতা বিচারের ভিত্তি কি?

(ঙ) সমানুভূতি কি?

(চ) কাউন্সেলিং কে ক্লাইয়েন্ট কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?

(ছ) সাইকোথেরাপী কাকে বলে?

(জ) কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে রজার্স-এর ভূমিকা কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর সংজ্ঞার তুলনা করুন।

(খ) বর্তমান যুগে গাইডেন্স অপরিহার্য কেন?

(গ) কাউন্সেলিং, কাউন্সেলর ও কাউন্সেলী এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঘ) কাউন্সেলিংকে মানবিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?

(ঙ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর সম্পর্ক কোথায়?

(চ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর পার্থক্য কি?

(ছ) কাউন্সেলিং-এ গ্রহণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক অনুমোদন কথার অর্থ কি?

(জ) কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর প্রধান প্রধান পার্থক্য কি?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের সংজ্ঞা লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্যগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(খ) কাউন্সেলিং-এর মূল নীতিগুলি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন। এই নীতিগুলি কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে অপরিহার্য কেন?

(গ) কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৭ ❒ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধাপ (Steps in Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৭.১ সূচনা

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ গাইডেন্সের ধাপ

৭.৩.১ তথ্য সংগ্রহ

৭.৩.২ তথ্যের বিশ্লেষণ

৭.৩.৩ লক্ষ্য নির্ণয়

৭.৩.৪ লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি

৭.৩.৫ ফলাফল বিচার

৭.৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ

৭.৪.১ সুসম্পর্ক স্থাপন

৭.৪.২ সমস্যা চিহ্নিত করণ

৭.৪.৩ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

৭.৫ কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানে ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়

৭.৬ সারসংক্ষেপ

৭.৭ প্রশ্নাবলী

৭.১ সূচনা (Introduction)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর প্রাথমিক ধারণা লাভের পর জানা দরকার এর পদ্ধতিগত দিক। বিভিন্ন ধরনের গাইডেন্সের ক্ষেত্রে এবং পরামর্শদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। সেইমত ধাপ

বা কার্যকর্মের মধ্যেও পরিবর্তন হয়। সেজন্য এখানে গাইডেন্স বা নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের প্রধান ধাপগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে কিছু নৈতিক প্রশ্নও থেকে আলোচনা করা হল।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স প্রক্রিয়ায় যে ধাপ বা কার্যক্রম অনুসরণ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুরূপভাবে কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের ধাপগুলিও বর্ণনা করতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে যে সব নৈতিক সমস্যা যুক্ত আছে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.৩ গাইডেন্সের ধারা বা স্তরসমূহ (Steps in Guidance)

গাইডেন্সের কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় বা স্তর আছে। এইগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৭.৩.১ তথ্য সংগ্রহ (Collection of information)

(ক) ব্যক্তির শারীরিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত খবরাখবর অতি যত্ন সহকারে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে হবে। দেখতে হবে শারীরিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সব তথ্যই যেন সংগৃহীত হয়। কোন তথ্যই যেন বাদ না পড়ে।

(খ) ব্যক্তির পারিবারিক তথ্য ও পারিবারের মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা অর্থাৎ Sociogram পেলে তা যত্ন সহকারে সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) ব্যক্তির পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে।

(ঘ) ব্যক্তি যদি বর্তমানে পড়ুয়া হয় তাহলে তার স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) ব্যক্তির পেশা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(ছ) ব্যক্তির সঠিক মানসিক গঠন জানার জন্য তার বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, আগ্রহ, মনোযোগ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি তথ্য মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার সাহায্যে অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

৭.৩.২ তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of Information)

শিক্ষা নির্দেশনা (Educational Guidance), বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational Guidance), স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) ইত্যাদি ভিন্ন প্রকারের নির্দেশনার জন্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের তথ্য দরকার হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সাধারণ ও আবশ্যিক তথ্য হল নির্দেশনা প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য। এইসব তথ্য, যেমন, শারীরিক তথ্য (উচ্চতা, ওজন, দৈহিক পরিমাপ ইত্যাদি), মানসিক তথ্য (বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি), শিক্ষাগত তথ্য (পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর ও পরপর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হ্রাস বৃদ্ধি), বিশেষ তথ্য (কোন বিশেষ পারদর্শিতা, প্রতিভা দক্ষতা, কোন সহজাত ত্রুটি), চিকিৎসামূলক তথ্য (দৃষ্টি, শক্তি ও শ্রবণের তীক্ষ্ণতা, থ্যালাসেমিয়া বা অনুরূপ কোন দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি), সংগৃহীত হলে ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সুযোগ সুবিধা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মাপকাঠি, আর্থিক প্রয়োজন, ইত্যাদি অথবা বৃত্তির যোগ্যতা, সুযোগ সুবিধা, ভবিষ্যত সম্ভাবনা, এই জাতীয় অনেক তথ্য নির্দেশদাতাকে সংগ্রহ করতে হয়। এই দুই প্রকার তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা স্থির করার জন্য দরকার প্রাপ্ত তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও মেলানো (matching)। এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ।

৭.৩.৩ লক্ষ্য নির্ণয় (Selection of the Goal)

যখন কোন ব্যক্তি নির্দেশনার জন্য আসেন, তখন তিনি নিজেও জানেন না তাঁর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লক্ষ্য কোনটি। কারণ তিনি নিজেও তাঁর সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পারেন না বা সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। এইজন্য পূর্বোক্ত ধাপে যে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে দিয়ে নির্দেশনাদাতা এক বা একাধিক বিকল্প লক্ষ্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য চিহ্নিত করেন। তারপর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ধাপটি সেইজন্য লক্ষ্য নির্ণয়ের ধাপ।

৭.৩.৪ লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি (Preparation for achieving the goal)

শুধুমাত্র লক্ষ্য স্থির করে দিলহৈ নির্দেশনাদাতার কাজ শেষ হয় না। ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করাও তাঁর অন্যতম কাজ। যদি লক্ষ্য ঠিক হয় যে তথ্য প্রযুক্তিই কোন ছাত্রের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পাঠ্য বিষয় তবে নির্দেশনাদাতাকেই জানাতে হবে কোথায় কোথায় তথ্যপ্রযুক্তি পড়া যাবে, সেখানে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি কি, এবং তারজন্য কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার হবে? এই বিষয়গুলির উপর নির্দেশনার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এমন কোন

লক্ষ্য নির্ণয় করা হল যা ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু তা অর্জন করার সুযোগ নেই বা ব্যক্তির পক্ষে তার সমস্ত শর্ত (যেমন, আর্থিক ব্যয়-ভার) পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে সেই নির্দেশনার কোন মূল্য নেই। প্রস্তুতি পর্বে এই সমস্ত প্রসঙ্গই বিবেচ্য।

৭.৩.৫ ফলাফল বিচার (Follow up)

ফলাফল বিচার কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ফলাফল লক্ষ্য করে নির্দেশনার সাফল্য অসাফল্য বিচার। পূর্বোক্ত উদাহরণে যদি দেখা যায় তথ্যপ্রযুক্তি পড়তে যেয়ে নির্দেশনা গৃহীতা আর আগ্রহবোধ করছে না, বা ফলাফল খারাপ করে ফেলছে তবে বুঝতে হবে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে। যদি বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ ব্যক্তি যদি একজন সফল তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্ হিসাবে কর্মরত, তখন ধরে নিতে হবে নির্দেশনা সঠিক ও সার্থক।

৭.৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ (Steps in Counselling)

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে কয়েকটি স্তরে বিন্যাস করা যেতে পারে। যদিও বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী মনোবিদ্ কাউন্সেলারগণ নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে চলেন তবে কাউন্সেলিং-এর নিম্নলিখিত ধাপসমূহ সম্বন্ধে এঁরা একবাক্যে সহমত পোষণ করেন। এই স্তর বা ধাপগুলো হল—

১। সম্পর্ক স্থাপন (relationship establishment)

২। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান (problem identification and exploration)

৩। সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা (Planning for problem solving)

৪। সমাধানের প্রয়োগ ও কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা (Solution application and termination)

৭.৪.১ সুসম্পর্ক স্থাপন (Relationship Establishment)

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা সম্ভব। এই সম্পর্ক হল সাহায্য প্রদানের সম্পর্ক। কাউন্সেলার সাহায্য প্রদান করবেন এবং ক্লাইয়েন্ট এই সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রথম সাক্ষাৎকারের কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে বুঝিয়ে দেবেন যে এই সম্পর্ক হল পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস ও অবাধ মতামত প্রকাশের সম্পর্ক; এখানে ভয় উদ্বেগ ও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের কাউন্সেলার বুঝিয়ে দেবেন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি কী এবং কীভাবে এগোবে।

এই সম্পর্কের ভিত্তি হল শর্তবিহীন ইতিবাচক সম্মান, নিখুঁত সমানুভূতি ও অকৃত্রিমতা। কাউন্সেলার কোন শর্ত ছাড়াই সম্মান করবেন ক্লাইয়েন্টকে, তার সঙ্গে হবে তাঁর সমানুভূতি এবং তিনি ক্লাইয়েন্টের নিকট হবেন অকৃত্রিমতার প্রতিমূর্তি।

সম্পর্কটি আগেভাগেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কেননা এই সম্পর্কের মাধ্যমেই জানা যাবে ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিতে আদৌ যোগ দেবে কি না কিংবা এতে যুক্ত হলেও তা চালিয়ে যাবে কি না।

প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষাৎকারগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সুসময় ও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন।

(খ) ক্লাইয়েন্টকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ও তাতে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব কী তা পরিষ্কার করে বোঝানো।

(গ) কথোপকথন যাতে নির্বিঘ্নে ঘটে তাতে ক্লাইয়েন্টকে সহায়তা।

(ঘ) ক্লাইয়েন্ট কেন কাউন্সেলিং-এর জন্য তা সুচারুরূপে চিহ্নিতকরণ।

(ঙ) কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় ক্লাইয়েন্টের বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি যে সমস্ত পরিমাপের দরকার হবে তার জন্য ক্লাইয়েন্টকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা।

ক্লাইয়েন্টের উদ্দেশ্য—

(ক) কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে বুঝে নেওয়া এবং তাতে তার দায়দায়িত্বই বা কী তাও বুঝে নেওয়া।

(খ) কেন কাউন্সেলিং দরকার তার কারণগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাউন্সেলারের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেওয়া।

(গ) নিজের মূল্যায়ন ও সমস্যার মূল্যায়নে সহযোগিতা।

৭.৪.২ সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Problem)

সম্পর্ক স্থাপনের পর দ্বিতীয় স্তরে ক্লাইয়েন্টকে তার সমস্যাটা ঠিক কী তা গভীরভাবে চিন্তা করে কাউন্সেলারের নিকট উপস্থাপন অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এই স্তরে ক্লাইয়েন্টের দায়িত্ব যথেষ্ট বেশি। সমস্যার স্বরূপটি যতটা সুন্দর ও সহজভাবে সে তুলে ধরতে পারবে কাউন্সেলারের পক্ষেও তাকে সাহায্য করা ততটাই সহজ ও সুবিধাজনক হবে।

অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণে নিম্নলিখিত স্তরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান—ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে, সমমনস্ক হয়ে সমস্যাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং বিশেষায়িত করে বর্ণনা করা ও চিহ্নিত করা হয়। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার যেন সমস্যাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে একই দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করে।

(খ) সমস্যাটির বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখা—সমস্যাটিকে ভালভাবে বোঝার জন্য যে সব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার সেগুলো এই স্তরে সংগ্রহের উপায় ভাবা হয়। কে, কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে এই তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা যাবে ইত্যাদিরও চিন্তা-ভাবনা করা হয় এই স্তরে।

(গ) তথ্যের সমন্বয়সাধন—এই স্তরে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যসমূহ সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে ক্লাইয়েন্টের সমস্যার স্বরূপটি উদঘাটিত করা হয়।

৭.৪.৩ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

ক্লাইয়েন্ট কেন কাউন্সেলিং-এর জন্য এল এ ব্যাপারে যখন কাউন্সেলার সমস্ত তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হলেন এবং ক্লাইয়েন্টও সমস্যার রূপরেখা বুঝতে পেরে তা সমাধানে তৎপর হল তখন কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের যৌথ উদ্যোগে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা তৈরি হবে।

সমস্যা সমাধানের স্তরসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সম্ভাব্য সকল সমাধানসমূহের চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্তকরণ—ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার ব্রেনস্টর্মিং-এর (brainstorming) মাধ্যমে যতরকম সমাধান সূত্র বার করা যায় তা বার করার চেষ্টা করবেন। অবশ্য ক্লাইয়েন্টকেই এই ব্যাপারে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। সমস্যা সমাধানের সূত্রসমূহ নথিভুক্তকরণের সময় এমন কোন সমাধানসূত্র বাদ দেওয়া চলবে না যা প্রথমদৃষ্টিতে মনে হবে যেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এবং এও লক্ষ্য রাখতে হবে কোন সম্ভাব্য সমাধানসূত্র বাদ গেল কিনা না এবং বাদ পড়ে থাকলে কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে যে সমাধানসূত্রটা বাদ গেল সেটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন সে আদৌ এই সমাধান সূত্রটার কথা ভেবে দেখেছে কি না।

(খ) যে সমাধানসূত্রসমূহের নথিভুক্তিকরণ হল সমস্যার সমাধানে এদের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা—এই স্তরে কাউন্সেলারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্লাইয়েন্ট প্রতিটি সমাধানসূত্র কী প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো যেতে পারে তা খতিয়ে দেখবে। এইভাবে যখন খতিয়ে দেখবে সমাধানসূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রক্রিয়া ক্লাইয়েন্টের নিকট খুব জটিল মনে হবে এবং কিছু সমাধানসূত্র বাস্তবে প্রয়োগ একেবারেই অসম্ভব বোধ হবে। কিন্তু তা হলেও প্রতিটি সমাধানসূত্রের প্রায়োগিক বাস্তবতা খুব যত্ন সহকারে যাচাই করে দেখতে হবে।

(গ) কাঠিন্যের মাত্রানুযায়ী সমাধান সূত্রগুলিকে সহজতম থেকে কঠিনতম ক্রম পর্যায়ে সুসজ্জিতকরণ—(খ)-স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর সমাধান সূত্রগুলির প্রায়োগিক সুবিধা

অনুযায়ী ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলারের পরামর্শ অনুযায়ী সহজতম থেকে কঠিনতম ক্রম পর্যায়ে সুসজ্জিত করবে। সবচেয়ে ভালো সমাধান সূত্র নির্বাচন হয়ে গেলে ক্লাইয়েন্ট এটাকে তার সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই প্রয়োগ করে দেখবে এটা কতটা কার্যকরী। সমাধান সূত্রের প্রয়োগ ও কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা—এই সর্বশেষ পর্যায়ে ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার উভয়ের দায়িত্ব খুবই পরিষ্কার। ক্লাইয়েন্টের দায়িত্ব হল সমাধান সূত্রের যথাযথ প্রয়োগ এবং কাউন্সেলারের দায়িত্ব হল কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা। সমাধান সূত্র প্রয়োগের পরও যদি ক্লাইয়েন্টের সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল না হয় তবে অবশ্য তাকে কাউন্সেলারের সাহায্য আবার নিতে হবে। আর যদি দেখা যায় ক্লাইয়েন্টের আর কোন সমস্যা বর্তমানে নেই তাহলে কাউন্সেলার অবশ্যই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

৭.৫ কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানে ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় (Ethical Issues in Counselling)

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে তা হল : যিনি পরামর্শ প্রদান করবেন অর্থাৎ কাউন্সেলার হিসাবে কাজ করবেন সত্যিই কি তিনি এ কাজের উপযুক্ত? অথবা প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপন করে বলা যায় তিনি কি কাউন্সেলিং-এ নিজেকে নিযক্ত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল কাউন্সেলার এবং ক্লাইয়েন্টের সম্পর্ক যথেষ্ট নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য কি না। এই দ্বিতীয় বিষয়টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ প্রক্রিয়ায় কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা বিদ্যমান কি না।

তৃতীয়তঃ কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কাউন্সেলার কোন কাউন্সেলীকে অন্য কোন কাউন্সেলারের বা বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ নিতে পাঠাবেন এটাও একটা ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়। এটা নির্ভর করবে ক্লাইয়েন্টের এতে কতটা উপকার হবে তার উপর। অন্য কোন কাউন্সেলারের নিকট ক্লাইয়েন্টকে প্রেরণ অবশ্যই সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে হবে এবং ক্লাইয়েন্ট যাতে এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করতে হবে। ক্লাইয়েন্টের কোন সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণে অসমর্থ হলে কাউন্সেলারকে অবশ্যই এমন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা অন্য কোন বিশ্বস্ত কাউন্সেলারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত যিনি সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসনে সমর্থ।

চতুর্থতঃ কাউন্সেলার ও কাউন্সেলীর সম্পর্ক অবশ্যই কাউন্সেলিং বিধি সংক্রান্ত আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই সম্পর্ক কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কে যেন রূপান্তরিত না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং কাউন্সেলারকে মনে রাখতে হবে সম্পর্কটা সম্পূর্ণভাবে পেশাদারী।

পঞ্চমতঃ আর্থিক ন্যায়নীতির অন্তর্গত হল কটা কাউন্সেলিং সেসন (sessions)-এর দরকার হবে, কি কি অভীক্ষাকার্য চালাতে হবে এবং তাতে কত খরচ পড়বে, কখন কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে, কাউন্সেলিং কার্য সমাপ্তির পর আরও কি পরিমাণ তদারকীর (follow up) দরকার হবে ইত্যাদি বিষয়। কোনক্রমেই কাউন্সেলীকে (ক্লাইয়েন্টকে) আর্থিক শোষণের শিকার করা চলবে না।

ষষ্ঠতঃ কাউন্সেলিং ন্যায়নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল এই যে কাউন্সেলিং চলাকালীন যে সমস্ত তথ্যের উদ্ভব হবে সেগুলি যেন গোপন থাকে এবং কোনক্রমেই বাইরের কোন ব্যক্তির গোচরীভূত না হয়। এটা বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে সত্যি যেখানে এই তথ্যের অপব্যবহারের সম্ভাবনা প্রবল।

সপ্তমতঃ কাউন্সেলিং-এ ব্যবহৃত ভাষা হবে মার্জিত, আবেগবর্জিত, বিদ্বেষ বিবর্জিত এবং পক্ষপাতহীন এবং লক্ষ্য রাখতে হবে কোন পরিস্থিতিতেই যেন অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ না করা হয়। আর শারীরিক ভাষা (Body language), অঙ্গভঙ্গী, হাসির বিনিময়, অঙ্গ স্পর্শ ইত্যাদি ক্লাইয়েন্টের কৃষ্টিগত দিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই যেন সুসঙ্গত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

অষ্টমতঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউন্সেলিং যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু (Free and fair) হয় সেদিকে অবশ্যই কাউন্সেলারকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটা কাউন্সেলিং-এ ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রতিটি কাউন্সেলিং সেসনে (session) উপরিউক্ত ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়গুলি যেন অবশ্যই পালিত হয় সে দিকে প্রতিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলারকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং তা হলেই কাউন্সেলিং হবে সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর। পরিশেষে বলবো উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির এ পেশায় ঢোকা একেবারেই নীতিবহির্ভূত ও গর্হিত কাজ।

৭.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স বা নির্দেশনা দান শুরু হয় নির্দেশনা গ্রহীতা সম্বন্ধে তথ্য নথিবন্ধ করার মধ্যে দিয়ে। তার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন, শারীরিক তথ্য, মানসিক তথ্য, শিক্ষাগত তথ্য, বিশেষ তথ্য, চিকিৎসামূলক তথ্য, পারিবারিক তথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দেশনাদাতা ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগসুবিধা, অথবা বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য, অথবা অনুরূপ যে ক্ষেত্রে নির্দেশনাদান করতে হবে সে সম্বন্ধে তথ্য একত্রিত করে একটি উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির করা হয়। এরপর লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নির্দেশনার সার্থকতা বিচার।

কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের ধাপগুলি হল, সম্পর্ক স্থাপন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা। প্রতিটি ধাপ আবার কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত। কিন্তু কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া যেভাবেই পরিচালিত হোক, কিছু কিছু নৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। যেমন, কাউন্সেলারের যোগ্যতা ও দক্ষতা সংশয়াতীত কিনা, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভরযোগ্য কি না, কাউন্সেলিং বিধি কতটা মানা হচ্ছে, গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।

৭.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য শারীরিক তথ্যগুলি কি কি?

(খ) মানসিক তথ্যগুলি কি কি?

(গ) তথ্য বিশ্লেষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

(ঘ) লক্ষ্য নির্ণয় কথাটির অর্থ কি?

(ঙ) সম্পর্ক স্থাপন কেন দরকার?

(চ) কাউন্সেলিং-এ তথ্যগোপন রাখার গুরুত্ব কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য যে সব তথ্য প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(খ) গাইডেন্সের ক্ষেত্রে কেন ও কিভাবে ফলাফল বিচার করা হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) কাউন্সেলরের যোগ্যতা সংক্রান্ত নীতি কি?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) গাইডেন্সের ধাপগুলির নিজস্ব উদাহরণসহ বিস্তারিত বিবরণ দিন।

(খ) কাউন্সেলিং-এর কার্য পরম্পরা বর্ণনা করুন। একটি উদাহরণ দিন।

(গ) কাউন্সেলিং-এর নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন।

একক ৮ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্র (Area of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৮.১ সূচনা

৮.২ উদ্দেশ্য

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র

৮.৩.১ ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং

৮.৩.২ ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং

৮.৩.৩ বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং

৮.৩.৪ পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং

৮.৩.৫ বার্ধক্যজনিত সমস্যায় কাউন্সেলিং

৮.৪ গাইডেন্সের ক্ষেত্র

৮.৪.১ শিক্ষা নির্দেশনা

৮.৪.২ বৃত্তিমূলক নির্দেশনা

৮.৪.৩ অন্যান্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং

৮.৫ সারসংক্ষেপ

৮.৬ প্রশ্নাবলী

৬.১ সূচনা (Introduction)

একদিকে যেমন মানুষের জীবনে বিভিন্ন স্তরে বা বয়সে তার লক্ষ্যগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায় তেমনি অপরদিকে তার জীবনে সমস্যারও অন্ত নেই। সেজন্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিবিষয়কে স্পর্শ করে যায়। এই কারণে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র বিশাল এবং ব্যাপক। কোন

একজন মাত্র বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলর বা গাইডের পক্ষে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দক্ষ নির্দেশনা বা পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক ধরনের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। এই এককে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে পরিচিতি দেওয়া হবে। দেখা যাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, তার উদ্দেশ্য ও সমস্যাই ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে। এই সব ক্ষেত্র সম্বন্ধে আরও কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে নবম ও দশম এককে।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং, ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং ও অন্যান্য কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মিলিত প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র (Areas of Counselling)

কাউন্সেলিং সমস্যাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন এমন কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া সে নিজে সমাধান করতে পারে না, তখন ঐ যৌথ প্রক্রিয়াকে বলা হয় কাউন্সেলিং। কিন্তু সমস্যার প্রকৃতি জীবনের এক একটি ক্ষেত্রে ভিন্নরকম। সুতরাং কাউন্সেলিং-এর ধরনও আলাদা। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৮.৩.১ ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং (Clinical Counselling)

ক্লিনিক কথাটির অর্থ চিকিৎসালয়, এ ক্ষেত্রে পরামর্শকেন্দ্র। ব্যক্তিগত সমস্যাক্রান্ত ব্যক্তি যখন কোন পরামর্শ কেন্দ্রে যান এবং পরামর্শ কেন্দ্রেই কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে তার সমস্যার নিরসন ঘটে তখন তাকে বলা যায় ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথাটির তাৎপর্য একটু ভিন্ন। এমন অনেক সমস্যা আছে

যা চিকিৎসার যোগ্য নয় কিন্তু প্রতিকার না করলে তা চিকিৎসাযোগ্য রোগে পরিণত হতে পারে, সেইগুলিই ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং-এর প্রধান লক্ষ্য। এই সব সমস্যাগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং একজন ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলর যিনি মানসিক ও ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত তিনি কাউন্সেলিং-এর সাহায্যে ব্যক্তিকে তার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। অনেক সময়ই চিকিৎসা (Therapy) ও কাউন্সিলিং একযোগে চলে আবার ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসার পর কাউন্সেলিং অর্থাৎ চিকিৎসা ছাড়াই শুধু কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

উলিয়ামসন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সমস্যা (Personality Problems) প্রধানত ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং এর বিষয়বস্তু। যেমন, মনোযোগহীনতাজনিত সমস্যা (Attention deficiency problem), অর্থাৎ মনোযোগ দানে অক্ষমতা, মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা, মনঃসংযোগের অভাব, মনোযোগের অতি চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ (distraction), বাধ্যবাধকতাজনিত সমস্যা (Obsessive-compulsive problems, অর্থাৎ একই কাজ বার বার করার প্রবণতা, অকারণে হাত ধোয়া, নানা ধরনের অবাঞ্ছিত বাতিক, উদ্বেগ (anxiety), অর্থাৎ অকারণ দুশ্চিন্তা, মানসিক চঞ্চলতা, অহেতুক ভয়, নিদ্রাহীনতা, খাদ্যগ্রহণে অনীহা, অকারণ সন্দেহপরায়ণতা ইত্যাদি অসংখ্য ব্যক্তিগত সমস্যার প্রাথমিক স্তরে একজন ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলর যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে ঐগুলি দূর করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন।

পেপিন্‌স্কী (Pepinsky) ক্লাইয়েন্টদের সমস্যাবলীর শ্রেণিকরণ করেছেন এইভাবে :

১। আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত সমস্যা (Lack of assurance)

২। তথ্যের অভাবজনিত সমস্যা (Lack of information)

৩। কর্মদক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Lack of skill)

৪। পরনির্ভরশীলতার সমস্যা (Dependence)

৫। পছন্দমাফিক নির্বাচনে উদ্বিগ্নতা প্রকাশের সমস্যা (Choice anxiety) এবং

৬। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যা (Self-conflict)।

আবার রবিনসন্ (Robinson) সমস্যার রূপরেখা নির্ধারণে শ্রেণিকরণটি করেছেন এইভাবে—

১। সঙ্গতি বিধানের সমস্যা (Problems of adjustment)

২। দক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Problems of skill) এবং

৩। পরিণমনের অভাবজনিত সমস্যা (Problems of immaturity)।

উইলিয়ামসনের মতে ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় নিম্নলিখিত এই ছয়টি ধাপে :

১। বিশ্লেষণ (Analysis)

২। সংশ্লেষণ (Synthesis)

৩। সমস্যা নিদান (Diagnosis)

৪। সমস্যার গতিনির্দেশ (Prognosis)

৫। কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা (Counselling or treatment) এবং

৬। ফলাফল পর্যবেক্ষণ (Follow up)।

ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি অনির্দেশিত (Non directive)। তবে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণী পদ্ধতি (directive approach), আচরণ পরিবর্তন (behaviour modification) প্রভৃতি পদ্ধতি ও কৌশল এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পদ্ধতিগুলির যে কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ও ব্যবহার করা হয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.৩.২ ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং (Personal Counselling)

ব্যক্তিত্বের সমস্যা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে কোন একজন মানুষকে যে পরামর্শ দেওয়া হয় তাকে বলে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং। যেমন, উইলিয়ামসনের তালিকায়, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা (Educational problems), আর্থিক সমস্যা (Financial problems), স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা (health problems) এবং পেপিন্স্কীয় তালিকায় তথ্যের অভাবজনিত সমস্যা (Problems due to lack of information), দক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Problem due to lack of skill), নির্ভরশীলতার সমস্যা (Problem of dependence-independence) ইত্যাদি সবই ব্যক্তিগত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির উদাহরণ ও পরামর্শ প্রার্থী ব্যক্তির মূল প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য এগুলি কাল্পনিক উদাহরণ।

- শিক্ষার সমস্যা — আমি অঙ্কে কাঁচা, কিছুতেই উন্নতি করতে পারছি না। কিভাবে পারব?
- আর্থিক সমস্যা — নির্দিষ্ট টাকায় কিভাবে ব্যয় কমিয়ে সমস্ত কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে পারব?

- স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা — কিছুতেই ব্লাড-সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করব।
- তথ্যের অভাব — জন্ম অথবা মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন কিভাবে কোথায় করতে হবে?
- দক্ষতার অভাব — কিভাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করব?
- নির্ভরশীলতা — কিভাবে অন্যের উপর নির্ভর করার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারব?

অনেক ব্যক্তিগত সমস্যাই ক্লিনিক্যাল সমস্যা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, ব্যক্তিগত সমস্যা ক্লিনিক্যাল সমস্যা অপেক্ষা অনেক সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়।

৮.৩.৩ বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling)

বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং প্রধানত তিনটি পর্যায়ের জন্য স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। প্রথম, বিবাহের পূর্বে সম্ভাব্য দম্পতির কাউন্সেলিং, দ্বিতীয়, বিবাহের পর দাম্পত্য জীবন মধুরতর ও দৃঢ় করার উপযোগী কাউন্সেলিং এবং তৃতীয়, ভগ্নপ্রায় পরিবারের পুনর্মিলন। যদিও বিবাহের মূল সুরটি হল স্বামী-স্ত্রীর আমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য বন্ধন কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের সাম্প্রতিক ঊর্ধগতি প্রমাণ করছে আমৃত্যু বন্ধনে জড়িয়ে থাকা অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। তবে সব দম্পতিই তো আর বিবাহ-বিচ্ছেদে তৎপর হয় না। বিবাহোত্তর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক দম্পতিকেই বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক দম্পতিই কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের বদলে তাদের সম্পর্কটাকে ঝালিয়ে নিয়ে তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চান। ফলে বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং-এর ভূমিকাটা ঠিক এই ক্ষেত্রেই।

বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং-এর ব্যাপ্তি বিশাল—চিকিৎসা শাস্ত্র, সুপ্রজননবিদ্যা (genetics), মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, আইন, পারিবারিক আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। বৈবাহিক কাউন্সেলারের দায়-দায়িত্ব সুবিস্তৃত। সাংসারিক খরচের বাঁধাবাঁধি পরিকল্পনা (family budget) তৈরি করা থেকে শুরু করে বংশগতির মাধ্যমে কোন দুরারোগ্য ব্যাধির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার বিশ্লেষণ পর্যন্ত এর আওতায় পড়ে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে মনোবিদের দায়-দায়িত্ব বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন (যাতে তাদের মধ্যে মানিয়ে চলার পথ হবে সুগম) এবং বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান। পারস্পরিক বোঝা-পড়ার অভাব ও দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য দরকার হতে পারে স্বামী কিংবা স্ত্রীর অথবা উভয়েরই মনোচিকিৎসা (psychotherapy)। সন্তান-সন্ততির সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক ও তাদের মানুষ করার সমস্যাও বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৮.৩.৪ পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং (Rehabilitation Counselling)

যারা দৈহিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন সমাজে তারা সর্বদাই প্রশংসার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। রুজভেল্ট (Roosevelt) ৩৯ বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হন এবং এর ফলে যদিও তাঁর দুটি পা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে তিনি কিন্তু এই চলচ্ছক্তিহীনতারূপ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। হেলেন কেলার (Helen Keller) যিনি দুবছর বয়স থেকেই মুক ও বধির ছিলেন একজন সফল লেখিকা ও অধ্যাপিকারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিথোভেন (Beethoven) শ্রবণশক্তি হারানোর পরে তাঁর পরম শ্রুতিমধুর ঐকতানবাদন নং ৯ (Symphony No. 9) রচনা করে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেন। ক্লিফোর্ড বীয়ার্স (Clifford Beers) মনোব্যাধি জয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ধরনের আরও অনেকেই আছেন যাদের কাছে প্রতিবন্ধকতা প্রতিপদে হার মেনেছে। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অক্ষমতাকে দূর করে তাদের কর্মক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে যে কাউন্সেলিং তাকেই বলা হয় পুনর্বাসন কাউন্সেলিং। দৃষ্টিহীন, বধির, বিকলাঙ্গ (orthopaedically handicapped), ক্ষীণধী (mentally retarded) প্রভৃতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষম ও উপার্জনশীল করে তোলাই পুনর্বাসন কাউন্সেলিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য দরকার প্রতিবন্ধীদের হীনমন্যতা, নিরাপত্তাহীনতা, নৈরাশ্য, অসহায়তা ইত্যাদির অনুভূতি কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে দূর করা এবং দরকার কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে এদের শিক্ষায় ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তা।

৮.৩.৫ বার্ধক্য-সমস্যার কাউন্সেলিং (Geronotological Counselling)

এক্ষেত্রে কাউন্সেলার বৃদ্ধ বয়সে (সাধারণত যাটোর্ধ ব্যক্তিদের) উদ্ভূত বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রায়শই যুক্ত থাকে একাকীত্ব, অসহায়তা ও আশাহীনতার। বার্ধক্যের অনুষঙ্গ এই ত্রয়ী সমস্যার সমাধান খুবই দরকার। তাছাড়া বৃদ্ধদের প্রজ্ঞামূলক (cognitive), সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক (emotional) সমস্যাগুলির সমাধানও এক্ষেত্রে ভীষণ দরকার।

বিশেষতঃ যারা চাকুরিজীবী ছিলেন অবসর গ্রহণের পর তাদের অনেকেই পেশাগত পরিচয় হারিয়ে আত্মমর্যাদার অভাব বোধ করেন, হীনমন্যতায় ভোগেন এবং অবসর বিনোদনের উপায়ের অভাবে ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অধিকন্তু স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী এবং স্ত্রী বিয়োগে স্বামী শোক-সন্তপ্ত হয়ে পড়লে পাত্র-বিশেষে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কাউন্সেলিং দরকার হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয় bereavement counselling।

৮.৪ গাইডেন্সের ক্ষেত্র (Areas of Guidance)

গাইডেন্সের প্রধান দুটি ক্ষেত্র শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা।

৮.৪.১ শিক্ষা নির্দেশনা (Educational Guidance)

শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনের মাত্রাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করাই শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রেণিকক্ষের শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে তথ্য ও তত্ত্ব অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অনুধাবন ও শিখনে সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরীক্ষায় অসফলতা ও নীচুমানের ফলাফল, পঠনে অনীহা ও আগ্রহের অভাব, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শিখনে পিছিয়ে পড়া প্রভৃতি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হয় শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের মাধ্যমে।

শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্স নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গো যথাযথ পরিচিতির ব্যবস্থা।
- প্রতিভাবান, সৃজনশীল, শিক্ষায় অনগ্রসর ও বিভিন্ন ধরনের শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিতকরণ।
- ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।
- শিখন অক্ষমতার কারণ নির্ণয় ও শিখন অক্ষম শিশুদের অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য প্রদান।
- আগ্রহ ও বিশেষ সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম নির্বাচনে সাহায্য প্রদান।

৮.৪.২ বৃত্তিমূলক গাইডেন্স (Vocational Guidance)

শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের সঙ্গো বিশেষভাবে যুক্ত বৃত্তিমূলক গাইডেন্স। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্বন্ধে সঠিক দিক্ নির্দেশ দেওয়া হয় বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের মাধ্যমে। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর কেবল মেধাই নয়, অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদিরও পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

সব ছাত্র-ছাত্রীই এক রকম হয় না। ফলে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকে। তাদের এই বিভিন্ন ধরনের পছন্দ-অপছন্দ যাচাই করে নিয়ে মেধার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখে তবেই বৃত্তিমূলক গাইডেন্স দেওয়া হয়।

বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পেশা পরিকল্পনা। পেশা পরিকল্পনার প্রথম ধারাই হল তথ্য সংগ্রহ করা, যাকে বলে Occupational Information। সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের কাজ হল সাহায্য প্রার্থীকে নীচের তথ্যগুলি পরিবেশন করা :—

- পেশাটির কাজের ধরন ও দায়িত্ব।
- ঐ ধরনের পেশার সামাজিক গুরুত্ব।
- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মানসিক যোগ্যতা।
- কাজটি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কোন বিশেষ ট্রেনিং-এর চাহিদা।
- পেশাটিতে প্রবেশ করা পদ্ধতি।
- কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতামান প্রয়োজন হয় কিনা, যেমন, দৃষ্টি শক্তি, শারীরিক সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, বাসস্থানের সার্টিফিকেট, নাগরিকত্ব ইত্যাদি।
- কাজের শর্তাবলী ও কাজের সময়।
- কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কি না?
- মাইনে, বোনাস, উপরি রোজগার, প্রোমোশন ইত্যাদি সুযোগ।

স্পষ্টতই বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে কোন কাউন্সেলারের পক্ষেই সব তথ্য মনে রাখা সম্ভবপর নয়। তাই ভোকেশনাল কাউন্সেলাররা বিভিন্ন তথ্যসূত্র, যেমন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও কম্পিউটারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেশা-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন।

মনে রাখা দরকার বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের মূল শ্লোগান হল— 'Right man must be placed to the right job' অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পেশা। তাই পেশা সচেতনতা (Vocational awareness) বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের আবশ্যিক শর্ত।

৮.৪.৩ অন্যান্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং (Other Guidance and Counselling)

এই অংশে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং কথা দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে. কারণ, এখানে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হবে সেই প্রক্রিয়াগুলি একাধারে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুইই। এই ধরনের নির্দেশনা ও

পরামর্শদানের মধ্যে প্রধানতম হল পিতামাতার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Parent guidance and Counselling) ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Health guidance and Counselling)।

● **Parent Guidance and Counselling —** পিতামাতাকে সন্তানের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য অনেক।

প্রথমত, প্রত্যেক মা বাবাই সন্তানের শুভ অশুভ নিয়ে সর্বদা চিন্তিত। সেজন্য সন্তান পালনের জন্য নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান ধারণ ও পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের সঠিক ধারণা থাকে না। এই জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শ তাঁদের জন্য প্রয়োজন হয়। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, শিশু মনোবিজ্ঞানী, বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি এই জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন যার উদ্দেশ্য সন্তান পালন ও সন্তানের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার দক্ষতা অর্জন করা।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যেক মা-বাবা বিশেষভাবে সচেতন থাকেন, তার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন ও ব্যয় করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করেন না। এই বিষয়ে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা ও সংযোগ একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতার অংশগ্রহণের (Parental Involvement) বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত। এই বিষয়ে মা-বাবাকে যে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য তাঁদের শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। এর ফলে, শিক্ষকদের সঙ্গে একযোগে তাঁরা সন্তানের শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন, এবং কোন সমস্যা উপস্থিত হলে যৌথভাবে তার সমাধান করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সন্তানের কোন সমস্যা থাকলে পিতামাতার পক্ষে দক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্য ছাড়া সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন কারণ সন্তানকে ঘিরে তাঁদের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। সন্তানের কোন প্রতিবন্ধীতা, নেশাগ্রস্ততা, অপরাধ পরায়ণতা, মানসিক রোগ, এমনকি বিশেষ বিশেষ দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধির জন্যও মা-বাবার পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

● **স্বাস্থ্য নির্দেনা ও পরামর্শ (Health Guidance and Counselling) —** এই জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ যে কোন বয়সে, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই দরকার হতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, বাসগৃহ ও কর্মক্ষেত্র যে কোন বিষয় বা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বজায় রাখার সঠিক পন্থা অনেকেরই জানা থাকে না। এই বিষয়গুলির জন্য মানুষের নির্দেশনা দরকার হয়। খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্যের অন্যান্য গুণ, সাধারণ রোগ ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার, এই সবই স্বাস্থ্য নির্দেশনার অন্তর্গত।

আবার, অনেক সময় কোন বিশেষ রোগের শিকার হলে মানুষ কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, ইত্যাদির চিকিৎসা, সুব্যবস্থা ও চিকিৎসা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য দরকার হয় পরামর্শ। তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে রোগী ও তার পরিবারের লোকজন প্রায়ই চরম উদ্বেগ, হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ভোগে। তখন তাদের জন্য দরকার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

৮.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিচিত্র। এই জন্য এদের অনেকগুলি ক্ষেত্র আছে। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি ও উদ্দীষ্ট ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয়। ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাধারণ ব্যক্তিত্বের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে দম্পতির দরকার হয় প্রস্তুতিমূলক কাউন্সেলিং। বিবাহের পরে সুখী বিবাহিত জীবনের জন্য ও ক্ষেত্র বিশেষে ভগ্নপ্রায় পরিবারকে রক্ষা করার জন্যও দরকার বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং। বৃদ্ধদের দরকার বার্ধক্যজনিত সমস্যার জন্য কাউন্সেলিং।

গাইডেন্সের দুটি প্রধান ক্ষেত্র শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা। ব্যক্তির সক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে তার জন্য শিক্ষা নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যায় দরকার স্বাস্থ্য নির্দেশনা ও পরামর্শ। উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন ও সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় বৃত্তি নির্দেশনা গ্রহণ। এছাড়া, সন্তানের শিক্ষা, সন্তান পালন ও সন্তানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে পিতা মাতার জন্য দরকার স্বতন্ত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ।

৮.৬ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কাকে বলে?

(ক) নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ক্ষেত্র।

(খ) ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং।

(গ) ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং।

(ঘ) বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং।

(ঙ) পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাউন্সেলিং।

(চ) পিতামাতার জন্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং।

(ছ) স্বাস্থ্য নির্দেশনা।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিংকে ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক বলা হয়েছে কেন? এর একটি উদাহরণ দিন।

(খ) বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাউন্সেলিং কেন ও কখন দরকার হয়?

(ঘ) পিতামাতার অংশগ্রহণ কথাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন এবং উদাহরণ দিন।

(ঙ) শিক্ষার নির্দেশনার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষা নির্দেশনা ও শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত কাউন্সেলিং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র কাকে বলে? কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(গ) পিতামাতার জন্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শদানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

একক ৯ ❒ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ধারা (Approaches of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৯.১ সূচনা

৯.২ উদ্দেশ্য

৯.৩ গাইডেন্সের ধারা

৯.৩.১ গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি

৯.৩.২ গাইডেন্সের প্রধান প্রধান ধারা

৯.৪ কাউন্সেলিং-এর ধারা

৯.৪.১ নির্দেশিত পরামর্শদান

৯.৪.১.১ নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য

৯.৪.২ অনির্দেশিত পরামর্শদান

৯.৪.২.১ অনির্দেশিত কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি

৯.৪.৩ মিশ্র পরামর্শ দান

৯.৪.৪ অন্যান্য ধারা

৯.৫ ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান

৯.৫.১ দলগত পরামর্শদানের প্রক্রিয়া

৯.৫.২ দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের তুলনা

৯.৬ সারসংক্ষেপ

৯.৭ প্রশ্নাবলী

৯.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী তিনটি এককে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং সম্বন্ধে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনে হতে পারে যে এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কথাটা অনেকটা ঠিক। তবে যেহেতু

গাইডেন্স কিছুটা লক্ষ্য কেন্দ্রিক সেহেতু একাধিক ব্যক্তির যদি একই লক্ষ্য থাকে তবে তাদের গাইডেন্স প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। অনেক তথ্যই, বিশেষত শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত গাইডেন্সের ক্ষেত্রে, একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত সমস্যা কেন্দ্রিক সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির কাউন্সেলিং-এ কিছু কিছু বৈচিত্র্য স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়ে যায়। এর কারণ আপাতদৃষ্টিতে দু'জন মানুষের সমস্যা এক রকম মনে হলেও তার মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত পার্থক্য থেকে যায়। অর্থাৎ কোন দু'জন মানুষের সমস্যাই সব দিক থেকে সম্পূর্ণ একরকম হতে পারে না। তাছাড়াও গাইডেন্সের ক্ষেত্রগুলিতে যত বৈচিত্র্যই থাক, মানুষের সমস্যা অসংখ্য এবং তার বৈচিত্র্যও অসীম। এই কারণে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর কয়েকটি ধারা (approach) তৈরি হয়েছে। বর্তমান এককটিতে গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং-এর এই সব ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্সের ধারা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন।
- কাউন্সেলিং-এর ধারা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- নির্দেশিত পরামর্শদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- অনির্দেশিত পরামর্শদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- উভয় প্রকার পরামর্শদানের তুলনা করতে পারবেন।
- মিশ্র পরামর্শদানের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.৩ গাইডেন্সের ধারা

প্রথমেই জানা দরকার ধারা (approach) কথাটির অর্থ কি? ধারা শব্দটি নানা পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের সাহায্যার্থে যা কিছু প্রকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কারণ তার সমস্যা, প্রয়োজন, চাহিদা সবকিছুই আচরণ ও প্রকৃতি নির্ভর। কিন্তু

যেহেতু এই বিষয়ে অনেক ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) আছে সেহেতু কোন একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছুর বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধান করা যায় না। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উৎপত্তি হয় এবং সেইমত ভিন্নতর পদ্ধতি ও প্রকরণ সৃষ্টি হয়। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু কিছু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও সেইসঙ্গে পদ্ধতিগত কিছু কিছু বৈষম্য তৈরি হয়েছে। এইগুলিকেই বলা হয়েছে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা।

অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে গাইডেন্সের অথবা কাউন্সেলিং-এর ধারা কথাটির পরিবর্তে তত্ত্ব (Theory) কথাটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ তত্ত্ব সবসময়ই সঠিক দিক নির্দেশক। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা ভালো যে, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং উভয়ই মনোবিজ্ঞান নির্ভর প্রক্রিয়া। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই নানাভাবে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য কোন আলাদা তত্ত্ব সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা চলে, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মধ্যে দিয়ে মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারাই পরিপুষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক কাউন্সেলিং-এর জনক কার্ল রোজার্সের কথা বলা যেতে পারে। কার্ল রোজার্স প্রধানত ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারীর অনুগামী ছিলেন কিন্তু ফ্রয়েডের তত্ত্বের অনেক কিছুই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব (Personality Theory) গঠন করেন যা মানবাত্মিক তত্ত্ব (Humanistic Theory) নামে পরিচিত হয়। এই তত্ত্ব গঠনে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিল পরামর্শদান (Counselling) জনিত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ, যে কথা বলা হয়েছিল, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব সৃষ্টি না হয়ে, এর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু নতুন তত্ত্ব গঠিত হয়েছে।

যেহেতু ব্যক্তিত্বের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক তত্ত্ব গঠিত হয়েছিল, সেহেতু গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রেও এক একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছিল। Leon Levy বলেছেন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অনেক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ মানুষ ও তার আচরণ এতই জটিল ও বিচিত্র যে তা একটিমাত্র তত্ত্বের কাঠামোতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তা আশা করা যায় না। L. A. Pervin বলেছেন, এই সব তত্ত্বের মধ্যে কোনটি ভুল অথবা কোনটি ঠিক এইভাবে বিচার করা যায় না। সবকয়টি তত্ত্বই মানুষের আচরণের কোনও না কোন দিক সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্ত আচরণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। ঐ সব তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

৯.৩.১ গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical basis of Guidance)

গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে খুব বেশি বিচার বিশ্লেষণ হয়নি। কিন্তু একথা মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে গাইডেন্স প্রক্রিয়ার উপর আচরণবাদী মতবাদের প্রভাব খুবই বেশি। আচরণবাদী তত্ত্বের মূল কথা, (১) বর্তমান আচরণের পরিবর্তন (modification of existing behaviour), (২) নতুন আচরণ আয়ত্ত

করা (acquisition of new behaviour), আর (৩) এই উভয় প্রক্রিয়ারই মাধ্যম উপযুক্ত প্রবলন (reinforcement)। গাইডেন্সের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বৃহত্তর অর্থে গাইডেন্সের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন অথবা নতুন আচরণ আয়ত্ত করাই উদ্দেশ্য।

Melville C. Shaw (1973) গাইডেন্সের সমস্ত সংজ্ঞাকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। সাত ধরনের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল।

1. "Guidance is the part of pupil *personnel service* which is aimed at *maximum self development* of individual potentialities through developing school wise assistance to youth in the personal problems, choice and decisions each must face as he moves towards maturity."
2. 'Guidance is to enable each individual to understand its abilities, interest and personality, *to develop*, as well as, as possible to relate them to his life goals and finally to reach a state of complete and *mature self guide*."
3. "The primary goal of guidance programme is to assist youth in the process of his *identity seeking*".
4. "Guidance is primarily concerned with helping each student towards the higher levels of personal planning *decision making*, and *development* within the context of social opportunities and freedom on the one hand and social realities and responsibilities on the other hand."
5. "*Improved adjustment* is the primary objective of guidance."
6. "Guidance is concerned with helping children to mature in their ability to *profit from instructional efforts* of the school.
7. "Guidance is helping each individual gain insight needed for *understanding* himself, understanding and *adjusting* to society and wisely choosing among *educational* and *vocational apportunities*."

এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য গাইডেন্সের প্রাচীনতম সংজ্ঞাটি (Jones and hand, 1938)

"Guidance......is particularly concerned with helping individuals discover their needs, assess their personalities, develop their life purposes, formulate their plans of action in the service of these purposes and proceed to their realisation."

এই সব সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে গাইডেন্সের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে তার সবগুলি এই অংশের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু গাইডেন্সকে সাহায্য (help), পরিষেবা (service) ইত্যাদি হিসাবে বর্ণনা করলেও, প্রায় প্রত্যেক সংজ্ঞাতেই গাইডেন্সের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুটা ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব উদ্দেশ্য, আত্মবিকাশ (self development), পরিনমন (maturity), আত্মনিয়ন্ত্রণ (self guide), আত্মপরিচয় (self identity), শিখন (Profit from instructional effort) ইত্যাদি উদ্দেশ্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু একটি বিষয় সমস্ত সংজ্ঞাকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেটি হল, শেষ পর্যন্ত গাইডেন্সের মাধ্যমে বর্তমান আচরণ থেকে একটি বিশেষ পর্যায়ের আচরণ সম্পন্ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যেহেতু সকলেই সহায়তা ও পরিষেবার কথা বলেছেন, সেহেতু একথা মনে করা যায় না যে, স্বাভাবিক পরিনমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্ভব। অর্থাৎ, এক কথায়, চেষ্টা ও সাহায্য এই দু'য়ের মাধ্যমে আচরণের কিছু পূর্ব নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত পরিবর্তন, যা আচরণবাদী শিখন তত্ত্বের মূল কথা।

এই কারণে, মনে হয়, গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি আচরণবাদ।

৯.৩.২ গাইডেন্সের প্রধান প্রধান ধারা (Main Approaches of Guidance)

ব্যাপকতর অর্থে গাইডেন্সের সূত্রপাত মানবজীবনের শৈশবে। শৈশবে পিতামাতা, আরও একটু বড় হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আরও পরে গাইডেন্স বিশেষজ্ঞ বা অনুরূপ কোন ব্যক্তির নির্দেশনা মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এইসব বিচার করলে দেখা যায় গাইডেন্সের প্রধান তিনটি ধারা এই প্রক্রিয়ার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি ধারা প্রধানত তিনটি মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে।

● **আদর্শবাদী ধারা (Idealistic Approach) —** আদর্শবাদী ধারা, আদর্শবাদী দর্শনের মতই চরম ও সর্বজনীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। মানুষের জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার অন্তিম লক্ষ্য ঐ সর্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হওয়া। সুতরাং গাইডেন্সের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে যে নির্দেশনা দান করা হবে তার উদ্দেশ্যও একজন মূল্যবোধ যুক্ত মানুষকে তৈরি করার প্রক্রিয়া। কোন মূল্যবোধই বাইরে থেকে মানুষকে পরিচালিত করতে পারে না, প্রয়োজন তার আত্তীকরণ ও নিজস্ব বুদ্ধি, বিচার বোধের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেওয়া। নৈতিক নির্দেশনা (Ethical guidance), মূল্যবোধের নির্দেশনা (Value guidance) প্রভৃতি কথাগুলি আদর্শবাদী ধারা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। শৈশবের নির্দেশনা আদর্শবাদী চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট। তখন বিশেষ লক্ষ্যের চেয়েও সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শৈশবের নির্দেশনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তার সর্বজনীনতা অনেক বেশি। কারণ পিতামাতা বা শৈশবের শিক্ষক শিক্ষিকা বা এই সময় ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। এই পর্যায়ে শিক্ষা ও গাইডেন্স প্রায়ই একাকার হয়ে যায়।

● **প্রকৃতিবাদী ধারা (Naturalistic Approach) —** প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির বিকাশধারার সর্বজনীনতার মধ্যে প্রতিটি মানুষের অনন্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব প্রকৃতিবাদের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার ফলে সর্বজনীন লক্ষ্যকে ব্যক্তির উপযোগী করে তাকে সেই পথে পরিচালিত করাই হল গাইডেন্সের উদ্দেশ্য। এই জন্য শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational Guidance) প্রধানত প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার ফল। শিক্ষার নিম্নস্তরে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি এক মাত্রিক, (Unidimensional)। শুধুমাত্র লক্ষ্যের মান ব্যক্তিবিশেষের সক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা। যেমন, বিদ্যালয়ে পড়ার শেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, সুতরাং লক্ষ্য একমুখি। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় কে কোন পর্যায়ে লক্ষ্য স্থির করবে বা অর্জন করবে তা তার ব্যক্তিগত সক্ষমতার (প্রকৃতি) উপর নির্ভর করে। কোন অতিসক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রের বেলায় উচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য নির্দেশনা দরকার, আবার দুর্বল কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে শুধু উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য হতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা তার দরকার হতে পারে। এই দিক থেকে শিক্ষাগত নির্দেশনা প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা পরিপুষ্ট।

আবার ক্রমশ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি বহুমুখি হতে থাকে। ব্যক্তিগত বৈষম্যও বহুমুখি হয়ে ওঠে। উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে তখন শুধুমাত্র সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্দেশনা অর্থহীন। এই পর্যায়ে নির্দেশনায় প্রয়োগবাদী চিন্তাধারা চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে।

● **প্রয়োগবাদী ধারা (Pragmatic Approach) —** প্রকৃত নির্দেশনা প্রয়োগবাদী চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত। একটু আগেই বলা হয়েছে যে উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর যুক্ত। শিক্ষার্থীর সক্ষমতা এক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্বাচনের একটি অন্যতম মাত্রা। কিন্তু সক্ষমতা ছাড়াও তার ব্যক্তিগত পছন্দ, চাহিদা, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় লক্ষ্য নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই কারণে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational Guidance) অথবা তার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষানির্দেশনা প্রয়োগবাদী ধারা অনুসরণ করে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ব্যক্তিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য সাহায্য করাই নির্দেশকের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) বা অনুরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের নির্দেশনা ও প্রয়োগবাদী নীতি অনুসরণ করে।

গাইডেন্সের পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই তিনটি ধারারই প্রতিফলন ঘটেছে।

৯.৪ কাউন্সেলিং এর ধারা (Approaches of Counselling)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর পার্থক্যসূচক সীমারেখা অস্পষ্ট হলেও এদের মধ্যেকার প্রধানতম পার্থক্য নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত সমস্যা কেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রে। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া বিশেষ সমস্যার মধ্যে

সীমাবদ্ধ, কিন্তু গাইডেন্স ব্যক্তিকে ইতিবাচক লক্ষ্যমুখি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে এবং সাহায্য করে।

কাউন্সেলিং-এর সংজ্ঞাগুলি এই প্রসঙ্গে আর একবার উল্লেখ করা দরকার।

“Counselling provides a relationship in which the individual is stimulated, (1) to evaluate himself and his opportunities, (2) to choose a feasible course of action, (3) to accept responsibility for his choice and (4) to initiate a course of action in line of his choice.” (Froehlich)

(কাউন্সেলিং এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে যা ব্যক্তিকে (১) নিজেকে এবং নিজের সুযোগগুলিকে মূল্যায়ন করতে, (২) সম্ভাব্য একটি কার্যক্রম স্থির করতে, (৩) ঐ কার্যক্রম স্থির করার দায়িত্বগ্রহণ করতে এবং (৪) স্থির করা কার্যক্রম অনুসরণ করতে উদ্দীপিত করে)

এই সংজ্ঞায় পরামর্শদাতাকে (Counsellor) রাখা হয়েছে নেপথ্যে। পরে দেখা যাবে কাউন্সেলিং-এর একটি ধারায় পরামর্শদাতার ভূমিকা প্রকৃতই নেপথ্যচারীর।

আর একটি সংজ্ঞা,

“An emotional exchange (process) in an interpersonal relationship which accelerates the growth of one or both participants is described as counselling (Whitaker)”. অর্থাৎ, — একটি আবেগপূর্ণ পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রক্রিয়া ভিত্তিক সম্পর্ক যা অংশগ্রহণকারী একজনের অথবা উভয়েরই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তাকেই কাউন্সেলিং হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

এখানে পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Smith বলেন, “The counselling process is for the counseller essentially a learning situation. Through counselling, he seeks to identify, understand and accept a nud or problem with the expectation that counselling experience will aid him to make certain necessary choices, plans and adjustments.”

(পরামর্শ গ্রহীতার পক্ষে পরামর্শদান প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি শিখনের পরিস্থিতি। পরামর্শের মাধ্যমে সে (নিজের) একটি চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিত করতে, বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে এই প্রত্যাশায় যে পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কিছু প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, নির্বাচন বা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে।)

আর একটি সংজ্ঞায় Williamson বলেছেন,

“Counselling has been defined as a face to face situation in which, by virtue of

training, skill or confidence vested in him by the other, one person helps the second person to face, perceive, clarify, solve and resolve adjustment problems."

(একটি মুখোমুখি পরিস্থিতিকে দেখাতে অন্য একজন (পরামর্শ গ্রহীতা) ব্যক্তির আস্থা ও নিজের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে, একজন ব্যক্তি (পরামর্শদাতা) তাকে তার সঙ্গতিসাধনের সমস্যা প্রত্যক্ষ করতে, পরিষ্কারভাবে বুঝতে এবং সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধান করতে সাহায্য করে, তাকে বলা হয়েছে পরামর্শদান)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির মাধ্যমে কাউন্সেলিং-এর প্রধান তিনটি ধারা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এই তিনটি ধারা হল, নির্দেশিত পরামর্শদান (Directive Counselling), অনির্দেশিত পরামর্শদান (Non-directive Counselling) এবং মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)।

৯.৪.১ নির্দেশিত পরামর্শদান (Directive Counselling)

এই চিন্তাধারার অপর নাম কাউন্সেলর কেন্দ্রিক পরামর্শদান (Counsellor centred counselling)। এই ধরনের কাউন্সেলিং-এ কাউন্সেলরের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত বেশি। তিনি পরামর্শ গ্রহীতাকে নির্দেশ দেন কি করতে হবে বা কি করতে হবে না। অনেকটা চিকিৎসকের মত, কাউন্সেলর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রশ্ন ও আলোচনার পর সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করে পরামর্শ গ্রহীতাকে নির্দেশ দেন তার করণীয় কি। তিনি একবারে সমস্ত নির্দেশ না দিয়ে ধাপে ধাপে একটু একটু করে পরামর্শ দিতে পারেন, অর্থাৎ একটি নির্দেশের ফলাফল বিচার করে পরবর্তী নির্দেশ দিতে পারেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে।

উইলিয়ামসনের মতে নির্দেশিত পরামর্শদান ছয়টি ধাপে পিরামিডের মত ক্রমোচ্চপর্যায়ে পরিচালিত হয়। এই ছয়টি ধাপ হল।

- **বিশ্লেষণ (Analysis) —** সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সমস্যা সম্পর্কিত নানা তথ্যের বিশ্লেষণ।
- **সংশ্লেষণ (Synthesis) —** বিশ্লেষণের পর অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি বাদ দিয়ে বাকি তথ্য একত্রিত করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা।
- **সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis) —** পূর্বোক্ত সংশ্লেষণের ভিত্তিতে সমস্যাটি সত্যিই কি এবং তার কারণ কি এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- **ক্রমপর্যায় (Prognosis) —** সমস্যার সম্ভাব্য গতি প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করা। অনেক সময়ে নির্দিষ্ট সমস্যাটি প্রাথমিক পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেটি কোন বড় সমস্যার সূচনা হিসাবে দেখা দিতে পারে। পরামর্শদাতা জানেন এর পরবর্তী পর্যায়গুলি কি হবে এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর পদক্ষেপগুলি স্থির করেন।

- **প্রতিকার (Treatment) —** সমস্যার প্রতিকার (Treatment কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ধরলে) করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। বলা বাহুল্য পরামর্শ শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করার জন্য নয় সমস্যার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী তার পরবর্তী সম্ভাবনার নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও দেওয়া হয়।
- **ফলাফল পর্যবেক্ষণ (Follow up) —** প্রতিটি নির্দেশের ফলাফল কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। প্রয়োজন হলে পদ্ধতি বা নির্দেশের পরিবর্তন, না হলে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা নিরসন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরও কিছুকাল পর্যবেক্ষণ বজায় রাখার প্রক্রিয়া।

নির্দেশিত পরামর্শদানের ধাপগুলি বিচার করলে এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৯.৪.১.১ নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Directive Counselling)

প্রথমত, নির্দেশিত পরামর্শদানের প্রক্রিয়াতে পরামর্শদাতার ভূমিকা প্রধান।

দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি ফ্রয়েডীয় মনঃসমক্ষণী মতবাদ। কারণ মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিকারের পন্থা স্থির করা হয়।

তৃতীয়ত, রোগ নির্ণয় বা নিদান (diagnosis) নির্দেশিত পরামর্শদান প্রক্রিয়ার পূর্ব শর্ত। অর্থাৎ আগে রোগ বা সমস্যা নির্ণয় করে পরে তার প্রতিকারের পন্থা স্থির করা হয়।

চতুর্থত, পরামর্শ গ্রহীতার সমস্যা নিজে সমাধান করার উপযোগী পরামর্শদানের পরিবর্তে অনেকটা যেন পরামর্শদাতা নিজেই সমাধান স্থির করে তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন।

পঞ্চমত, পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক কিছুটা বিশেষজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির সম্পর্কের মত। এখানে পারস্পরিক আস্থার পরিবর্তে একমুখি আস্থা বেশি কার্যকর।

সবশেষে, নির্দেশিত পরামর্শদানের কার্যকারিতা নির্ভর করে পরামর্শদাতার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও পরামর্শ গ্রহীতা কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে নির্দেশ পালন করবে তার উপর।

৯.৪.২ অনির্দেশিত পরামর্শদান (Non-directive Counselling)

নির্দেশিত পরামর্শদানের বিপরীত ধারা অনির্দেশিত পরামর্শদান। এই পদ্ধতির অপর নাম মক্কেলকেন্দ্রিক পরামর্শদান (Client Centred Counselling) অথবা এই পদ্ধতির ভিত্তি যে ব্যক্তিত্ব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তদনুযায়ী মানবাত্মিক পরামর্শদান (Humanistic Counselling)। কাউন্সেলিং-এর জনক কার্ল রোজার্স (Carl Rogers) মানবাত্মিক ব্যক্তিত্ব তত্ত্বেরও জনক। তাঁর কাউন্সেলিং ধারাই অনির্দেশিত কাউন্সেলিং নামে পরিচিত। সেজন্য রোজার্সের তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে।

রোজার্সের মতে মানুষ মূলত যুক্তিনির্ভর ও অভিজ্ঞতা নির্ভর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বেড়ে ওঠা একটি সম্পূর্ণ প্রাণী। ফ্রয়েডের তত্ত্বে বলা হয়েছে মানুষ প্রাথমিকভাবে অদস (Id) নিয়ন্ত্রিত অসামাজিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। রোজার্সের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার তত্ত্বের কেন্দ্র বিন্দু আত্মপ্রত্যয় (Self concept)। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। পাঁচটি মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া যায়।

- সক্রিয় প্রত্যক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রত্যক্ষণের প্রতিটি বিষয় ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বুঝে নেয়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার অর্থ সর্বজনীন নয় ব্যক্তি নির্ভর। পরিবেশ থেকে গৃহীত উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার সময় আংশিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে না—একটি সামগ্রিক স্বাধীন প্রতিক্রিয়া করতে সচেষ্ট থাকে। সেজন্য কোন বাইরে থেকে দেওয়া নির্দেশ তার অপছন্দের বিষয়। স্বাধীন সত্ত্বার নির্দেশমত সে প্রতিক্রিয়া করে।
- তার প্রত্যক্ষণজাত অভিজ্ঞতার একটি অংশ নিজের সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সংহত হতে থাকে। এই আত্মবোধ (Self realisation) থেকে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তার অভিজ্ঞতা ও চাহিদার সঙ্গে আত্মবোধের সামঞ্জস্য না থাকলে, সেই সব অভিজ্ঞতা ব্যক্তি বর্জন করে। এই বাছাই পর্বের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয় (Self concept) গঠিত হতে থাকে।
- নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ আত্মপ্রত্যয়কে শক্তিশালী করে। এইগুলি না থাকলে আত্মপ্রত্যয়ের বিকাশ ব্যাহত হয়।
- আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিরোধ দেখা দিলে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা দেখা দেয়।
- ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার বিরোধ মেনে নিতে পারে না। তার ফলে দেখা দেয় উদ্বেগ (Anxiety) এবং এর ফলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার প্রয়োজন হয় কাউন্সেলিং-এর। সুতরাং কাউন্সেলিং ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া।

রোজার্স বলেছেন,

The Counsellor accepts the counsellee as a person with sufficient capacity to deal constructively with all those aspects of life which can potentially come into conscious awareness. This means, the creation of an interpersonal situation in which the material may come into the client's awareness and a meaningful demonstration of the counsellor's acceptance of the client as a person who is competent to direct himself.

অর্থাৎ (১) নিজের সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হলে পরামর্শ গ্রহীতা তাকে নিজের জন্য গঠনমূলকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, (২) পরামর্শদাতা এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তাকে গ্রহণ করেন, (৩)

পরামর্শদান এমন একটি আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া যেখানে (৪) পরামর্শ গ্রহীতাকে সচেতন করার উপাদান ও (৫) পরামর্শদাতার সম্মতি পেলে, (৬) পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিজেকে পরিচালিত করাতে পারে।

সুতরাং অনির্দেশিত পরামর্শদান নির্দেশিত পরামর্শদানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে।

- এখানে পরামর্শদাতার ভূমিকা সহায়কের। তিনি গ্রহীতার সামনে তার সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরেন মাত্র।
- পরামর্শ গ্রহীতা একজন সক্ষম ব্যক্তি তিনি সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারলে নিজেই নিজের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পারেন ও পরিবর্তন করতে পারেন।
- তার দরকার একজন নির্ভর করার, সাহস যোগানোর ও সহৃদয় মানুষ যে সমস্যা থাকার দরুণ তাকে কখনই হীন বা কৃপার পাত্র মনে করেন না।
- কাউন্সেলিং বিশেষ সমস্যা ভিত্তিক হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ও ইতিবাচক করে তোলে। তার ফলে ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়।

এই জন্য Bruce Joyee বলেছেন,

This type of counselling (non-directive counselling) and interpersonal relationship claims of facilitating the individuals reorganization of himslef, so that he will (1) be more integrated and more effective, (2) have more realistic view of himself, (3) be less defensive and more adaptive to new situations and information.

উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ, অনির্দেশিত পরামর্শ,

- প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (পরামর্শদাতা ও পরামর্শ গ্রহীতার মধ্যে),
- এই সম্পর্ক ব্যক্তির (গ্রহীতার) নিজের পুনর্গঠনে সাহায্য করে (সুতরাং পরামর্শদাতার ভূমিকা সহায়কের ভূমিকা মাত্র),
- পুনর্গঠনের ফলে তার ব্যক্তিত্ব আরও সংহত ও কার্যকর হয়ে ওঠে,
- নিজের সম্বন্ধে আরও বাস্তব সম্মত ধারণা গড়ে ওঠে,
- নিজের প্রতিরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষণ কৌশলের (defence mechanisms) কম দরকার হয়, এবং
- নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তার আচরণ আরও অভিযোজনমুখি হয়ে ওঠে।

৯.৪.২.১ অনির্দেশিত কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি (Methods of Non-directive Counselling)

রোজার্সের মতে কাউন্সেলিংকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যায় ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন (Change of personality)। তিনি কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ছয়টি আবশ্যিক শর্তের (Essential Conditions) কথা বলেছেন এবং কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে সাতটি ধাপে (Stages) ভাগ করেছেন।

আবশ্যিক শর্তগুলি নিম্নরূপ,

(ক) পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটি অলিখিত মানসিক চুক্তি থাকবে।

(খ) পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিত্বের গঠন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন অসঙ্গতি থাকবে যা তার উত্তেজনা ও উদ্বেগের কারণ।

(গ) অপরপক্ষে পরামর্শদাতা একজন নিরুদ্বেগ সংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ।

(ঘ) পরামর্শদাতার মনে গ্রহীতা সম্পর্কে নিঃশর্ত শ্রদ্ধা থাকবে অর্থাৎ তিনি তাকে হীন, দুর্বল, সমস্যা জর্জরিত একজন কৃপাপ্রার্থী হিসাবে মনে করবেন না।

(ঙ) পরামর্শদাতা গ্রহীতা সম্বন্ধে সহমর্মিতা মাধ্যমে এমন মানসিক সংযোগ গড়ে তুলবেন যে উভয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারে এবং খোলামেলা ভাবে মানসিক আদান প্রদান করতে পারে।

(চ) পরামর্শদাতা সক্রিয়ভাবে গ্রহীতার প্রতি তাঁর গ্রহণযোগ্যতার মনোভাব, উষ্ম সহৃদয়তা ও বোঝাপড়ার মনোভাব প্রকাশ করবেন।

রোজার্সের মতে এই শর্তগুলি পূরণ হলে তবেই কাউন্সেলিং সফল অর্থাৎ গ্রহীতার ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

১৯৬১ সালে রোজার্স কাউন্সেলিং এর যে সাতটি ধাপ বলেছেন, তা এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রথম ধাপ (Stage I)**

১। পরামর্শগ্রহীতা নিজের সম্বন্ধে জানাতে অনিচ্ছুক এবং শুধুমাত্র প্রাথমিক তথ্যগুলি জানাতে ইচ্ছুক।

২। তার ব্যক্তিগত সমস্যা সম্বন্ধে ধারণাহীন, জানালেও তা মানতে রাজি নয়।

৩। নিজের ধারণায় অনড় ও অনমনীয়।

৪। পরামর্শদাতার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না।

৫। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী, মতামত পরিবর্তনে অনিচ্ছুক এবং পরামর্শের যে কোন গুরুত্ব আছে তাও মানতে নারাজ।

- **দ্বিতীয় ধাপ (Stage II)**
  - ১। নিজের সম্বন্ধে সেই সব তথ্য দিতে শুরু করে যা তার বিবেচনায় ততটা ব্যক্তিগত (Private) নয়।
  - ২। মনে করে সমস্যাটা বাইরের, তার নিজের ভেতরের নয়।
  - ৩। নিজের সমস্যা নিরসনের জন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না।
  - ৪। কাউন্সেলিংজনিত অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে আগেকার মতোই অসংগতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে থাকে।
  - ৫। নিজের মধ্যেকার স্ববিরোধগুলি সম্বন্ধে একটু একটু সচেতন হতে শুরু করে।
- **তৃতীয় ধাপ (Stage III)**
  - ১। নিজের অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করতে থাকে। নিজের বিষয়ে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিচার করতে শুরু করে। কিন্তু নিজের, দুর্বলতাগুলিকে লজ্জাজনক, অস্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য নয় এরকম মনে করতে শুরু করে।
  - ২। নিজের ধারণাগুলি তখনও অনমনীয়, কিন্তু ধারণাগুলি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হতে থাকে।
  - ৩। নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বিরোধগুলি আছে তাকে চিহ্নিত করতে শুরু করে।
  - ৪। নিজের আচরণ পদ্ধতি নির্বাচন যে সঠিক কার্যকর নয় তা বুঝতে পারলেও ভুল পরিপ্রেক্ষিতে বোঝে।
- **চতুর্থ ধাপ (Stage IV)**
  - ১। পরামর্শগ্রহীতা অতীতের আরও অন্তরঙ্গ অনুভূতিগুলি বলতে থাকে কিন্তু বর্তমানের প্রসঙ্গে নয়।
  - ২। তার প্রতিরোধ (খোলাখুলি কথা বলার) অনেকটা জয় করে এবং বর্তমান অনুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করে।
  - ৩। নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা মনে হয় অবিশ্বাস্য। এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে ভাবলে ভয়পায়।
  - ৪। সেজন্য সরাসরি ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করার মনোভাব প্রকাশ করে না।
  - ৫। বর্তমান অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রকৃতি মেনে নিলেও অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানতে চায় না।

৬। কিন্তু পরামর্শদাতার সহৃদয় বোঝাপড়া ও আলোচনায় দ্রুত উন্নতি হতে থাকে।

৭। নিজের দুর্বলতা ও স্ববিরোধ চিহ্নিত করতে পারে, তার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় কিন্তু তখনও কিছুটা দোলায়মান থাকে।

৮। এই পর্যায়ে পরামর্শদাতার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবলে ভয় পায়।

- **পঞ্চম ধাপ (Stage V)**

১। খোলাখুলি অনুভূতি প্রকাশ করে।

২। অতীত ও বর্তমান অনুভূতির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে কিন্তু তখনও কিছুটা অবিশ্বাস, ভয় এবং অস্পষ্টতা থেকে যায়।

৩। ভালোমন্দ সমস্ত অনুভূতিই যে নিজের তা মেনে নেয়।

৪। নিজের সমস্যার দায়িত্ব স্বীকার করে।

৫। সমস্ত স্ববিরোধ ও অসম্পূর্ণতা মেনে নেয়।

৬। আলোচনা আরও খোলাখুলি হয় এবং নিরাময়ের বাধা অপসারিত হতে থাকে।

- **ষষ্ঠ ধাপ (Stage VI)**

১। যে সব গোপন ও ব্যক্তিগত অনুভূতি আগে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছিল, পরামর্শগ্রহীতা সেগুলি তৎক্ষণাৎ এবং স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে।

২। নিজের সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ ইতিবাচক হয়ে ওঠে।

৩। সমস্ত স্ববিরোধ ও অসম্পূর্ণতা দূর হওয়ায়, পরামর্শগ্রহীতা মানসিক ও শারীরিকভাবে স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে।

৪। সমস্যার মুখোমুখি হতে আর ভয় পায় না, নিজেই তার নিরসন করতে পারে।

- **সপ্তম ধাপ (Stage VII)**

১। এই পর্যায়ে পরামর্শগ্রহীতা যে কোন নতুন অভিজ্ঞতার সামনা সামনি হয়ে একজন সক্রিয় ও সংহত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসাবে তার আচরণকে পরিচালিত করতে পারে। পরামর্শদাতার সাহায্য আর দরকার হয় না।

২। অনির্দেশিত কাউন্সেলিং অনেকটা মনঃসমীক্ষণী মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণী মতবাদের মত গ্রহীতাকে প্রায় নিরপেক্ষ রেখে শুধুমাত্র পরামর্শদাতার ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। কারণ মানবাত্মিক তত্ত্বে জন্মের পর থেকেই স্বাধীন সত্তার (Independent self) অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

৯.৪.৩ মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)

কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতিগুলি এক একটি ব্যক্তিত্ব-তত্ত্বকে ভিত্তি করে বিকাশলাভ করেছে এ কথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন, নির্দেশিত কাউন্সেলিং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণী মতবাদ ভিত্তিক, রোজার্সের অনির্দেশিত কাউন্সেলিং মানবাত্মিক তত্ত্ব ভিত্তিক, ইত্যাদি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন কাউন্সেলারের পক্ষে কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের অনুগামী হিসাবে অন্যান্য তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। এবং এই ধরনের একনিষ্ঠতা অবৈজ্ঞানিকও বটে। সুতারং বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাউন্সেলিং-এর ধারা তৈরি হয়েছে তার নাম মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)।

১৯৫৮ সালে English ও English তাঁদের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানের অভিধানে (Dictionary of Psychology) মিশ্র মতবাদ (Eclecticism) সম্বন্ধে বলেছেন—

Eclecticism in theory building is the selection and orderly combination of compatible features from diverse sources and of incompatible theories and systems into a harmonious whole.

অর্থাৎ তত্ত্বগঠনের ক্ষেত্রে মিশ্রমতবাদ হল বিভিন্ন (তত্ত্বের) উৎস থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলিকে বেছে নিয়ে তার সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব গঠন করা। যারা কঠোরভাবে কোন মতবাদ অনুসরণ করার পক্ষপাতী তাঁরা মনে করেন মিশ্রতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কোন তত্ত্ব নয় বিভিন্ন তত্ত্বের জোড়াতালি সংমিশ্রণ। আবার মিশ্রতত্ত্বের পক্ষপাতীরা মনে করেন এককভাবে প্রত্যেকটি তত্ত্বই বড় বেশি অনমনীয়, যা দিয়ে সমস্যা সমাধান করা কঠিন। আসল কথা, মানুষের মধ্যে, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে এত বেশি বৈচিত্র্য বর্তমান যে, কোন একটিমাত্র তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে সেগুলি বেঁধে রাখা যায় না। একাধিক তত্ত্বের সমন্বয় ঘটালে বরং অনেক সহজে সমস্ত মানুষের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়। পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সর্বাংশে সত্যি এবং সেইভাবেই মিশ্র পরামর্শদান পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

Brammer (১৯৬৯)-এর মতে কাউন্সেলিং-এর সমস্ত তত্ত্বও পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো অংশগুলি একত্রিত করে কাজে লাগানোর নাম মিশ্র পরামর্শদান। যদিও তিনি সবচেয়ে ভালো বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেন নি।

মিশ্রপদ্ধতির একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রবর্তক হলেন Thorne (১৯৫০)। তাঁর মতে মিশ্রপদ্ধতি পরামর্শদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাস্তব সম্মত পদ্ধতি। কারণ কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তিনি ছয়টি ধাপে তাঁর পদ্ধতির কার্য প্রণালী বর্ণনা করেছেন।

- সুশৃঙ্খল পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে সমস্যার সঠিক নিরূপণ বা রোগ নির্ণয় করা।

- প্রত্যেকটি কাউন্সেলিং-এর তত্ত্ব, তাদের পদ্ধতি ও মনোচিকিৎসা পদ্ধতি (Psychotherapy) ভালো করে জানা। তাদের সুবিধা, গুণ, দুর্বলতাগুলি, একটির সঙ্গে অপরটির বিরোধ, মিল ইত্যাদি সব কিছু খুঁটিয়ে জানা দরকার।
- সরাসরি ভাসা ভাসা ভাবে রোগ লক্ষণের চিকিৎসা না করে তার কারণগুলি ব্যাখ্যা করা ও বোঝার চেষ্টা করা।
- গ্রহীতার চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এক বা একাধিক পদ্ধতির নির্বাচন করা।
- পদ্ধতির প্রয়োগ ও ফলাফল পর্যালোচনা করে অন্য কোন পদ্ধতিতে আরও ভালো ফল পাওয়া যেত কিনা তারও বিচার করা।
- কাউন্সেলিং-এর ফলাফল বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে পদ্ধতি ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Garfield (১৯৬৯) Thorne-এর পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন, ... one which is comprehensive and organized and which has brought together a variety of methods though it still remains essentially a loosely gathered system (যদিও ঢিলেঢালাভাবে একত্রিত পদ্ধতির সমাহার তবুও থর্নের পদ্ধতি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সংগঠিত পদ্ধতি যার মধ্যে নানা ধরনের পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে।)

৯.৪.৪ অন্যান্য ধারা (Other Approaches)

কাউন্সেলিং-এর অন্যান্য ধারার মধ্যে আচরণবাদী ধারা (Behaviouristic approach) এবং অস্তিত্ববাদী ধারা (Existential approach) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- **আচরণবাদী পরামর্শদান (Behaviouristic Counselling) —** এই ধারার মূল উৎস স্কিনারের প্রবলন তত্ত্ব (Skinner's reinforcement theory)। কিন্তু ব্যক্তিত্ব তথা পরামর্শদানের আচরণবাদী ব্যাখ্যা ও পদ্ধতির জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য Dollard এবং Miller-এর।

  আচরণবাদী মত অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব শিখনের ফল হিসাবে বিকাশ লাভ করে। উদ্দীপক ও আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শৈশব থেকে যেগুলি প্রবলিত হয় সেগুলি মানুষের আচরণে স্থায়ীত্ব লাভ করে। আচরণ সমস্যা, ব্যক্তির মানসিক সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ, ভীতি ইত্যাদি) আসলে ভুল বা অবাঞ্ছিত আচরণ প্রবলিত হওয়ার ফল। সুতরাং উপযুক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবলনের (Positive and Negative reinforcement) সাহায্যে অবাঞ্ছিত আচরণের বিলোপ ও বাঞ্ছিত আচরণ আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াই হল আচরণবাদী পরামর্শদানের মূল কথা। আচরণবাদী চিকিৎসা (Behaviour therapy) ও কাউন্সেলিং-এর মধ্যে কোন পার্থক্য প্রায় নেই। উভয়ক্ষেত্রেই আচরণ পরিবর্তনের (Behaviour modification) মূলনীতি একই। কিন্তু যেহেতু আচরণ পরিবর্তনের পরিকল্পনা, প্রবলন

নির্বাচন, প্রবলনের ক্রমপর্যায় স্থির করা, সবকিছুই কাউন্সেলারের কাজ, যেহেতু ব্যাপক অর্থে আচরণবাদী পরামর্শদানও একপ্রকার নির্দেশিত পরামর্শদান।

- **অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান (Existential Counselling) —** অস্তিত্ববাদী দর্শন ও অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিত্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পদ্ধতির উদ্ভব। অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান প্রকৃতপক্ষে পরামর্শদানের কিছু নীতির সমন্বয় মাত্র।

  - ❖ অস্তিত্ববাদী মত অনুসারে, পরামর্শ গ্রহীতার সমস্যাকে ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখলে হবে না। কারণ একজন মানুষের অস্তিত্ব তার সচল, কর্মময়, সামগ্রিক সত্ত্বার মধ্যে। সুতরাং সমস্যা নয় ব্যক্তিকে জানা দরকার। তার সামগ্রিক সত্ত্বাটিকে বোঝা দরকার।
  - ❖ অস্তিত্বই প্রকৃত সত্য। সেজন্য অভিজ্ঞতা, যা সামগ্রিক সত্ত্বা অংশবিশেষ তার কোন পরিমাপ হয় না। কারণ পরিমাপ করার অর্থ তাকে খণ্ডিত করা। সুতরাং ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যদি সমস্যামূলক হয় তবে তাকে তার সামগ্রিক সত্ত্বা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সবকিছুর সম্মিলিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, বুঝতে হবে।
  - ❖ আধুনিক জীবন যাত্রার ও আধুনিক মানুষের প্রধান সমস্যা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা যার অনিবার্য পরিণতি ভয়, অনিশ্চয়তা, একাকীত্ব ও শূন্যতাবোধ। এ কথা যুব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্যি।
  - ❖ অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবোধ কাটিয়ে মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চেষ্টা করে।
  - ❖ অনেক মানুষ একই পরিবেশে বসবাস করলেও প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জগৎ আছে। পরিবেশের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি, ব্যক্তির নিজস্ব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির কাছে সত্যি। সুতরাং পরামর্শদাতাকে এই দুটি বিষয়কেই বুঝতে হবে।
  - ❖ অস্তিত্ববাদীদের মতে অহং এবং ব্যক্তিসত্ত্বা আলাদা। অহং বাইরের জগৎ নিরপেক্ষ নয়। অন্যদের অনুমোদন, দৃষ্টিভঙ্গী, চাহিদা, ইত্যাদি অহংকে প্রভাবিত করে কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্বা (Self) একটি অখণ্ড ধারণা। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তি সত্ত্বা ও অহং-এর সাযুজ্য ঘটে।
  - ❖ কারণ উদ্বেগের উৎস উপরোক্ত সাযুজ্যের অভাবে অসহায়ত্ববোধ থেকে অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের সংকট সম্বন্ধে একধরনের চেতনা থেকে।

অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান ও তার নীতিগুলি কিছুটা বিমূর্ত কারণ এর ভিত্তি একটি দার্শনিক মতবাদ যা মানুষের জীবন ও জীবনাতীত সবকিছুই স্পর্শ করে যায়। তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান ব্যক্তির অসহায়ত্ববোধ দূর করে, শূন্যতাবোধ (জীবনের সবকিছুই অর্থহীন), অস্তিত্বের সংকটজনিত উদ্বেগ ইত্যাদির নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৯.৫ ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান (Individual and Group Counselling)

যখন যথেষ্ট সংখ্যক পরামর্শদাতার অভাবে চাহিদা অনুযায়ী এককভাবে প্রতিটি পরামর্শগ্রহীতাকে পরামর্শদান সম্ভব হয় না তখন একই ধরনের সমস্যায় একাধিক ব্যক্তিকে একযোগে পরামর্শ দেওয়ার নাম দলগত পরামর্শদান (Group Counselling)। তা ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দলগত পরামর্শদান, সমস্যা নিরসনের কাজকে ত্বরান্বিত করে কারণ, একই ধরনের সমস্যা ও পরামর্শ গ্রহীতাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় তারা শুধুমাত্র পরামর্শদাতার সঙ্গেই নয় নিজেদের মধ্যেও তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে পারে। যেমন, নেশাগ্রস্ত কিশোর কিশোরীদের নেশামুক্ত করার জন্য একযোগে পরামর্শ দিলে, তা যথেষ্ট কার্যকর হয়।

Mahler (১৯৬৯) মনে করেন, পরামর্শ দানের ফলে,

- পরামর্শ গ্রহীতারা অন্যের মতামত জানতে ও বুঝতে পারে।
- অন্যদের প্রতি, বিশেষত যারা আলাদা প্রকৃতির, শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়।
- সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপযুক্ত সামাজিক দক্ষতা (Social Skill) আয়ত্ত হয়।
- দলগত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দরুণ অন্যদের সঙ্গে একাত্মতাবোধ ও সহমর্মিতার বিকাশ হয়।
- একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তাভাবনা, সমস্যা, মূল্যবোধ, ধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা দিতে পারে এবং নিজের কাছেও বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিক্ষার পরিবেশে দলগত পরামর্শদান কতগুলি বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করে।

- কিশোর ছেলে মেয়েদের আত্মপরিচয় লাভ (Identity) ও জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় (যেমন, আমি কে? আমার পরিচয় কি হবে? মানুষের ও আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি)।
- নিজের উপর আরও বেশি আস্থাশীল হওয়া এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণের (Self direction) শক্তি লাভ হয় (যেমন, আমি এই বিষয়টি নিয়ে পড়ব, বা অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ)।
- অন্যের মতামত শোনা, বোঝা এবং নিজের মতামত বজায় রেখেও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা বিকাশ হয়। বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় করতে শেখে।
- একজনের বিশেষ অনুভূতি (প্রক্ষোভজনিত অবস্থা) ও চিন্তা অনুধাবন করার ক্ষমতা বাড়ে। অথবা অন্যভাষায় বলা যায়, নিজের প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বুদ্ধি (Emotional Intelligence) বিকাশ লাভ করে।

- সামাজিক পরিস্থিতিতে সঠিক ও কার্যকর আচরণ করতে শেখে, যা অন্যদের অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে।

৯.৫.১ দলগত পরামর্শদানের প্রক্রিয়া (Process of Group Counselling)

সাধারণত পাঁচটি ধাপে দলগত পরামর্শদান পরিচালিত হয়।

- **দলগঠন (Formation of Group) —** এইটি প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ দলগঠন ঠিকমত না হলে সমস্ত প্রক্রিয়াটিই ব্যর্থ হতে পারে। কাউন্সেলর দলগঠনের জন্য যে সব বিষয়গুলি বিবেচনা করেন তা নিম্নরূপ।

  (ক) কিসের ভিত্তিতে বা কোন কোন শর্ত অনুযায়ী দলের সদস্য নির্বাচন করা হবে। বয়স, সমস্যার সঠিক প্রকৃতি, সমস্যা সৃষ্টির আপাত কারণ, সমস্যার স্থায়ীত্ব, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থান, ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করে দলগঠন করা দরকার। খুব বৈষম্যমূলক দলগঠন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু কিছু বৈষম্য থাকতেও পারে।

  (খ) কতজনকে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটাও বিবেচ্য বিষয়। খুব ছোট বা খুব বড় দল সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়। আবার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী ২-৩ জনের ছোট দলও কার্যকর হতে পারে।

  (গ) বৈঠকের স্থায়ীত্ব ও সংখ্যা স্থির করা দরকার দলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এক একটি বৈঠক কতক্ষণ স্থায়ী হবে এবং কত ঘন ঘন বৈঠক হবে তা পূর্বাহ্নেই স্থির করা দরকার এবং সর্বসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

  (ঘ) দলগঠন মুক্ত অথবা বন্ধ হবে কি না তা আগে থেকেই সর্বসম্মতভাবে স্থির করা দরকার। মুক্তদল অর্থ প্রয়োজন মত পরবর্তী পর্যায়ে নতুন কোন সদস্য যোগ দিতে পারবে বা মাঝপথে কেউ বৈঠকে যোগদান করতে পারবে। বন্ধদল হলে প্রধানতম শর্ত মাঝপথে কেউ ছেড়ে দিতে পারবে না বা নতুন কেউ যোগ দিতে পারবে না।

- **মানসিক সংযুক্তির পর্যায় (Involvement stage) —** প্রথম দিককার অধিবেশনগুলিতে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে দলের প্রতি অনুগত্য ও মানসিক সংযুক্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দল হিসাবে পারস্পরিক আস্থা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রক্ষোভমূলক সংহতি না হলে কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই পর্যায়ে স্থির করা হয়, কিভাবে শুরু করা হবে, কিভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময় পরিচালিত হবে, কাউন্সেলারের ভূমিকা কি হবে (অর্থাৎ, পরিচালকের ভূমিকা, একজন সদস্য মাত্র, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষকের ভূমিকা ইত্যাদি) এই সব।

- **উত্তরণের স্তর (Transition stage) —** প্রকৃত কাউন্সেলিং পর্যায়ের শুরু এখান থেকে. দলের সদস্যরা প্রথমে এক একজন স্বতন্ত্র মানুষ। তারা পরস্পরের সামনে মুখ খুলতে স্বাভাবিক বাধা অনুভব করে (Resistance)। এই বাধা না জয় করতে পারলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্ক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা থেকে একাত্মতার মানসিকতায় উত্তরণ হওয়া প্রয়োজন। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এই উত্তরণ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে।
- **প্রগতির স্তর (Stage of progress) —** এই স্তরে ক্রমশ দলের সদস্যরা নিজেদের সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন নিজেদের দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করা, সমস্যা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়া, ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন, প্রাক্ষোভিক সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একজন সমস্যা মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সক্রিয় সামাজিক মানুষে পরিণত হতে থাকে। আত্মিক উন্নয়নের এই স্তরটিতে দল ও কাউন্সেলার উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।
- **সমাপ্তির স্তর (Stage of rounding up) —** দলগত পরামর্শদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ধীরে ধীরে দলের সদস্যদের আবার স্বাধীন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে জীবন যাপনের জন্য তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার। দলনির্ভরতা কাটিয়ে, সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের জন্য তৈরি হওয়াই এই স্তরের লক্ষ্য।

তবে একথা মনে রাখতে হবে, দলগত পরামর্শদানের পূর্বে ও পরে আবার দলগত প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যক্তিগত পরামর্শদানও প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দলগত পরামর্শদান ও ব্যক্তিগত পরামর্শদান পরস্পর বিকল্প নয়, পরিপূরক।

৯.৫.২ দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের তুলনা (Comparison of Individual and Group Counselling)

দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে।

- **সাদৃশ্য (Similarities)**

  (ক) উভয়ের উদ্দেশ্য একই। উভয় প্রক্রিয়াতেই পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিত্বের সংহতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

  (খ) উভয় ক্ষেত্রে কাউন্সেলর এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেন যেখানে, খোলামেলাভাবে অংশগ্রহণ করে পরামর্শগ্রহীতা নিজেকে উন্মুক্ত করার প্রশ্রয় পায় এবং তার সবকিছুই ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়।

  (গ) প্রতি ক্ষেত্রেই পরামর্শদাতা গ্রহীতাকে নিজের সমস্যা, দুর্বলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করেন এবং প্রত্যেককেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার মত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে সাহায্য করেন।

(ঘ) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সম্পর্কের গোপনীয়তাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়।

- **পার্থক্য (Differences)**

(ক) ব্যক্তিগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। দলগত পরামর্শের বেলায় দলের সদস্যদের মধ্যে সান্নিধ্য বেশি এবং তাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ই প্রধান। অনেক সময়ই, কাউন্সেলারের ভূমিকা শুধুমাত্র একজন সংগঠকের।

(খ) ব্যক্তিগত পরামর্শদানের সময় পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আস্থা ও ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন। দলগত পরামর্শদানের সময় দলগত সংহতি, সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা এই সবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দলের সদস্যরা যত বেশি মানসিকভাবে সংযুক্ত হবে তত তাড়াতাড়ি সমস্যার নিরসন হবে।

(গ) দলগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে কাউন্সেলরের ভূমিকা অনেক বেশি জটিল। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভূমিকার পরিবর্তন হয়। আবার তিনি পর্যবেক্ষক, নিরপেক্ষ ও সংগঠকের ভূমিকায় থাকলেও, পরোক্ষভাবে তার উপর সমস্ত প্রক্রিয়াটির সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

(ঘ) একক বা ব্যক্তিগত পরামর্শদান দলগত পরামর্শদান ছাড়াই সফল হতে পারে। অধিকাংশ সময়ই দলগত পরামর্শদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরামর্শদানও কিছুটা প্রয়োজন হয়।

৯.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা প্রকৃতপক্ষে যে সব মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে তাদের বৈশিষ্ট্যের ধারা। গাইডেন্স বৃহত্তর অর্থে আচরণবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গাইডেন্সের তিনটি ধারা তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। শৈশবের গাইডেন্স প্রক্রিয়া ভাববাদী দর্শনের অনুসারী। শিক্ষা গাইডেন্স অনেকটা প্রকৃতিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। আর উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তিগত গাইডেন্স প্রয়োগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তবে প্রতিক্ষেত্রেই অন্য দার্শনিক মতবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। গাইডেন্সের নানা প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে এই ধারা তিনটির এবং আচরণবাদী মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।

কাউন্সেলিং-এর ধারাগুলির প্রতিফলনও কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞায় লক্ষ্য করা যায়। প্রধান তিনটি ধারা নির্দেশিত পরামর্শদান, অনির্দেশিত পরামর্শদান ও মিশ্র পরামর্শদান। নির্দেশিত পরামর্শদান ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণী মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এখানে পরামর্শদাতার ভূমিকাই প্রধান। এই প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ আছে এবং পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক এক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্কের মত। অনির্দেশিত পরামর্শদান পদ্ধতির জনক কাল রোজার্স। তাঁর পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার ভূমিকা

সহায়ক ও বন্ধুর ভূমিকা। পারস্পরিক সম্পর্ক, গ্রহণমনস্কতা, সহৃদয় সহায়তা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সমস্যাকুল ব্যক্তি নিজেই নিজের দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের শক্তিতেই নিজের ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠিত করতে পারে।

মিশ্র পরামর্শদান এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদানগুলির সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সমস্যা জটিল ও বিচিত্র। কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠ হলে সমস্ত সমস্যার নিরসন হয় না। তখন মিশ্র পদ্ধতি কার্যকর হয়। এই তিনটি ছাড়া আরও অন্যান্য ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আচরণবাদী ও অস্তিত্ববাদী ধারা। আচরণবাদী ধারা স্কিনারের প্রবলন তত্ত্ব ভিত্তিক। অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান মানুষের অসহায়ত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ দূর করে তাকে সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনে উত্তরণ ঘটায়।

যখন একই ধরনের সমস্যাযুক্ত একাধিক মানুষকে একত্রে কাউন্সেলিং করা হয় তখন তাকে বলা হয় দলগত পরামর্শদান। শুধুমাত্র উপযুক্ত কাউন্সেলরের অপ্রতুলতার জন্যই দলগত পরামর্শদান দরকার হয় না। বহুক্ষেত্রেই দলগত পরামর্শদান ব্যক্তিগত পরামর্শদানের চেয়ে দ্রুত ফল দেয়। ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান পরস্পরের বিকল্প নয়, পরিপূরক এবং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

৯.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা কথাটির অর্থ কি?

(খ) মূল্যবোধের নির্দেশনা কোন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ও কেন?

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদান কাকে বলে?

(ঘ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের জনক কে?

(ঙ) মানবাত্মিক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা কি?

(চ) মিশ্র পরামর্শদান কাকে বলে?

(ছ) মিশ্র পরামর্শদানকে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বলা হয়েছে কেন?

(জ) অস্তিত্ববাদী মতে উদ্বেগ কেন সৃষ্টি হয়?

(ঝ) দলগত পরামর্শদানের একটি সুবিধা বলুন।

(ঞ) দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের একটি পার্থক্য বলুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের প্রয়োগবাদী ধারা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিন।

(খ) গাইডেন্সকে কেন আচরণবাদী প্রক্রিয়া বলা হয়েছে।

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(ঘ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) আচরণবাদী পরামর্শদানের উদ্দেশ্য কি?

(চ) দলগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে দল নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। এর প্রধান প্রধান ধারাগুলির ব্যাখ্যা দিন।

(খ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের শর্ত ও পদ্ধতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। মিশ্র পরামর্শদানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ঘ) ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। দলগত পরামর্শদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

একক ১০ ❒ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর জন্য আবশ্যিক তথ্য (Essential Informations for Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

১০.১ সূচনা

১০.২ উদ্দেশ্য

১০.৩ গাইডেন্সের ধারা

১০.৩.১ শারীরিক তথ্য

১০.৩.২ বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য

১০.৩.৩ ব্যক্তিত্ব

১০.৩.৪ শিক্ষাগত তথ্য

১০.৩.৫ অন্যান্য তথ্য

১০.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য

১০.৪.১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ

১০.৪.২ যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য

১০.৪.৩ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

১০.৪.৪ আর্থিক তথ্য

১০.৪.৫ পাঠক্রম ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

১০.৫ বৃত্তিগত তথ্য

১০.৫.১ প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতা

১০.৫.২ নির্বাচন প্রক্রিয়া

১০.৫.৩ আর্থিক ও ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা

১০.৫.৪ বিপদ বিষয়ক তথ্য

১০.৬ অন্যান্য নির্দেশনা বিষয়ক তথ্য

১০.৭ কাউন্সেলিং-এর জন্য বিশেষ তথ্য

১০.৭.১ পারিবারিক তথ্য

১০.৭.২ বিকাশমূলক ইতিহাস

১০.৭.৩ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

১০.৮ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

১০.৮.১ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

১০.৮.২ পরোক্ষ পদ্ধতি

১০.৮.৩ তথ্যের সংরক্ষণ

১০.৯ সারসংক্ষেপ

১০.১০ প্রশ্নাবলী

১০.১ সূচনা (Introduction)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং উভয়ই এমন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার অনেকটাই তথ্য নির্ভর। সঠিক তথ্যের উপর এই দুই প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। গাইডেন্স পরিষেবা (Guidance Service), গাইডেন্স ক্লিনিক (Guidance Clinic), স্কুল গাইডেন্স ক্লিনিক (School Guidance Clinic) অথবা কাউন্সেলিং-এর জন্য ক্লিনিক প্রভৃতি স্থাপন করা সেগুলি পরিচালনা করার উপযোগী সমস্ত আয়োজন করা গাইড বা কাউন্সেলরের অন্যতম কাজ। একটি ক্লিনিক, গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং অথবা উভয় উদ্দেশ্য, যাই হোক না কেন, তার জন্য দরকার হয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, স্থান, আসবাব ও তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে সংগঠিত বহুকর্মী ও বিশেষজ্ঞ সমন্বিত গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং ক্লিনিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এমনকি সঠিক অর্থে স্কুল গাইডেন্স ক্লিনিকের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার মতই। যে সমস্ত ক্লিনিক শহরাঞ্চলে আছে সেগুলি সবই একক ব্যক্তি নির্ভর। অর্থাৎ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদ্ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্লিনিক স্থাপন করেন ও পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই জন্য বর্তমান পাঠক্রমে গাইডেন্স ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন বর্ণনা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টিই সবচেয়ে জরুরি। সেজন্য এই এককটিতে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য আবশ্যিক তথ্য সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

১ ০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য কত রকম তথ্য দরকার হয় তা বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত তথ্য সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- বৃত্তিবিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্যগুলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- প্রতিটি তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৩ ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)

কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের জন্য কতরকমের তথ্য দরকার হয় তার বর্ণনা নিঃশেষে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন মত যে কোন তথ্যই কাউন্সেলর বা গাইড সংগ্রহ করে থাকেন, তার কিছু স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় আবার কিছু কিছু তথ্য বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে গেলে তার সংরক্ষণ করার দরকার হয় না। আবার সমস্ত ব্যক্তি বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সমস্তরকম তথ্য দরকার হয় না। কিছু কিছু তথ্য অনেকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় আবার কিছু কিছু তথ্য শুধুই ব্যক্তি বিশেষের জন্য দরকার। এই সব বিচার করে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং গাইড বা কাউন্সেলরের দক্ষতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার তথ্য সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর দক্ষতার উপর। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার ব্যক্তিগত তথ্যের কথা।

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুইই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত প্রক্রিয়া। নির্দেশনা গ্রহীতা ও পরামর্শ গ্রহীতা এক এক জন মানুষ। তাদের চাহিদা অনুযায়ী গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং-এর পরকিল্পনা, কার্যপ্রণালী, সার্থকতা বা ব্যর্থতার বিচার সব কিছুই আবর্তিত হয়। সুতরাং গাইড বা কাউন্সেলরকে জানতে হয় তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিটি কে এবং তার পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিবরণ কেমন। প্রথমেই শারীরিক তথ্য।

১০.৩.১ শারীরিক তথ্য (Physical Information)

শারীরিক তথ্য সম্বন্ধে প্রধান দুটি প্রশ্ন হল, কোন কোন শারীরিক তথ্য প্রয়োজন এবং ঐ সব তথ্য প্রয়োজন কেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা আগে করে নেওয়া দরকার।

শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নির্দেশনা গ্রহীতার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন করা, লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা হলে সাফল্য অসাফল্য বিচার করা এই তিনটি মূল পর্যায়ে গাইডেন্স প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এমন অনেক পাঠক্রম আছে বা বৃত্তি আছে যেগুলির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদি সাফল্যের অন্যতম শর্ত। যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোন কোন শাখায় মাইনিং সংক্রান্ত পাঠক্রমে শারীরিক সক্ষমতা অন্যতম বিচার্য বিষয় হতে পারে। কারণ ঐ সব পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত ভারি ও কঠোর শারীরিক সক্ষমতার মান নির্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং যদি কোন নির্দেশনা প্রার্থীর লক্ষ্য এমন হয় যেখানে শারীরিক সক্ষমতা যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি তবে নির্দেশকের প্রয়োজন তার শারীরিক তথ্যগুলি জানা।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষ্য কিছু না থাকলেও শারীরিক বিবরণ লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনে দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে জানা দরকার হয় কোন শারীরিক সমস্যা, প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি আছে কি না। কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শারীরিক তথ্যের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

- উচ্চতা, ওজন, স্থূলত্ব (obesity) সম্বন্ধীয় তথ্য।
- ইন্দ্রিয় বিষয়ক তথ্য, যেমন, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ইত্যাদি। দৃষ্টির ক্ষীণতা, অন্ধত্ব, বর্ণান্ধতা (Colour blindness), চশমা থাকলে দৃষ্টিশক্তির মান ইত্যাদি। বধিরতা থাকলে তার প্রকৃতি ও মান।
- রক্ত সংক্রান্ত তথ্য, যেমন, রক্তের গ্রুপ, রক্ত সংক্রান্ত ব্যাধি (থ্যালাসেমিয়া, ক্রনিক এনিমিয়া, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি) থাকলে তার তথ্য। ডায়াবেটিস বা অনুরূপ অন্য কোন সমস্যার বিররণ।
- লিভার, হার্ট, ফুসফুস (যেমন, হাঁপানি), গল ব্লাডার বা অন্য কোন প্রত্যঙ্গের ব্যাধি সম্পর্কিত তথ্য।
- স্নায়বিক বা হাড়ের বিকলাঙ্গতা।

এই সব তথ্যের মধ্যে প্রাথমিক কয়েকটি বিষয় প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু বাকি অধিকাংশ তথ্য তখনই দরকার হয় যখন, তা সরাসরি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য অথবা যখন পরামর্শ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করায় আগ্রহী।

১০.৩.২ বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য (Intellectual Information)

কোন মানুষের জীবনে সাফল্যের পিছনে বুদ্ধির ভূমিকা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেজন্য বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তিন প্রকার বৌদ্ধিক তথ্যের

প্রতি এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, সাধারণ বুদ্ধি (General intelligence) বা সাধারণ সক্ষমতা (General ability), বিশেষ প্রবণতা (Special aptitude) এবং সৃজনশীলতা (Creativity)।

- সাধারণ বুদ্ধি, যা সচরাচর I.Q. এই সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, পরিমাপ করার জন্য আছে নানা ধরনের অভীক্ষা। পরামর্শদাতা সরাসরি অভীক্ষা প্রয়োগ করে I.Q. পরিমাপ করতে পারেন। তিনি অভীক্ষার সাহায্যে জেনে নিতে পারেন তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী স্বাভাবিক, অতিবুদ্ধিমান না ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন। বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সর্বজন বিদিত। সুতরাং গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এই দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজনীয়। প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রায় সমস্ত রকম মানুষের বুদ্ধি পরিমাপ করতে সক্ষম। বাচনিক, অবাচনিক, সম্পাদনী ইত্যাদি নানা ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করে যে সব বিষয়ে নির্দেশনা বা পরামর্শদান করা সহজ হয় তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। এরকম আরও উদাহরণ আছে।

    ১। অনেক সময় অতিবুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীরা অপসংগতি ও সমস্যামূলক আচরণের শিকার হয়।

    ২। অতিবুদ্ধিমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার হয়।

    ৩। কিছুটা ক্ষীণ বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হয় না। তার ফলে, এরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে।

    ৪। সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত বেশি প্রত্যাশা করলে তারা আচরণের সমস্যায় ভোগে।

    ৫। বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম শুধুমাত্র অতিবুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং নির্দেশনার আগে বুদ্ধি পরিমাপ করা দরকার।

এছাড়াও কোন কোন বুদ্ধি অভীক্ষার (যেমন, Wechsler Adult Intelligence Scale) উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করলে অপসঙ্গতির প্রাথমিক লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। তবে নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নির্বিচারে বুদ্ধি পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও গাইড প্রাথমিক তথ্য, কথাবার্তা ও অন্যান্য অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন মত কোন বিশেষ বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ করেন।

- বিশেষ প্রবণতা (Special aptitude) সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন স্পীয়ারম্যান। তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্বে যে s উপাদানের কথা তিনি বলেছিলেন সেখান থেকেই বিশেষ প্রবণতার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির শুরু। সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন বৃত্তি ও শিক্ষা নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা বা বৃত্তি অবলম্বন করলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য অনেক অভীক্ষা নির্মিত হয়েছিল,

যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ Differential Aptitude Test (DAT)। একটি অভীক্ষার (প্রকৃতপক্ষে একটি Test Battery অর্থাৎ অনেকগুলি অভীক্ষার একত্র সমাবেশ) সাহায্যে নানা ধরনের প্রবণতা পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ধারা ও বৃত্তি নির্বাচন করা যায়। বর্তমানে বিষয়টি বিতর্কিত এবং কিছুটা গুরুত্বহীন। এর কারণ অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন প্রবণতা শিশু বয়স থেকে বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়, বুদ্ধিই আসল। বরং অনেকে মনে করেন বহুমুখি বুদ্ধির জন্যই এক একজন ব্যক্তির প্রতিভা ভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে। Gardner প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এই মতের প্রবক্তা।

- সৃজনশীলতা (Creativity) এমন এক ধরনের সক্ষমতা যা বিশেষ বিশেষ মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। এই সক্ষমতা বুদ্ধির চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধি নিরপেক্ষ নয়। সমস্ত মানুষেরই কম বেশি সৃজনশীলতা আছে। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ সৃজনশীলতার পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য দরকার। সেজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্দেশনার সময় সৃজনশীলতা সম্বন্ধে ধারণা নির্দেশককে সাহায্য করে। E.P. Torrance, J.P. Guilford প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা সৃজনশীলতা পরিমাপ করার জন্য নানা অভীক্ষা তৈরি করেছেন। ঐ সব অভীক্ষা অবলম্বন করে আমাদের দেশেও B.K. Passi, Baquer Mehdi প্রমুখরা অভীক্ষা নির্মাণ করেছেন। প্রয়োজন হলে এবং প্রাথমিকভাবে সৃজনশীলতার সম্ভাবনা দেখা গেলে গাইড যে কোন অভীক্ষার সাহায্যে সৃজনশীলতা পরিমাপ করে নিতে পারেন।

১০.৩.৩ ব্যক্তিত্ব (Personality)

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রয়োজনে দরকার হয়।

গাইডেন্সের জন্য ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল (Personality Profile) একজন নির্দেশনা প্রার্থীর সম্ভাব্য আচরণ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে। অধিকাংশ বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল সাফল্যের চূড়ান্ত শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিগত ৬০-৭০ বৎসরে বহু মনোবিজ্ঞানী এই বিষয়টিকেই তাঁদের গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান তথ্য দিতে পেরেছেন। তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন বৃত্তিতে যাঁরা প্রকৃতই সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে, ঐ সব বৃত্তির জন্য আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল তৈরি করেছেন, যেগুলি যারা ঐ সব বৃত্তি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তাদের প্রোফাইলের সঙ্গে তুলনা করে কার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি তা নির্ণয় করার কাজে ব্যবহার করা যায়। গাইডেন্সের ক্ষেত্রে গাইডের কাজ ঠিক এই জায়গায়। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রোফাইল তুলনা করার (Profile matching) উপযোগী বিভিন্ন রাশিবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিও তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। সেজন্য গাইডেন্সের জন্য দরকার সংকলন তত্ত্ব (Trial Theory) ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব উন্মোচনী অভীক্ষা (Personality Inventory) গুলিকে ব্যবহার করা (যেমন, 16 PF Test, Eysenek Personality Inventory ইত্যাদি)।

অপরপক্ষে কাউন্সেলিং-এর জন্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োজন হয় মূলত সমস্যা বা রোগ নির্ণয়ের জন্য (Diagnosis)। ব্যক্তিত্বের অসংগতি বা বিশৃঙ্খলা নির্ণয় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব ভিত্তিক অভীক্ষাগুলি ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশি (যেমন, Rorschach Ink Blot Test, Thematic Apperception Test, Children's Apperception Test, Picture Frustration Test ইত্যাদি)। তবে সংলক্ষণতত্ত্ব ভিত্তিক অভীক্ষাগুলিও এক্ষেত্রে কিছুটা কাজে লাগতে পারে। সুতরাং একজন গাইড বা কাউন্সেলরের অভীক্ষাগুলির ব্যবহার বিধি ও পরিমাপের ফলাফল ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি জানা একান্ত আবশ্যিক এবং ক্লিনিকে অভীক্ষাগুলির সংগ্রহ রাখাও আবশ্যিক।

১০.৩.৪ শিক্ষাগত তথ্য (Educational Information)

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত তথ্যকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলতে হয়, পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধীয় তথ্য। কিন্তু শিক্ষাগত তথ্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আরও অনেকটা ব্যাপক। শিক্ষাগত তথ্য কোন একটিমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ড মাত্র নয়, নির্দেশনার সময়কাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যই শিক্ষাগত তথ্য। যে সব বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা নিচে দেওয়া হল।

- পরীক্ষার ফলাফলের ধারা (Trend) পর্যালোচনা করলে তিন প্রকার শিক্ষার্থী দেখা যায়। একদল ক্রমাগত উন্নতি করে (upward trend), আর একদলের ফলাফল ক্রমশ খারাপ হতে থাকে (downward trend), আর এক দলের ফলাফলের ধারা অনিয়মিত (irregular trend)। এই বিষয়টি নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

- বিষয় ভিত্তিক ফলাফলের ধারা স্বাভাবিকভাবেই এক একটি বিষয়ের বেলায় স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ প্রবণতা সম্বন্ধে কোন অভীক্ষা ব্যবহার না করেও বিষয় ভিত্তিক ফলাফলের গতি প্রকৃতি থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রবণতা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। যে ছাত্র ক্রমাগত অঙ্কের ফলাফল উন্নত করতে থাকে, অথবা যে ছাত্রের ভাষা বিষয়ক পরীক্ষার নম্বর সবসময়ই অন্য বিষয় থেকে তুলনামূলক ভাবে ভালো তাদের বিশেষ প্রবণতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার পক্ষে এই তথ্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এই কারণে শিক্ষাগত তথ্যের উপাদান হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য।

- বিদ্যালয় সম্বন্ধে তথ্য কথাটির অর্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য। যদি বার বার পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে কেন পরিবর্তন হয়েছে, কোন বিশেষ নামী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কিনা ইত্যাদি। তবে এই সব তথ্য গৌণ, প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতি বছর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট ফলাফলের সঙ্গো দিয়ে থাকে। আধুনিক কালে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়। এতে থাকে (১) উপস্থিতির হার, (২) বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলি, (৩) আচরণ, (৪) সহপাঠীদের সঙ্গো মেলামেশা, (৫) স্বভাব, (৬) দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি, (৭) ক্রীড়া ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রবণতা, (৮) উদ্যম, (৯) হবি ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের রেটিং যা গাইডেন্সের পক্ষে খুবই সহায়ক।

১০.৩.৫ অন্যান্য তথ্য (Others Information)

ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে প্রয়োজনভেদে আরও নানারকম তথ্যের সংযোজন হতে পারে। কিন্তু এসব তথ্যের প্রয়োজন কিছুটা সীমিত বা গাইডেন্সের কাজে এদের কার্যকারিতা পরোক্ষ। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

- **আগ্রহ (Interest) —** বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থাংশ পর্যন্ত আগ্রহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয়কারী বিষয় হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই জন্য আগ্রহ পরিমাপক অভীক্ষা, যা আগ্রহ উন্মোচনী (Interest Inventory) নামে পরিচিত, গাইডেন্সের কাজে অপরিহার্য মনে করা হত। বর্তমানে আগ্রহের গুরুত্ব ততটা নেই। এর কারণ প্রথমত, আগ্রহ পরিবর্তনশীল এবং দ্বিতীয়ত আগ্রহকে শুধুমাত্র সাফল্যের কারণ হিসাবে বিচার না করে বিপরীতক্রমে সাফল্যের দরুণ আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়টিকে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ, উপযুক্ত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতির দরুণ কোন কিছুতে সাফল্য লাভ করতে থাকলে তাতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ব্যর্থ হলে আগ্রহ চলে যায়। আগ্রহ ও সাফল্যের এই দ্বিমুখি সম্পর্কের জন্য Kuder Preference Record, Strong Vocational Interest inventory, Thurstone Interest Schedule জাতীয় অভীক্ষাগুলির ব্যবহার এখন খুবই সীমিত। তবে কোন গাইড প্রয়োজন মনে করলে ঐগুলি ব্যবহার করে আগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

- **অর্থনৈতিক অবস্থান (Financial Status) —** বৃত্তি শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যায়ন করার জন্য এই তথ্য প্রয়োজন। ব্যয় বহুল পাঠক্রম কোন নির্দেশনা প্রার্থীর জন্য সুপারিশ করার আগে এই তথ্য জানা দরকার।

- এছাড়াও নির্দেশক ও নির্দেশনা প্রার্থী উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোন ব্যক্তিগত বিশেষ তথ্য যা গাইডেন্স প্রক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য তা নির্দেশক সংগ্রহ করতে পারেন।

১০.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য (Information about Educational Institution)

শিক্ষা সংক্রান্ত গাইডেন্স (Educational Guidance) বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষার এক একটি স্তর অতিক্রম করার সঙ্গো সঙ্গো পরবর্তী স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকাংশ

ছাত্রছাত্রীই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে চায়। কারণ উপযক্ত শিক্ষাগ্রহণের উপর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপ্রকৃতি, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য সব কিছু নির্ভর করে। যতই উচ্চতর স্তরে তারা আরোহণ করে ততই দ্বিধা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় বেশি। সেইজন্য গাইডেন্স প্রক্রিয়ার একটা বিরাট অংশই শিক্ষা বিষয়ক। যে সব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে সচরাচর দেখা দেয়, তা হল, কি পড়ব? কোথায় পড়ব? প্রতিষ্ঠানটি কেমন, খরচ কত, পাশ করলে ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কারণে প্রত্যেক শিক্ষা নির্দেশককে তাঁর কাছে নানারকম প্রতিষ্ঠান ও পাঠক্রমের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিজেদের সম্বন্ধে নানাভাবে প্রচার করে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) থাকায় তাতে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকে। নির্দেশক এই সব নানা সূত্র থেকে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রাখেন এবং প্রয়োজন মত সেই সব তথ্য গাইডেন্সের কাজে ব্যবহার করেন।

১০.৪.১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ (Location and Description of the Institution)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান ও সম্পূর্ণ বিবরণ নির্দেশনা প্রার্থীর জানা দরকার। দূরবর্তী প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য বা নাগরিক পরিবেশ, যাতায়াত সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা, ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় বিশেষ বিবেচ্য হতে পারে। অবস্থান ছাড়া আরও নানা তথ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য জানা দরকার হতে পারে। যেমন,

- **ক্যাম্পাস —** বহু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বতন্ত্র ক্যাম্পাস আছে। সেখানে একটি সুসজ্জিত ক্যাম্পাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের যা কিছু প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, আই.আই.টি., অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সুসজ্জিত গাছপালা ঘেরা সুন্দর পরিবেশযুক্ত ক্যাম্পাস আছে। আবার বিপরীত ধরনের প্রতিষ্ঠানও আছে যেখানে স্বল্প পরিসরে কিছুটা অসুবিধাজনক পরিবেশে পড়াশোনা চলে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় এই বিষয়গুলি অনেকের কাছেই গুরুত্ব পায়।
- **প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনত্ব —** কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ও ঐতিহ্য সম্পন্ন, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নতুন, যেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে নানারকম দ্বিধা থাকতে পারে। সে জানতে চাইতে পারে প্রতিষ্ঠানটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কতটা ঐতিহ্যমণ্ডিত।
- **প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন (Affiliation of Institute) —** প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতি বা অনুমোদন আছে কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন আছে কিনা, মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের জন্য NCTE’র অনুমোদন, থাকা দরকার। আবার এই তথ্যও জানা অত্যন্ত জরুরি যে

প্রতিষ্ঠানটি স্ব-শাসিত (Autonomous) না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত NAAC বা UGC স্বীকৃত কিনা। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বোর্ড বা কাউন্সিলের অনুমোদন বিষয়ক তথ্যও জানা দরকার।

- **পরিচালনা ব্যবস্থা (Management) —** কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক পরিচালিত, অর্থাৎ এগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান, আবার অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি নির্দেশ ও নিয়মবিধি মেনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত। আবার এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি ব্যক্তি, ট্রাস্টি ইত্যাদির মালিকানাধীন। প্রত্যেক প্রকার পরিচালনা ব্যবস্থারই কিছু সুবিধা অসুবিধা, সমস্যা আছে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় অনেকের কাছেই এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়।
- এছাড়াও কিছু কিছু গৌণ বিষয় অনেক সময়ই প্রাধান্য পায়। যেমন, যদি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে নিরাপত্তা, হোস্টেল ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির প্রসঙ্গগুলিও জানা দরকার হয়ে পড়ে।

১০.৪.২ যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য (Information about eligibility)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে অধিকাংশ কলেজই ছাত্র ভর্তির জন্য, বিশেষভাবে সম্মানিক পাঠক্রমে (Honours Course) ভর্তির জন্য, নিজেদের মত করে যোগ্যতার মান ঘোষণা করে দেয়। কোন কোন বিষয়ে কত নম্বর থাকলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে তার তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই কথার অর্থ আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট করা থাকে। একজন গাইডের কাছে সেইসব তথ্য থাকলে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সহজে হতে পারে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বৃত্তিমুখি অনেক পাঠক্রম আছে যা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। সে বিষয়ে গাইড তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করতে পারেন।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের নানা পদ্ধতি আছে। কোথাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোথাও শুধুমাত্র নম্বরের ক্রমানুসারে, কোথাও আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে, অথবা এইরকম নানা পদ্ধতিতে ভর্তি করা হয়। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই, মৌখিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নয়, পাশাপাশি সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য যোগ্যতার মান ও ভর্তির পদ্ধতি সম্বন্ধেও আগে থেকে জানা দরকার। এই সব তথ্যই গাইড তাঁর তথ্য ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করেন।

১০.৪.৩ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (Teachers and Other facilities)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের বিচার শুধুমাত্র ক্যাম্পাস, বাড়ি বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যাচর্চার অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর। অনেক নতুন তৈরি হওয়া

ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট বা মেডিক্যাল কলেজের ভালো ক্যাম্পাস আছে কিন্তু তাদের ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নেই। নির্দেশনা প্রার্থীর কাছে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

- **শিক্ষকমণ্ডলী (Faculty) —** শিক্ষকের সংখ্যা, তাঁদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা বা সুনাম সম্বন্ধে তথ্য। যদি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হয় তবে শিক্ষকরাও আবাসিক কি না।
- **সহায়ক কর্মচারী (Supporting Staff) —** যেমন, গ্রন্থাগারিক, ল্যাবরেটরি সহায়ক ইত্যাদি।
- **গ্রন্থাগার (Library) —** কোন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার তার প্রাণ। একটি ভালো গ্রন্থাগার ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা (যেমন, লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক) থাকলে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা যে সাফল্য পায় তা অন্য কোন কিছুতে হয় না।
- **ল্যাবরেটরি (Laboratory) —** উপযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ভালো ল্যাবরেটরি আছে কি না।
- **ছাত্রাবাস (Hostel) —** আবাসিক প্রতিষ্ঠান হলে ছাত্রাবাসে থাকা বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে ছাত্রাবাস ও তার পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আবাসিক প্রতিষ্ঠান না হলেও দূরাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকলে সেই সব প্রতিষ্ঠানে দূরের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ থাকে। অনেক সময়ই দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর তারা বাইরের কোন মেস বা ভাড়াবাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। নির্দেশক এইসব তথ্য আগে থেকে জানিয়ে দিলে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে সুবিধা হয়।
- **কম্পিউটার, ইন্টারনেট (Internet) ইত্যাদি —** কম্পিউটার ইন্টারনেট, দৈনন্দিন প্রয়োজনের (শিক্ষা বিষয়ক) বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি নানা তথ্য জানা থাকলে, নির্দেশনা প্রার্থীর কাছে সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা যায়, প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ নির্বিকারভাবে তুলে ধরার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করাই নির্দেশকের কাজ।

১০.৪.৪ আর্থিক তথ্য (Financial Information)

আর্থিক দিক থেকে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। সরকারী বা অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পড়ার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি বেসরকারী ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর (Private and self financing)। ঐ সব ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দেশীয় কেন্দ্রে পড়ার ব্যয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। জানা দরকার মোট খরচ, মাসিক খরচ, ভর্তির সময়কার খরচ, প্রদেয় কিস্তির ধরণ ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি (ব্যাঙ্ক মারফৎ, চেক, নগদ ইত্যাদি) সম্বন্ধে।

ছাত্রাবাসে বসবাস, খাওয়া, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সম্বন্ধেও জানা দরকার।

১০.৪.৫ পাঠক্রম ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা (Curriculum and Prospect)

সবশেষে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গাইড ও নির্দেশনা প্রার্থীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে পাঠক্রমটিতে পড়ার সুপারিশ করা হচ্ছে, সেটি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ প্রার্থীকে জানিয়ে দিতে হবে। পাঠক্রমটি কতটা আধুনিক, বিষয়বস্তুর নির্বাচন কেমন, ঠিক কি কি পড়তে হবে (কতগুলি পেপার তত্ত্ব ও ব্যবহারিক অংশ কতটা, ইত্যাদি), পরীক্ষা পদ্ধতি, পঠনপাঠন পদ্ধতি, প্রতিযোগিতার মান কেমন অথবা পাঠক্রমটি কতটা সহজ বা কঠিন এইসব তথ্য আগে থেকে জানতে পারলে নির্দেশনা প্রার্থী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

আধুনিক যুগে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ (Campus Interview) নামক একটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যেখানে পড়া চলাকালীন সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এসে ভবিষ্যত কর্মী নির্বাচন করে রাখেন এবং পড়াশেষ হলে নিয়োগপত্র দিয়ে দেন। সবক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা না থাকলেও বা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর এই ভাবে চাকরি না হলেও, এটা সকলেরই জানা দরকার কোন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি বিশেষ পাঠক্রম শেষ করার পর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। যে পাঠক্রমের কোন চাহিদা নেই, বা যে প্রতিষ্ঠানের কোন চাহিদা নেই, সেরকম প্রতিষ্ঠানে কাউকে পড়তে সুপারিশ করা গাইডের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য এই সব তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করে রাখতে হয় এবং প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করতে হয়।

১০.৫ বৃত্তিগত তথ্য (Vocational Information)

যদিও বৃত্তিগত গাইডেন্স (Vocational guidance) ও শিক্ষাগত গাইডেন্সের মধ্যে একটি সহজ সংযোগ রয়েছে তবুও বৃত্তিগত সমস্ত তথ্য পূর্বোক্ত তথ্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যেখানে বলা হয়েছে যে কোন পাঠক্রম শেষ করে চাকরির সুযোগ সুবিধা কেমন সেখান থেকেই বৃত্তিগত তথ্য সংগ্রহের সূচনা। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শিক্ষা চলাকালীন অনেক ছাত্রছাত্রীরই বৃত্তি সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট থাকে না। অনেক পাঠক্রমই নানা ধরনের বৃত্তির জন্য উন্মুক্ত। যেমন, কোন ছাত্র বা ছাত্রী কমার্স বিষয়ে পড়া শেষ করে শিক্ষক হবে না কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করবে তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। সেজন্য পড়া শেষ হলে তার দরকার হয় বৃত্তিগত গাইডেন্সের। তখন সরাসরি, অথবা বৃত্তির শর্ত অনুযায়ী বিশেষ কোন প্রস্তুতিমূলক পাঠ শেষ করে উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে তারা। এই কারণে নির্দেশক বৃত্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাঁর সংগৃহীত তথ্য ভাণ্ডারে জড়ো করে রাখেন।

১০.৫.১ প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতা (Employer and Qualifications)

প্রথমে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কোন পদে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব তার তালিকা সংগ্রহ করা হয়। সেই সঙ্গে ন্যূনতম যোগ্যতা (Minimum qualification) ও অভিজ্ঞতা (experience) যা নিয়োগ কর্তা

নির্দিষ্ট পদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, সে সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়। সাধারণত দুই ধরনের নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

- **সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ (Employment in Government and semigovernment concern) —** এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর প্রায় নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপযুক্ত স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে অথবা বিভাগীয় উদ্যোগে এক সঙ্গে বহু ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। এই ধরনের স্বশাসিত সংস্থা (যেমন, School Service Commission, College Service Commission, Public Service Commission, Staff Selection Commission, ইত্যাদি) বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করে এবং তারপর প্রতিযোগিতা মূলক যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নির্দিষ্ট দপ্তরে বা প্রতিষ্ঠানে নাম সুপারিশ করে। সুপারিশের ভিত্তিতে প্রার্থীকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়।
- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ (Employment in Non-government concern) —** বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ব্যবস্থা অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন মত পদ, পদসংখ্যা ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে। এদের নিয়োগ বিষয়ে স্থায়ী তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্য নির্দেশদাতা প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট মাধ্যমগুলি, যেখানে নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন।

১০.৫.২ নির্বাচন প্রক্রিয়া (Selection Process)

শুধুমাত্র নিয়োগকারী সংস্থা নয় তাদের নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নির্বাচনী সংস্থার নির্বাচন পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

- **ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন (Union Public Service Commission) —** কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা। কমিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। কেন্দ্রীয় দপ্তর, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, চিকিৎসা বিভাগ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রধানত গেজেটেড পদগুলির নিয়োগ এই সংস্থার মাধ্যমে হয়। প্রশাসনিক পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষাও এই সংস্থা গ্রহণ করে। অন্যান্য পদের জন্য ইন্টারভিউ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার পর নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নাম সুপারিশ করা হয়। প্রকৃত নিয়োগপত্র ঐ সব দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়।
- **কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন (Central Staff Selection Commission) —** এর কার্যক্রমও UPSC র অনুরূপ। তবে এর কাজ প্রধানত নিম্নতর পদগুলিতে (নন গেজেটেড) নিয়োগের সুপারিশ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

- **রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (Railway Recruitment Board) —** শুধুমাত্র রেলমন্ত্রকের অধীন পদগুলির জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও নির্বাচন করে।
- **এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) —** রাজ্য সরকারের সংস্থা। এখানে কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যেকোন শিক্ষিত বেকার নিজের নাম ও যোগ্যতা নথিভুক্ত করে রাখতে পারেন এবং একটি কার্ড রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের ও স্বশাসিত অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে যে সব পদ শূন্য হয়, সেগুলি এই সংস্থায় জানালে তারা উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নাম পাঠিয়ে দেয়। এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ইন্টারভিউ বা অনুরূপ পদ্ধতিতে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে। এই সংস্থা শুধুমাত্র সংযোগকারী সংস্থা।
- **রাজ্য পাবলিক সারভিস কমিশন (State Public Service Commission) —** প্রত্যেক রাজ্যেই সেই রাজ্যের নামে একটি স্বশাসিত পাবলিক সারভিস কমিশন আছে (যেমন, West Bengal Public Service Commission)। এদের কাজও Union Public Service Commission-এর অনুরূপ। তবে রাজ্যস্তরে গেজেটেড ও নন-গেজেটেড সমস্ত পদের নিয়োগই হয় এদের মাধ্যমে। এছাড়াও প্রশাসনিক পদে নিয়োগের পরীক্ষা (যেমন, WBCS) ও নানা দপ্তরের কর্মীদের পদোন্নতি বিষয়ক পরীক্ষা এই দপ্তর গ্রহণ করে। এই সংস্থাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করে এবং পরে ইন্টারভিউ অথবা পরীক্ষা অথবা উভয় পদ্ধতিতে নির্বাচন ও নাম সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়।
- **পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সারভিস কমিশন (West Bengal College Service Commission) —** এই সংস্থা শুধুমাত্র কলেজের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নির্বাচন করে। প্রথমে UGC অনুমোদিত পাঠক্রম ও পদ্ধতিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নির্বাচন ও নাম সুপারিশ করা হয়। অধ্যক্ষ পদের জন্য কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। আইনত এই সংস্থার সুপারিশ মান্য করতে প্রতিটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ বাধ্য। তবে সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে নিয়োগ করার দায়িত্ব পাবলিক সারভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত।
- **পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সারভিস কমিশন (West Bengal Central School Service Commission) —** এরকম নাম হওয়ার কারণ এই সংস্থার চারটি আঞ্চলিক সংস্থা (Regional Commission) আছে। কিন্তু মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় কমিশন মারফত। এদের কাজ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা। দুই ক্ষেত্রেই যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক নির্বাচন করা হয় এবং পরে সাক্ষাৎকারের সাহায্যে চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে স্কুল শিক্ষাকর্মীরাও এই কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

এই সব সংস্থা ছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে অনেক ছোট ছোট সংস্থা আছে যারা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। একজন দক্ষ গাইডের কাজ—

১। সংস্থাগুলির নাম, ঠিকানা ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

২। সংস্থাগুলি যে সব পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করে সেগুলি জানা।

৩। নির্বাচন ও পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার সিলেবাস ইত্যাদি জানা।

৪। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সন্ধান রাখা।

৫। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, পত্রপত্রিকা (যেমন Employment News) ও রেডিও, টেলিভিশনের ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত পদের নাম, পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

বর্তমানে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে এই সব ক্ষেত্রে গাইডের কাজ করে। এছাড়াও আছে Private Employment Exchange অর্থাৎ কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা যারা নানা সূত্র থেকে সম্ভাব্য নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কর্মপ্রার্থীদের নাম যোগ্যতা ও পছন্দের বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখে। এবার নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় এবং নিযুক্ত হলে উভয়ের নিকট থেকে কমিশন নিয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সুতরাং যোগাযোগ রাখার কোনও সমস্যা হয় না।

১০.৫.৩ আর্থিক ও ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা (Financial and Future Prospect)

বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বেতন, বেতনক্রম (Pay scale), বিভিন্ন ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা না হলে গাইডেন্স অর্থহীন। তবে আর্থিক তথ্যের পাশাপাশি জনা দরকার যে ভবিষ্যতে বেতনক্রম সংশোধনের সুযোগ আছে কি না, পদোন্নতির সম্ভাবনা কতটা, বদলির সম্ভাবনা আছে কি না, চাকরির স্থায়ীত্ব কতটা, বেতন ছাড়া অন্যান্য সুযোগ আছে কিনা (যেমন, বাসগৃহ, যাতায়াতের বাহন, ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি), ছুটি সংক্রান্ত তথ্য, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি নানা সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য বৃত্তি নির্বাচনের জন্য মানুষের কাছে বিবেচ্য বিষয়। নির্দেশদাতাকে এই সব তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়।

১০.৫.৪ বিপদ বিষয়ক তথ্য (Information about Hazard)

অনেক বৃত্তির সঙ্গেই কিছু কিছু বৃত্তিগত বিপদও থাকে (Occupational Hazard)। পুলিশের চাকরি, কলকারখানায় চাকরি, বা এরকম অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য সমস্যা বা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়ার দায়িত্ব নির্দেশদাতাকেই নিতে হয়। কারণ কাজের ধরন ও বিপদ সম্বন্ধে প্রার্থীর কোন ধারণা না থাকাই

স্বাভাবিক। এই কারণে নির্দেশক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন এবং প্রার্থীকে সচেতন করে দেন। দীর্ঘ পরিশ্রম, একটানা কাজ, মানসিক পীড়ন (Mental stress), এই সব সম্ভাবনাও পেশাগত বিপদের অন্তর্গত।

১০.৬ অন্যান্য নির্দেশনা বিষয়ক তথ্য (Information about Other Types of Guidance)

শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশনা ছাড়া অন্যান্য ধরনের গাইডেন্সও তথ্য নির্ভর। তবে সেক্ষেত্রে তথ্যর প্রকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন প্রকার। স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) কথাটি খুবই ব্যাপক। স্বাস্থ্য নির্দেশনা একদিকে যেমন কাউন্সেলিং-এর মত সমস্যা ভিত্তিক হতে পারে অপরদিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদা ভিত্তিক (Need based) হতে পারে। এই কথার অর্থ, কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন রোগ বা স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার জন্য সাহায্য প্রার্থী হয় তখন একদিকে নিরাময়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশনা (Counselling) ও অন্যদিকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য ও সাহায্য (Guidance) তার প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য স্বাস্থ্য নির্দেশনার ব্যাপকতা খুবই বেশি। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য নির্দেশনার জন্য ব্যক্তিগত তথ্যের প্রয়োজন অনেকটা সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রয়োজন হয় বেশি। প্রধানত যে ধরনের তথ্য দরকার তা নিম্নরূপ।

- **চিকিৎসক (Doctor) —** বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর, তাদের কর্মক্ষেত্র, দক্ষতার বিবরণ ইত্যাদি।
- **চিকিৎসালয় (Clinic) —** সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে (Speciality clinic), অবস্থান, ব্যয় সম্বন্ধীয় তথ্য, অন্যান্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ডাক্তারদের বিবরণ ইত্যাদি।
- **চিকিৎসার সরঞ্জাম (Accessories of treatment) —** বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম যা চিকিৎসার সময় ও পরে ব্যবহার করা দরকার হয় সেগুলি সম্বন্ধে তথ্য।
- **পরীক্ষণাগার (Laboratory) —** চিকিৎসার অপরিহার্য অঙ্গ রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা। অনেকেরই পরীক্ষণাগার সম্বন্ধে ধারণা থাকে না। ঐগুলি সম্বন্ধে তথ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
- **পথ্য সংক্রান্ত তথ্য (Information about diet) —** পথ্য বিশারদ ছাড়াও চিকিৎসকরাও পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আপাত স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে পথ্য সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তি দেখা যায়। ভালো স্বাস্থ্য নির্দেশক এই বিষয়ে সাহায্য করেন। সেজন্য তাঁদের প্রচলিত খাদ্য বস্তুর গুণাগুণ পুষ্টিমূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা দরকার।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গাইডেন্সের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাতে স্বাস্থ্য সম্মত হয় তার জন্য নির্দেশনা। পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে অনেক সঠিক এবং বিভ্রান্তিকর দুই প্রকার কথাই লেখা হয়। একমাত্র উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমেই এই বিভ্রান্তি দূর হতে পারে।

স্বাস্থ্য নির্দেশনা ছাড়া সামাজিক নির্দেশনা (Social Guidance), মূল্যবোধ সম্পর্কিত নির্দেশনা (Value Guidance), শিশু নির্দেশনা (Child Guidance) ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, ভিন্ন ধরনের শিশু নির্দেশনা, প্রকৃতপক্ষে শিশুর জন্য নয়, তার পিতামাতার জন্য। সেজন্য এর সঠিক নাম পিতামাতার জন্য নির্দেশনা (Parent Guidance)। পিতামাতার জন্য নির্দেশনার প্রয়োজনীয় তথ্য অনেক। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

- শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক তথ্য।
- শিশুপালন রীতি ও শিশুপালন নীতির প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য।
- শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য।
- শিশুর সম্ভাব্য রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে তথ্য, ও সতর্কতার বিষয়।
- শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপদ (Hazard) সম্বন্ধে তথ্য।
- এক একটি বিশেষ স্তরের সমস্যা (যেমন, কৈশোর) সম্পর্কে তথ্য।
- শিশুদের জন্য অবশ্যকীয় সরঞ্জাম, চিকিৎসা, বিনোদন, ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য।
- শিশুর মানসিক সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ, অসহায়ত্ববোধ ইত্যাদি) সম্পর্কে ধারণা।
- সাধারণভাবে শৈশবেই প্রতিবন্ধীতার প্রতিকার শুরু হওয়া দরকার। সেজন্য সমস্ত গাইডকেই প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়। তবে এই বিষয়টি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ বর্তমানে অনেকেই Parent Guidance কথাটির পরিবর্তে Parent Counselling ব্যবহার করার পক্ষপাতী এবং তা যথেষ্ট যুক্তি যুক্তও।

১০.৭ কাউন্সেলিং এর জন্য বিশেষ তথ্য (Specific Information for Counselling)

গাইডেন্সের জন্য সংগৃহীত অনেক তথ্যই কাউন্সেলিং এর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু কাউন্সেলিং এর প্রকৃতি গাইডেন্সের চেয়ে অনেকটা নিবিড় (Intensive)। সেজন্য আরও সুনির্দিষ্ট এবং খুঁটিনাটি তথ্য কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজন হয়। এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করা হল।

১০.৭.১ পারিবারিক তথ্য (Information about Family)

অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্য পারিবারিক তথ্য জানার দরকার হয়। যে সমস্ত উদ্দেশ্যে পারিবারিক তথ্য সংগৃহীত হয় তার কয়েকটি নিম্নরূপ।

- **বংশগত ইতিহাস (Family or hereditary history) —** কিছু কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার বংশানুক্রমিক ইতিহাস থাকে। অর্থাৎ মা-বাবা অথবা অন্যকোন পূর্ব পুরুষের রক্ত সম্পর্কিত কারোর একই ধরনের সমস্যা আছে বা ছিল কি না। শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে (যেমন, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি) বংশগত প্রভাবের কথা সুবিদিত। তেমনি মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমিক পারিবারিক প্রভাব থাকতে পারে। যেমন, মানসিক রোগ, প্রক্ষোভ জনিত সমস্যা, মানসিক প্রতিবন্ধীতা, ইত্যাদি অনেক সমস্যার বেলায় বংশগত ইতিহাস থাকতে পারে।
- **পারিবারিক গঠন (Family Structure) —** যৌথ পরিবার, অথবা অণুপরিবারে সন্তান পালনের রীতিনীতি অনেকটা আলাদা। সামাজিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও পরিবারের প্রভাব এক একটি পারিবারিক গঠনের ক্ষেত্রে আলাদা। মনে রাখতে হবে যৌথ পরিবার (Joint family) কথার অর্থ একাধিক পরিবারের একটি নিটোল সমষ্টি (যেমন, বাবা-কাকাদের পরিবার, তাদের ছেলেদের পরিবার, অবিবাহিতরা, এরকম বহু মানুষ একই বাড়িতে একই পরিচালনা ব্যবস্থায় বসবাস করা), সম্প্রসারিত পরিবার (Extended family) হল, একটি অণুপরিবারের মধ্যে আরও কয়েকজন (যেমন, অবসর প্রাপ্ত মা-বাবা, অবিবাহিত, ভাই-বোন ইত্যাদি) একত্র থাকা এবং অণুপরিবার (Neuclear family) অর্থ মা-বাবা ও একটি বা দুটি মাত্র নাবালক সন্তান। এই তিন প্রকার পরিবার সম্পর্কিত তথ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারে।
- **পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান (Socio-economic Status of the Family)** — বলাবাহুল্য, পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান বহু সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ কারণ। নেশা, পীড়ন (Stress), উদ্বেগ (Anxiety) ইত্যাদি বহু সমস্যার পরোক্ষ উৎস পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান।
- **পেশা (Occupation) —** পরিবারের সদস্যদের পেশা (চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি), মা-বাবার পেশা (বহু অণু পরিবারে, মা-বাবা উভয়েই পেশার প্রয়োজনে সারাদিন বাইরে থাকেন, অথবা বাবা দূরবর্তী কোন স্থানে আলাদা থাকেন), অন্যান্যদের পেশা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- **পারিবারিক সম্পর্ক (Family relation) —** মা-বাবার পারস্পরিক সম্পর্ক, যৌথ পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, ভগ্ন পরিবার (Broken home) কি না, এই সব তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

- **পারিবারিক জীবনশৈলী (Family life style) —** যদিও বিষয়টি আর্থ সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত তবুও এর কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খী, দ্রুত জীবনযাত্রা প্রণালী (Fast life), প্রতিযোগিতার মনোভাব (Competitiveness), এই সবই নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রয়োজনবোধে পরিবার সম্বন্ধে অনুরূপ যে কোন তথ্য পরামর্শ প্রার্থী জানাতে পারে।

১০.৭.৩ বিকাশমূলক তথ্য (Developmental History)

প্রাক্ জন্মকালীন (Prenatal), জন্মকালীন (Perinatal) ও জন্মোত্তরকালীন (Postnatal) বিকাশের ইতিহাস অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজন মত কাউন্সেলর এই বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিতে চান।

- **প্রাক জন্মকালীন ইতিহাস (Prenatal history) —** এর মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য ও মানসিক সমস্যা, গর্ভকালীন রোগ ব্যাধি, ঔষধ সেবন, পুষ্টি ও অন্যান্য সমস্যা, গর্ভকাল (পূর্ণ সময় অথবা অপরিণত), আঘাত ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আছে।
- **জন্মকালীন (Perinatal) —** স্বাভাবিক জন্ম অথবা শল্য চিকিৎসার সাহায্যে জন্ম, জন্মকালীন সমস্যা কিছু থাকলে তার বিবরণ, জন্মের পরমুহূর্তের সমস্যার বিবরণ, এই ধরনের তথ্য জানা যায় মা-বাবার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।
- **জন্মোত্তর ইতিহাস (Postnatal history) —** জন্মের পরবর্তী বয়সে, বিশেষভাবে শৈশব (Infancy) এবং বাল্যকালে (Childhood) বিকাশের ধারা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য। যেমন, বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটতে শেখা, দাঁত ওঠার সময়, খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক তথ্য, কথা বলতে শেখা, বুদ্ধির বিকাশ, ধারণার বিকাশ, ছোটবেলার রোগব্যাধি সংক্রান্ত ইতিহাস, খেলাধূলা, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশার প্রসঙ্গে তথ্য, উদ্বেগ, ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বিকাশ, কৌতুহল, বা এরকম অসংখ্য বিকাশমূলক তথ্যের মধ্যে থেকে যেগুলি কাউন্সেলর জানার প্রয়োজন বোধ করবেন, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ক তথ্য কতটা দররকার হবে তা নির্ভর করে সমস্যার প্রকৃতি ও তীব্রতার উপর।

১০.৭.৩ অন্যান্য তথ্য (Other Informations)

কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিগত জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি সমস্যার প্রকৃতিও বিচিত্র। সেজন্য কাউন্সেলর যে কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। তা ছাড়া, পরামর্শ গ্রহীতার বয়স, লিঙ্গ ও সমস্যার ক্ষেত্র এসবের উপরেও তথ্যের

প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন, অতিবার্ধক্য জনিত সমস্যার জন্য যে কাউন্সেলিং (Gerontological Counselling) দরকার হয় তার প্রকৃতি বিবাহ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Academic Counselling) এবং আচরগত কাউন্সেলিং (Behaviour Counselling) বা পিতামাতার জন্য কাউন্সেলিং (Parent Counselling), প্রকৃতি সমস্যা, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তথ্যের প্রকৃতিও আলাদা। এই জন্য কাউন্সেলিং কোন একটি একক পেশা নয় বা একই কাউন্সেলর জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারেন না। এক একজন বিশেষজ্ঞের মত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যার জন্য আলাদা কাউন্সেলারের প্রয়োজন। যিনি যে ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তিনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে চান। এমনকি, ক্ষেত্র বিশেষে একজন চিকিৎসকের মতই (Therapist or Clinical Therapist) তিনিও নানা ধরনের নিদানমূলক অভীক্ষা (Diagnostic test) প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

- **বিবাহ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling) —** বিবাহের পূর্বে হলে, দাম্পত্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সন্তান ধারণ, যৌথজীবন, যৌনতাবাহিত রোগ, জন্মগত রোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য। বিবাহের পরে দাম্পত্য সমস্যা সম্পর্কিত হলে, ব্যক্তিগত তথ্য, যৌথ জীবন সম্বন্ধে তথ্য, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ, সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং পারিবারিক তথ্য।
- **পিতামাতার কাউন্সেলিং (Parent Counselling) —** এই জাতীয় কাউন্সেলিং তখনই দরকার হয় যখন সন্তানের কোন বিশেষ সমস্যা (যেমন, প্রতিবন্ধীতা) থাকে। এক্ষেত্রে, সন্তান ও তার সমস্যা সম্পর্কিত যাবতীয় ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক তথ্য, পিতা-মাতার কিছু কিছু ব্যক্তিগত তথ্য এবং প্রতিবন্ধীতা, তার প্রতিকার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য। পিতামাতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য।
- **বিদ্যাচর্চা বিষয়ক কাউন্সেলিং (Academic Counselling) —** বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা, মনোযোগ সংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষ ধরনের অক্ষমতা, আগ্রহের অভাব, উদ্যমের সমস্যা, প্রেষণাজনিত সমস্যা, প্রক্ষোভজনিত সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ) ইত্যাদির জন্য শিক্ষার্থী সম্বন্ধে যাবতীয় বিকাশমূলক তথ্য, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য, বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক তথ্য।

১০.৮ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর জন্য তথ্যের বিপুল সম্ভার ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেল, তার পরে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এত তথ্য কোথা থেকে কি ভাবে পাওয়া যাবে এবং এতরকম

তথ্য সংরক্ষণ করা হবে কিভাবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য গাইড বা কাউন্সেলর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকার পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে (Direct method) সরাসরি তথ্যের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় আর পরোক্ষ পদ্ধতিতে (Indirect method) অন্যের সংকলিত ও সংগৃহীত তথ্যকে কাজে লাগানো হয়।

১০.৮.১ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct method)

কয়েকটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি দেওয়া হল।

- **ব্যক্তিগত তথ্য —** সাক্ষাৎকার (Interview) ও ব্যক্তিগত নথি থেকে ব্যক্তিগত অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়। কেস হিস্টরি তৈরি করার সময়ও প্রধানতম হাতিয়ার ইন্টারভিউ। প্রয়োজন মত ব্যক্তি, তার মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশিক্ষক ইত্যাদি ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, আগ্রহ, বা অনুরূপ বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্য সরাসরি উপযুক্ত কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করে জানা যায়।
- **বৃত্তিমূলক তথ্য —** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের ওয়েবসাইট থেকে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে বৃত্তিমূলক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের সম্বন্ধে প্রসপেক্টাস (Prospectus), পুস্তিকা (Brochure) ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং কখনও কখনও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ সব পুস্তিকা সংগ্রহ করে বহু সঠিক তথ্য জানা যায়।
- সরাসরি ও আধা সরকারি পদ ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় তথ্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, পাবলিক সারভিস কমিশন ও অন্যান্য সারভিস কমিশন থেকে সংগৃহীত হয়।

বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্যও একইভাবে সংগৃহীত হয়।

১০.৮.২ পরোক্ষ পদ্ধতি (Indirect Method)

পরোক্ষ পদ্ধতিতে তথ্য সংগৃহীত হয় তখনই যখন গাইড বা কাউন্সেলরের পক্ষে ঐ সব তথ্য সরাসরি জানা বা জানার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় অথচ অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এরকম কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল।

- **বিদ্যাচর্চা সম্পর্কিত তথ্য —** স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরগুলি এই বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করতে পারে।
- **বিদ্যালয়ে আচরণ সংক্রান্ত তথ্য —** স্কুলের প্রগতিপত্র (Progress report) এবং আধুনিক যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের Exit portfolio এ সম্বন্ধে তথ্যের উৎকৃষ্ট উৎস।
- **খেলাধূলা ও বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্র —** বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শংসাপত্র (Certificate) ও পুরস্কারের বিবরণ।

- **সৃজনশীলতা —** শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদির ক্ষেত্রে সৃষ্ট বস্তু ও শংসাপত্র।
- **শারীরিক ও রোগ ব্যাধি বিষয়ক তথ্য —** মেডিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট।

১০.৮.৩ তথ্য সংরক্ষণ (Preservation of Information)

গাইডেন্সের ক্ষেত্রে যে সব তথ্য অনেকের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন, প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য), সেগুলি সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। আবার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রার্থীর প্রয়োজন মিটে গেলে আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐগুলি সংরক্ষণ করা হলে গাইড বা কাউন্সেলরের পক্ষে ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজে লাগতে পারে। সেজন্য নির্দেশনাগার ও পরামর্শকেন্দ্রে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যেরই সংরক্ষণ করা হয়। বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

- **সাধারণ তথ্য (Common Information) —** প্রতিটি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং কেন্দ্রে একটি করে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত লাইব্রেরি থাকে যেখানে সমস্ত সাধারণ তথ্য সংরক্ষিত রাখা হয়। মুদ্রিত তথ্য ছাড়াও কম্পিউটারে বিষয়বস্তু, প্রতিষ্ঠান, বৃত্তি, পাঠক্রম ইত্যাদির স্বতন্ত্র বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরি করা হয়। হার্ডডিস্ক (Hard disk) বা Software উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য অল্প জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় এবং খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনরুদ্ধার ও মুদ্রণ সম্ভব হয়।
- **ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information) —** প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে কেস ফাইল (Case file) রাখা হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য রাখা থাকে। ফাইলগুলি নির্দিষ্ট Index number ও বর্ণানুক্রমিক তালিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে রাখা হয়। এর ফলে যে কোন সময় যে কোন তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে লিখিত কেসফাইলের পরিবর্তে একটি Compact Disk অথবা Floppy তে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করে রাখা হয়। সেখান থেকে পুনরুদ্ধার করা আরও সহজ।

যে সব ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করার দরকার নেই সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়।

১০.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুই-ই তথ্য নির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্যের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাগত নির্দেশনার জন্য প্রথমেই দরকার ব্যক্তিগত তথ্য। নির্দেশনা প্রার্থীর নাম, বয়স, লিঙ্গ, বিভিন্ন পরীক্ষায় তার ফলাফলের গতি প্রকৃতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হয়।

ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠক্রম, প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পড়ার ব্যয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য জানা দরকার হয়, বৃত্তিগত নির্দেশনার জন্য দরকার নিয়োগকারী সংস্থা, নিয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বেতন, ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্য।

কাউন্সেলিং এর জন্য ব্যক্তিগত ঐ সব তথ্যের অনেকটাই কাজে লাগে। কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিগত তথ্য দরকার হয়। তথ্যের প্রকৃতি নির্ভর করে কাউন্সেলিং এর প্রকার উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যার উপর। সমস্ত তথ্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয় এবং লাইব্রেরি বা কম্পিউটারের সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়।

১০.১০ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) ব্যক্তিগত তথ্য কথাটির অর্থ কি?

(খ) শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রে হয়—একটি উদাহরণ দিন।

(গ) শারীরিক তথ্যের একটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য দরকার হয় কেন — একটি কারণ লিখুন।

(ঙ) মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা কোনগুলি।

(চ) অর্থনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য দরকার হয় কেন?

(ছ) প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বলতে কি বোঝায়?

(জ) শিক্ষক মণ্ডলী সম্পর্কিত তথ্য কি?

(ঝ) ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন কি করে?

(ঞ) স্বাস্থ্য নির্দেশনা কাকে বলে?

(ট) তথ্য সংগ্রহের পরোক্ষ পদ্ধতি কি?

(ঠ) প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কোন ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়?

(ড) ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(খ) ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তথ্যের গুরুত্ব কি?

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ জানা প্রয়োজন কেন?

(ঘ) বৃত্তিগত নির্দেশনায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ দিন।

(ঙ) পেশাগত বিপদ কাকে বলে? নির্দেশনায় এর গুরুত্ব কি?

(চ) কাউন্সেলিং এর জন্য পারিবারিক তথ্যের বিবরণ দিন।

(ছ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) ব্যক্তিগত তথ্য কাকে বলে? গাইডেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন এবং প্রয়োজনমত উদাহরণ দিন।

(খ) গাইডেন্সের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য কেন প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিন।

(গ) বৃত্তিগত তথ্য কাকে বলে? বৃত্তিগত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ঐ সব তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব?

(ঘ) কাউন্সেলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিন এবং ঐ সব তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

References :

1. Anand, S. P. *ABC's of Guidance in Education,* Pagestar Publications, Bhubaneswar, 1998.
2. Bernard, H. W. and Fullness, D. F. *Principles of Guidance.* Crowell, New York, 1977.
3. Gibson, R. L. And Mitchell, M. H. *Introduction to Guidance,* Macmillan, New York, 1986.
4. Parischa, P. *Guidance and Counselling in Indian Education,* NCERT, New Delhi, 1976.
5. Rao, S. N. *Counselling and Guidance.* Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1991.